হিমাদ্রি

হিমাদ্রি
শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী উমাদেবীর সৌজন্যে

হিমাদ্রি

শ্রীরানী চন্দ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ১২

মা'কে
প্রণাম

হিমাদ্রি

সকাল থেকে অবিশ্রাম বৃষ্টি ঝরছে। একই তালে, ঝর্‌ঝর্‌ ঝম্‌ঝম্‌। স্থির অচঞ্চল ধারা। এতটুকু চপলতা নেই কোথাও। স্তব্ধ গম্ভীর ছন্দ। চোখের সামনে ঘনসবুজ বকুলগাছ, মনে হচ্ছে যেন সাদা সুতোর ঝালর ঝুলিয়ে ঢেকে রেখেছে কেউ তাকে। জানালার পাশের খাটটাতে পড়ে আছি অসহায়ের মতো। অনুজ্জ্বল দিনের গভীর বিমর্ষতা ভারী করে তোলে মন। ভাবি, শান্তিনিকেতনের বর্ষা মনকে কেমন বাইরে টেনে নেয়; আর এখানে আরো মনকে ধাক্কা মেরে ঘরের ভিতরে ঢোকায়। কেন এমন হয়?

বর্ষা দেখেছি ছেলেবেলায়, বিক্রমপুরে মামাবাড়িতে। আষাঢ়ে মেঘ আকাশে ভাঙতেই হৈহৈ লেগে যেত প্রতি ঘরে। হাত-দা হাতে ছেলেরা ছুটত বাঁশ-ঝাড়ে— সাঁকো বাঁধতে হবে উঠোন জুড়ে। মেয়েরা তুলে রাখত মাচায় শুকনো জ্বালানি কাঠ। চালের মটকা, মুড়ি-মুড়কির টিন ওঠাত 'কার'এ, ধরাধরি করে। দিদিমা হাঁকতেন নীচে দাঁড়িয়ে, 'কাঠের পাটাতন বেঁকে উঠল, আর ভার তুলো না উপরে। ঠাকুর না করুন, জলের তেমন গতিক দেখলে আমাদেরও উঠতে হবে ওখানে।' মামী জানান, 'পশ্চিম-ভিটের রান্নাঘরের পিছনের পইঠা কেমন শেওলা-ধরা, এবারকার ধাক্কা সয় কি না সন্দেহ।' তাড়াতাড়ি বেড়া বেঁধে বাঁধ দেন মামা তাতে। এই বর্ষাটা কোনো-মতে কাটানো দিয়ে কথা। কলাগাছে চিহ্ন রাখেন মা নিজের হাতে; বলেন, 'জল এসে গেলে তো আর হুঁশ থাকবে না কারো; এই-এই গাছগুলো কাটবে ভেলা বানাতে। খবরদার, আমার বীচেকলার ঝোপে হাত দিয়ো না যেন কেউ। সেবার মুনশীগঞ্জ থেকে এনেছিলাম কত কষ্ট করে।' ব্যস্ততার সীমা নেই কারো। তিন মাসের মতো জীবনধারণের সব-কিছু উপকরণ মজুত রাখতে হবে ঘরে। তৈরি হয় বাজারের ফর্দ— তেল নুন মসলাপাতির। শেষ বারের মতো রোদে পড়ে তোশক বালিশ, ক্ষারে সিদ্ধ হয় কাঁথা কাপড়।

আমরা ছোটোরা বসে যাই দিদিমার সঙ্গে— গলানো গন্ধকের বাটিতে পাটকাঠির ডগা ডুবিয়ে গোছা-গোছা দেশলাই বানাতে। মালসায় জিয়নো

দিনে-রাতের তুষের আগুন, তাতে কাঠি ছোঁয়াই কি জলে ওঠে। কথায়-কথায় পাওয়া যেত না তখনকার দিনে, দূর গাঁয়ে দু-পয়সা চার-পয়সা দিয়ে ছোটো ছোটো নীল রঙের দেশলাইয়ের বাক্স।

সব-কিছু গুছিয়ে উঠতে-না-উঠতে দেখা যেত, একদিন বর্ষার উপচে-ওঠা জল অকস্মাৎ নদী-নালা ভাসিয়ে এসে ঢুকল গাঁয়ে। ডোবাল পথঘাট খালবিল ধানক্ষেত পাটক্ষেত বেতঝোপ; ডোবাল হিজল-মাদারের বুক, গোয়ালঘরের চাল, মণ্ডপের কোল, তুলসীর মঞ্চ। পথে পরপর তিন হাত চার হাত অন্তর কঞ্চি পুঁতে রাখি; হুহু করে জল এগিয়ে আসে, মুহুর্মুহু ছুটে গিয়ে দিদিমাকে খবর দিই, 'ও দিদিমা, তিনটে কাঠি ডুবল'; 'ও দিদিমা, চারেরটাও ডুবল'; 'ও দিদিমা গো, ছয়, সাত, আটেরটাও যে ডুবল দেখি।' ছুটোছুটির বিরাম নেই। দিদিমাকে খবরটা দিয়ে আসতে-না-আসতে আবার একটা ডোবে, আবার ছুটি। দেখতে দেখতে সব ছাপিয়ে সবশেষে জল উঠে এল গৃহলক্ষ্মীর নিপুণ হাতে নিত্য-লেপা সাদামাটির আঙিনায়।

ভিটেয় ভিটেয় ঘর। এ-ঘরে ও-ঘরে যেতে সাঁকোয় চড়ি, নৌকোয় চড়ি, নয় কলার ভেলায় ভাসি, আর আহ্লাদে হেসে লুটোপুটি খাই।

রুপো-গলানো সাদা জল ঝিলিমিলি খেলে সবুজ ঝোপঝাড়ের ফাঁকে— দিক হতে দিগন্তে। নদীর মাছ নির্ভয়ে এসে খেলে যায় খোলা অঙ্গনে; জোড়া শোল ঘুরে বেড়ায় নতুন জলে সদ্যফোটা লক্ষ বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে। মন ঘুরে বেড়ায় তাদের সঙ্গে। উঁচু মাটির দাওয়ায় বসে মুগ্ধনয়নে অপরূপ শোভা দেখি বর্ষার— আপন মনে, রাতে দিনে।

বড়ো হয়ে এলাম বীরভূমে— শক্ত মাটি, রক্ত খোয়াই, রুক্ষ দিগন্ত। গুরু গুরু দুন্দুভি বাজিয়ে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল তালগাছের মাথায়। যেন দেবরাজ ইন্দ্র এসে বসলেন তাঁর রাজদরবারে, সভা জাঁকিয়ে। নিমেষে ভেসে গেল বালিমাটির পথ, শিমুলগাছের তলা, 'প্রান্তিকে'র সবুজ মাঠ। তার উপরে রোদের আলো সোনালি ঝিলিক খেলিয়ে যায় যখন, পাগল হয়ে বেরিয়ে আসি ঘর হতে বাইরে। ঝাঁপিয়ে পড়ি ঐ ঊষর-প্রান্তর-ধোয়া শুষ্ক খোয়াইর বুক চিরে যে রসের ধারা উল্লাসে ছুটছে, তারই কোলে।

সুখের মুহূর্ত পলকে কাটে। রসের ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, থেমে আসে তার বেগ, থামে গতি। স্বচ্ছ আকাশে ফুটে ওঠে মধুর হাসি। ক্ষণিকের

খেলা সাঙ্গ করে ঐ খোয়াইতেই বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে সেই জলটুকুকে। সেই লালবাঁধের জলে স্নান করে ফিরে আসি আপন ঘরে।

মনের এক বর্ষায় এমনি করেই ছুটে বেড়াই, আনন্দে মাতি, আর-বর্ষায় সেই তেমনি মাটির দাওয়ায় একলাটি চুপচাপ বসে থাকি। আজও বুঝে উঠতে পারি না কোন্‌টা আমি।

বর্ষা এবার শেষ হয়েও হয় না। হরিদ্বারে এসে আটকে পড়েছি। আছি কনখলে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে। এবার চলেছি কেদার-বদরীনাথ-দর্শনে। ভারী বৃষ্টির চাপে চন্দ্রভাগা ফেঁপেছে, ফুঁসেছে; পাহাড়ি পথ ধসে পড়েছে। মেরামতের কাজ চলছে মাসাবধি কাল ধরে। এতদিনে কাজ শেষ হয়ে যাবার কথা। জ্ঞান মহারাজ বলেন, 'হরিদ্বার মানে হরির দ্বার— বৈকুণ্ঠের পথের দুয়ার। এই সিংহদ্বার খোলা পাওয়া ভাগ্যের কথা।' হবেও বা। কিন্তু কার ভাগ্যদোষে আটকে পড়লাম? মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি নিজেরা। আজ বারো দিন গত হল। বের হব বলে তৈরি হয়ে বসে আছি। চলতি-মুখে বাধা-পাওয়া মনের ভার কাটতে চায় না সহজে।

বৈশাখী অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে কেদার-বদরীর মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হয়, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় বন্ধ হয়ে যায়। ছ মাস যাত্রী-সমাগম, পূজা-অর্চনা, স্তব-স্তোত্র, ঘণ্টা-আরাধনা, মহা সমারোহ; তার পরই বরফে ঢাকতে শুরু হয়ে যায় দেশ, মন্দিরের মধ্যে একটিমাত্র ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলতে থাকে, দরজায় তালা লাগিয়ে দ্বারী পূজারী যাত্রী দোকানী সবাই নেমে আসে নীচে। জ্ঞান মহারাজ এ-সব স্থানে গেছেন বহুবার— গেছেন নিঃস্ব সাধু হয়ে, গেছেন লাখোপতি অনুরক্তের অভিভাবক রূপে। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ, সব আবহাওয়ারই অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। গতবারে যখন পূর্ণকুম্ভে এসেছিলাম, আকাঙ্ক্ষা ছিল কেদার-বদরী দেখে আসবার; তিনিই বলেছিলেন, 'বৈশাখে হাজার হাজার লোকের ভিড় হয় রোজ পথে, চটিগুলো থাকে অপরিচ্ছন্ন হয়ে; আর মাছির যা উপদ্রব! পথশ্রমে ক্লিষ্ট থাকবে দেহমন, ঘুমিয়ে খেয়ে শান্তি পাবেন না তাদের যন্ত্রণায়। যাত্রীদের ভিড় কমে বর্ষায়। বর্ষাটা আবার সুবিধের নয়। যান যদি তো বর্ষা কাটিয়ে শরতের গোড়াতে যাবেন। উৎকৃষ্ট

সময়। না গরম, না শীত। চারদিক তখন জলে ধোয়া-মোছা, ঝকঝকে পরিষ্কার। চটিগুলিতে ভিড় নেই, মাছি নেই; আরামে থেকে যেতে পারবেন।'

তাঁরই কথায় এসেছি এবারে বর্ষা কাটিয়ে শরতের মুখে। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ। বাস্ মোটর অচল সে ভাঙা পথে। এখান থেকে হৃষীকেশ, হৃষীকেশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত বরাবর বাস্ চলে। বাস্এর পথে হাঁটবার উৎসাহ কার বা থাকে? তার পরের পথ তো হাঁটতেই হবে। মুখ বুজে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বসে বসে আর ভালোও লাগছে না। হরিদ্বারও এবার আর মনে লাগছে না তেমন করে। সেবারের সেই জলুস যেন নেই এবারের এই হরিদ্বারে। ঘাসে জঙ্গলে ঢাকা পথের ধারের এই-সব জমি, হাজার লোকের বাস ছিল এতে। গেরুয়া রঙের ব্যস্ততা ছিল সারা পথ জুড়ে। একটা সুগম্ভীর প্রশান্তি বিরাজ করত লক্ষ লোকের ভিড়ের মাঝে; এখন তা আর খুঁজে পাই না এমন নিরবচ্ছিন্ন নিরিবিলিতেও।

তবু, বৃষ্টি খানিক থেমেছে, অলস ভাবে উঠে বসি বিছানায়। ভাবি, ঘুরে এলে হয় একবার গঙ্গার ধারটায়। সেদিন দেখে এসেছিলাম ব্রহ্মকুণ্ডে যাবার পথে বাঁধানো সড়কে হাঁটু-সমান কাদা বালি। পাহাড়ের কোলে শহর, বৃষ্টির জল পাহাড় ধুয়ে নেমে কাদামাটি থিতিয়েছে পথে। এত মাটি প্রতি বর্ষণে গলে আসে কী করে? এত মাটি পাহাড় পায়ই বা কোথা থেকে? দেখেছিলাম, কোদাল দিয়ে মাটি কেটে কেটে পথ পরিষ্কার করছিল মজুরের দল। দেখে আসি গিয়ে কতটা কাটা হল আজ।

হৃষীকেশে লোক গিয়েছিল পথের সংবাদ জানতে। খবর নিয়ে এল, এদিককার রাস্তা মেরামত হয়ে গেছে, কাল কি পরশু থেকে বাস্ চলবে যাত্রী নিয়ে। টিকিটও কিনে নিয়ে এসেছে সে বুদ্ধি করে।

লাফিয়ে উঠলাম। আর তবে দেরি কেন? আজই হৃষীকেশে চলে যাই, সেখানেই বরং অপেক্ষা করা ভালো।

সব গোছানোই ছিল, তবু বিছানা বাক্স আর-এক দফা খুলে ঝেড়ে, গোনা-গাঁথা কাপড়জামা নিয়ে বাড়তিগুলি আশ্রমে রেখে দিলাম। ফিরতি পথে নিয়ে যাব। অনর্থক ভার বাড়িয়ে লাভ কি? সের হিসেবে টাকা নেবে কুলি মাল বইতে। শশী মহারাজ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কিসে আমরা ভালো

থাকব, কোন্ জিনিসটা না থাকলে নির্জন নির্বান্ধব জায়গায় মুশকিলে পড়ব, সব-কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবছেন আর এসে বলে বলে যাচ্ছেন। কখনো-বা ভাঁড়ার থেকে বেলের বড়ি নিয়ে আসছেন, বলছেন, 'এগুলি সঙ্গে রাখুন, পথে-ঘাটে ভিজিয়ে খাবার সময় না পেলে এমনিই মুখে ফেলে খেতে খেতে পথ চলবেন।' ডালের বড়ি জানি, কিন্তু বেলের বড়ি দেখি নি আগে আর। অজস্র বেল, বেলের দিনে কত আর খাওয়া যায়। বাড়তি বেলগুলি গুলে ডালের মতো বড়ি দিয়ে রাখেন স্বামীজিরা। স্বাদে গন্ধে ঠিক যেন টাটকা বেল; রঙটিও তেমনি, রোদে শুকিয়েও বেশ স্বচ্ছ একটা লাল-গোলাপি মেশানো রঙ।

বলেন, 'আর, এই শিশিতে একটু কাঁচালঙ্কার আচার দিলাম, পথে আলুর ঝোল খেতে খেতে অরুচি ধরবে যখন, একটি-ছটি বের করে খাবেন। লাঠি নিয়েছেন তো সবাই এক-একটি? লাঠি ছাড়া এক পা চলা দায়। আপনি মোটা মানুষ, আপনি আমার এই বেতের লাঠিটা নিন। একবার বাতে ভুগে অচল হয়েছিলাম, একজন দিয়েছিল এটা, ধরে ধরে হাঁটতাম। এখন ভালো হয়ে গেছি, আর দরকার হয় না।' কাগজি লেবুও তিনি ফেলে দিলেন কয়েকটা আমাদের কাঁধের ঝোলাতে।

জ্ঞান মহারাজ এ যাবৎ রোজই একবার করে পথের বিধিব্যবস্থা বুঝিয়ে দিতেন, এখন আর-একবার পাখিপড়া করিয়ে নিলেন— কোথায় কী খাব, কোন্ চটিতে দিনে থাকব, কোন্‌টায় রাত্রে। কোন্‌খানে গরম জিলিপি ভালো ভাজে, কোথায় গরম দুধ খেলে শরীর চাঙ্গা হবে, কোন্ মোড়ে ভালো প্যাঁড়া মেলে, কোন্ চড়াইতে উঠবার সময় বস্তির ডানহাতি কয় কদম এগিয়ে গিয়ে গাছে কচি শশা ঝোলে— আট পয়সা চাইবে কিন্তু চার-ছ পয়সা দিলেই পাওয়া যাবে, তাই কিনে খেতে খেতে উঠলে গলা শুকোবে না, নয় তো এক পা ফেলতে-না-ফেলতে জলতেষ্টায় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে। কোথায় লাল বীন, পাকা টমাটো, বাঁধাকপি, ওলকপি প্রচুর, সব আর-একবার ফিরে বাতলে দিলেন।

তবু সয় না। তাড়াতাড়ি ঠাকুর-মন্দিরে গড় করে স্বামীজিদের প্রণাম করে পথে পা বাড়ালাম।

হঠাৎ মনে ভয় জাগল। অতদূরে যাব— নিঃসঙ্গ মন, দুর্গম পথ, যদি ক্লান্তি আসে মাঝ-পথে? একলা যদি আর না পারি এগোতে?

এলাম হৃষীকেশে।

সেই পুরোনো দল। বড়দি হলেন বড়োননদ, দাদা মানে নন্দাই, ব্রজরমণ, আর আমি। এ ছাড়া আছেন মেজোননদ, নিরু আর বগলাদিদি। দলে তেমন ভারী না হলেও, বয়সে তো বটেই। পথে কে কার ভরসা তাই ভাবি। দাদার বয়স আটষট্টি, বড়দি তাঁরই সহধর্মিণী কিশোরী-কাল হতে। মেজদি, বড়দিরই পরে, পিঠোপিঠি বোন। ব্রজরমণ বৈষ্ণব মানুষ, কামানো মুখ-মাথায় বয়স বোঝা দায়। তবু, সেই মুণ্ডিত মস্তকে সাদা-কালো চুলের আভায় মেলামেশা একটা ছাইরঙের প্রলেপ নিয়ে যখন আমায় প্রণাম করতে হাত বাড়ায়— সসংকোচে পিছিয়ে যাই। বগলাদিদি জয়রামবাটীর মেয়ে, বালবিধবা। বহু-কালের শখ কেদার-বদরী তীর্থ করেন। জ্ঞান মহারাজ প্রতিশ্রুত ছিলেন, সুযোগ-সুবিধে-মত তাঁকে কেদার-বদরী দর্শন করিয়ে দেবেন। আমরা যাব শুনে তিনি তাঁকে আনিয়ে দাদার হাতে জিম্মা করে দিলেন, বললেন, 'জয়রাম-বাটী শ্রীমার বাপের বাড়ি; সেখানকার মেয়েদের প্রতি বিশেষ একটা মমতা আমাদের, বোঝেনই তো। কথা দিয়েছিলাম ব্যবস্থা করে দেব, এবার দিলাম। হল তো বগলা?'

বগলাদিদির বয়স জিজ্ঞেস করি। ঘাড় কাত করে উপরের পাটির ডান-পাশের দুটিমাত্র অবশিষ্ট দাঁতে সযত্নে মিশি ঘষতে ঘষতে উত্তর দেন, 'কী জানি বাছা, কোন্ ছোটোবেলায় বিয়ে হয়েছিল, কতদিন আগের কথা, কিছু মনে নেই। দাঁতগুলি? সেবার গঙ্গাসাগরে গিয়েছিনু, নোনা জল লেগে কী যে কী হল, ফিরে এনু পরে এক-এক করে সব ক'টাই পড়ে গেল।'

আর, আমার বয়সের কথা নিজের মুখে আর কী করে বলি? অবিশ্যি, মার মত নিতে হলে আলাদা কথা। এই আসবার আগেই একদিন তিনি বসে বসে হিসেব দিচ্ছিলেন তাঁর সন্তানদের বয়সের। বড়দা থেকে মেজদা, সেজদা, দিদি, হয়ে আমার কাছে এসে বয়স ছাব্বিশের কোঠায় আটকে রইল।

শুনে, তেরো বছরের অভিজিত আমার, 'বাপ্ কা বেটা', একলাফে দিদিমার বিছানায় উঠে দু পা উপর দিকে তুলে দু হাতের দুই বুড়ো আঙুল মুখে পুরে শুয়ে শুয়ে চুষতে থাকল। বললে, 'দাদুলি, আমি তা হলে কথা বলতেই শিখি নি এখনো।'

নিরু বলে, 'হাসি পায় মনে করলে সেই তোমার বয়সী আমিই কিনা হলাম বয়ঃকনিষ্ঠ এখানে! কতকাল হয়ে গেল, ভুলে গেছি আস্বাদ। মা, মাসী, মামী, জেঠী হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি ছোটোর সঙ্গসুখ হতে। এ পীড়নে কষ্ট পেয়েছি কতবার, কতভাবে, কতখানে। এতদিন পরে আবার ছোটো সেজেও দেখি বিপদ কম নয়। কাল হৃষীকেশে আসবার সময় সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে আমিই যখন সকলের বিছানা বেঁধেছি আর খুলেছি, বারে বারে মনে হয়েছে— হায় রে, আমার চেয়ে ছোটো আর-একজন যদি কেউ থাকত দলে। ভাগ্যে আমি এসে পড়েছি হঠাৎ, বাঁচিয়েছি তোমাকে। সারা পথ তোমার কাজ ভাগাভাগি হয়ে যাবে আপনা থেকে।'

একই মায়ের আদরে মানুষ আমরা। সহজ সরল মনের নিরুকে ভালো লাগে সকলেরই। মুহূর্তে আপন করে নিতে জানে সে পরকে। তাকে পেয়ে ভরসা বাড়ে বড়দির। বলেন, 'তুমি না থাকলে সত্যিই আমার ভাবনার কথা হত।'

ভগবানদাস ধর্মশালায় আস্তানা নিয়েছি। বড়ো রাস্তার উপরে, বাস্‌স্ট্যাণ্ডের কাছে; মাল তোলানামা করতে হয়রান হতে হবে না। হরিদ্বার থেকেই মনবাহাদুর সঙ্গ নিয়েছে, গাঁ-সম্পর্কে আরো দু ভাই সমেত। তিনজনে আমাদের সব মাল সারা পথ বইবে, ফিরিয়ে আনবে, যাবে হরিদ্বারে, জ্ঞান মহারাজকে বুঝিয়ে দেবে মানুষ মাল— পুরো; তবে গিয়ে মুখ রক্ষা হবে মনবাহাদুরের তাঁর কাছে। এক মন ওজনের মাল বয় প্রতি কুলি। তবে, তেমন-তেমন জোয়ান হলে দেড় মন অবধি বইতে পারে। জল্‌পা'কেও দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে জ্ঞান মহারাজ। বলেছেন, 'এখন বুঝতে পারবেন না, মনে হবে নিজেরাই সব করে নেব। এক বেলা হাঁটলেই টেরটি পাবেন, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া চুলোয় যাবে; চটিতে পৌঁছেই বিছানাটা খুলে, কি খুলবারও সবুর সইবে না, সোজা টান হয়ে শুয়ে পড়বেন চটিওয়ালাদের ছেঁড়া চাটাইতেই। তার চেয়ে এই জল্‌পা সঙ্গে থাক্, এসেছে আপনা থেকে, একে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। পাহাড়ি লোক, তড়্‌বড়্ করে হাঁটবে, আপনাদের আগে আগে চটিতে পৌঁছে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল গরম করে ঠিকঠাক করে রাখবে, আপনারা গিয়েই গরম চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করবেন। পরে দেখে শুনে চাল ডাল ঘি নুন কিনে দিলেন, চটিতেই পাবেন; বাসনপত্রও ওরাই দেয়। জল্‌পা

ডাল ভাত চারটি ফুটিয়ে দিল, আপনারা স্নান করে খেয়ে, খানিক বিশ্রাম করে আবার চলা শুরু করে দেবেন। জল্‌পা বাসনপত্র ধুয়ে চটিওয়ালাকে সম্‌ঝে দিয়ে রওনা হয়ে আপনাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে।'

দোসরা সেপ্টেম্বর, উনিশ শো একান্ন সাল। হৃষীকেশের ঘাটে আজ খুব ভিড়। কী যেন কী যোগ আছে পঞ্জিকায়, বলেছিলেন বড়দি। আশপাশ থেকে যাত্রী এসেছে বহু। কোলে-কাঁখে ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছে অনেকে; সঙ্গের থলিতে ঝুড়িতে খাবার ভরা। স্নানের শেষে যে-যার স্বামীপুত্রকন্যাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে পাতার থালায় পুরি তরকারি সাজিয়ে, ঘাটের উপরেই। খিদে পেয়ে গেছে, দূর দূর হতে এসেছে হয়তো খালি-পেটে, বেলা হয়ে গেছে অনেকখানি। পানের দোকানীর ছোট্টো মেয়েটা কাঁধের উপরে ফাঁপা চুল নাচাতে নাচাতে নেমে এল ঘাটে। ঘুম থেকে উঠল বোধ হয়, ফোলা ফোলা মুখচোখ। সিঁড়ির পাশ হতে আঙুলে করে খানিকটা মাটি তুলে সে দাঁত মাজল, মুখ ধু'ল; এক আঁজলা জল খেল, খেয়ে আবার নাচতে নাচতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেল। গুজরাটী বউ ঘাটে বসে হাত ডুবিয়ে গঙ্গামাটি তুলে কাঁথা কাপড় পরিষ্কার করল। চুল ঘষল হিন্দুস্থানি বুড়ি মুঠো মুঠো মাটি তুলে নিয়ে। পূজারী এক এসে নিয়ে গেল খানিকটা মাটি শিব গড়তে। এক পাশে বসে দেখছি ঘাটের খেলা। স্নানের উৎসাহ তেমন নেই মনে। ঘাটের ওধারে বটের ডাল নুয়ে এসে পড়েছে জলে নিজেরই গুঁড়ি ছুঁয়ে। জলের উপরকার সেই পাকানো শিকড়টার উপরে, ভিড় থেকে আল্‌গা হয়ে জোড়াসনে বসে আছেন কে একজনা— সে যে অনেকক্ষণ হল। সাদা শাড়ির আঁচলে ঢাকা মুখ, ঢাকা সর্ব অঙ্গ। জন-কোলাহলের বৈচিত্র্য থেকে চোখ ফিরিয়ে বারে বারে দেখছি তাঁকে। গঙ্গা চলেছে ছলছল করে মোটা শিকড়ে ধাক্কা খেয়ে। হাওয়ায় নড়ছে ডাল, নড়ছে পাতা, উড়ছে আঁচল, ধ্যানমগ্না মূর্তির ব্যাঘাত নেই কিছুতে।

মনের ফাঁকে যে কথা তোলপাড় করছিল এতক্ষণ, তা সামনে চলে আসে। ভেসে ওঠে সকালের সেই ঘটনা। শেষরাত, ঘুম হয় নি ধর্মশালার বন্ধ ঘরে। উঠে পড়েছি। ফিকে আকাশে পাহাড়ের চুড়োগুলি মিলেমিশে আছে।

ঘুমন্ত নগরীতে জাগরণের হাওয়া লাগে নি তখনো। পাখিরা আভাস পায় নি ভোরের আলোর। এক পায়ে দু পায়ে পথে এসে পড়লাম। একপাল গোরু রাত্রিকালে দল বেঁধে পথেই ঘুমোয়। তারা কেউ উঠে দাঁড়িয়েছে, যেন আলস্য ভাঙছে; কেউ পা ফেলছে কি ফেলছে না, চলতে লেগেছে; কেউ বা হাঁটু মুড়ে আড়াআড়ি পথ জুড়ে নিশ্চিন্তে বসেই আছে। জড়োসড়ো হয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। জনমানবশূন্য পথ, ছমছম করে গা। এমন সময়ে কে ঐ একটি মেয়ে ঘুরঘুর করছে খ্যাপার মতো চৌমাথার মোড়ে? যেন মাটিতে কি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পা টিপে টিপে কাছে যাই। মেয়েটি আবছা আলোয় হালকা দৃষ্টি ফেলে এক খাবলা গোবর কুড়িয়ে নেয়।

লম্বা ছিপছিপে গড়ন, বুটিদার ময়লা মিলের শাড়ির আধখানা পরনে, আধখানা গায়ে জড়ানো ওড়নার মতো করে। কেমন যেন চেনা-চেনা ভঙ্গি, যেন ভুলে-যাওয়া কবেকার কোন্ শিশুকালের স্মৃতি। একমনে দাঁড়িয়ে থাকি। ঠিক, মনে পড়ে যায় সেই দিনের কথা। স্কুলে আমার পাশের বেঞ্চিতে বসত ফরসা রোগা লিকলিকে ছোট্টো মেয়েটি। কোনোদিন থাকত হলদে শাড়ি পরনে, কোনোদিন ফিকে নীল। ছোট্টো কপালের উপর কোঁকড়ানো কালো চুলের গুচ্ছ, পড়ার ফাঁকে কতবার মনে হত হাত দিয়ে আলগোছে সরিয়ে দিই। হেঁটে যেত, যেন বেতসলতা হাওয়ায় দুলত। বড়ো হয়ে কতবার তার সেই ভঙ্গিটি মনে এসেছে আমার। তাকে দেখব এইভাবে এতকাল বাদে এই দূর দেশে, কে জানত তা?

এগিয়ে গিয়ে শুধোই, 'তুমি পীযূষ না?'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে। বললে, 'হ্যাঁ, কিন্তু এ নামে তো এখন আর কেউ জানে না আমায়। অনেক দিন থেকেই নাম নিয়েছি কমলাবাঈ।'

বলি, 'এখানে এ-বেশে তুমি যে?'

সে বললে, 'সে কি আজকের কথা? কত ঘটনা ঘটে গেল জীবনে। বড়ো হলাম, বিয়ে হল। দুটি ছেলে একটি মেয়ে হল। স্বামী আবার ফিরে বিয়ে করল। ছেলেমেয়ে নিয়ে কাকার ঘাড়ে পড়লাম। কাকা বললেন, "এতগুলোকে এই দুর্দিনে খাওয়াই কোথা থেকে?" মেয়ে আর ছেলে দুটিকে রেখে চলে এলাম আমি। এখানে এক বাঙালির বাড়িতে ঝিয়ের কাজ

নিলাম। বছরখানেক ছিলাম। গিন্নির পছন্দ হল না, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।'

ছোঁ মেরে আর-এক থাবলা গোবর তুলে আধপাগলার মতো উন্মনা পীযূষ হাওয়ার আগে মিলিয়ে যায় পথের বাঁকে।

ভাগ্যের চাকা গড়াতে গড়াতে কোথা থেকে কোথায় কা'কে ঠেলে নিয়ে যায়। আস্থা থাকে না তাই বর্তমানে ভরসা রাখতে।

বছর পাঁচ-ছয়েকের ছেলেটা বড়ো বিরক্ত করছে তখন থেকে, মাছকে খাওয়াবার জন্যে গুলি কিনতে হবে তার কাছ থেকে। চার পয়সার গুলি কিনি, কাওনের খইয়ের বড়ো বড়ো নাড়ু পয়সায় দুটো করে। উঠে আবার যাব জলের ধারে। কুঁড়েমি লাগে। ছেলেটা ঘাড় বাঁকিয়ে হাত পেতে দাঁড়ায়—দুটো গুলি তার হাতে দিই। টপ্ করে তা মুখে পুরে আবার হাত পাতে। আবার দুটো দিই, আবার খেয়ে হাত পাতে। এবারে বাকি চারটিই তার হাতে দিয়ে বললাম 'মছলিকো খিলাও, যাও।' সে দু পা গিয়ে চারটে গুলিই একসঙ্গে মুখে পুরে খুকখুক করে হেসে চোখ মট্‌কে ছুটে পালাল।

পাঞ্জাবি সাধু স্নান সেরে উঠেছেন পাড়ে। দীর্ঘ উন্নত দেহ, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু। ঠিক অনুরাধাপুরে দেখা বুদ্ধের নির্বাণমূর্তির শিয়রে দাঁড়িয়ে বিষাদমগ্ন প্রিয়শিষ্য আনন্দ যেন।

কাঠের করঙ্ক হাতে নিয়ে চললেন সাধু। পিছনে পিছনে আমিও চলি। বাজারের পথে অনেকখানি এগিয়ে খেয়াল হয়, বাড়ির পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরেছি। ফিরে আসি। পথে আবার দেখা পীযূষের সঙ্গে। গঙ্গাস্নান করে ফিরছে সে, হাতে মরচে-পড়া মাখনের কৌটোয় এককৌটো গঙ্গাজল। বলল, 'রাস্তার উপরেই বাস্‌স্ট্যাণ্ডটার কাছে যে সাইকেল-মেরামতের দোকান, তার পাশেই থাকি আমরা। এসো একবার, কেমন ?'

শ্লথ পদে এগিয়ে যায় সে, ক্লান্ত দেহভার বয়ে নিয়ে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবি, প্রভাতের গোময়, দ্বিপ্রহরের গঙ্গাজল, এ-সবের কী মানে ? কোন্ প্রয়োজন মেটায় তার ?

বিকেলে আকাশে ঘোর মেঘ ঘনিয়ে এল। বৃষ্টি হবে কি ? বৃষ্টিকেই যেন এখন ভয় বেশি। আবার না আট্‌কে ফেলে।

সন্ধের দিকে একলা একফাঁকে বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে গেলাম, সাইকেল-মেরামতের দোকানও পেলাম দুটো তিনটে। কিন্তু কোন্ দোকানটার পাশের ঘরটা পীযূষের ঘর। উঁকিঝুঁকি মারি ভয়ে ভয়ে তফাত থেকে। ষণ্ডাগুণ্ডা গোঁফদাড়িওয়ালারা চার দিকে। আর-একবার শিউরে উঠল গা। ফিরে এলাম পীযূষকে না দেখেই। বললাম না কোনো কথা খুলে বড়দিকে মেজদিকে।

ভোরে হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগের বাস্ ছাড়ল। উঠলাম তাতে। যাত্রী-বোঝাই বাস্ দুলে দুলে চলল পাহাড়-কাটা পথে, পাহাড়ের গা বেয়ে। বাঁ দিকে উঁচু পাহাড়, ডান দিকে ঢালু খদ। সেই খদে গঙ্গা চলেছে গুরু গুরু রবে। উঠতি-পড়তি পথ, গঙ্গা যতই নীচে দিয়ে যায়, বাস্ ততই গর্জে ওঠে; যেন অসহ্য রাগে ফাটতে ফুটতে চড়াই চড়তে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে পাহাড়ি-পথের বাঁক, ইঞ্জিনের হুংকারে আস্ফালনে যাত্রীদের প্রাণ কণ্ঠাগত। গাড়ির ভিতরে ঠাসাঠাসি বসেও নিস্তার নেই কারো। মাথা-ঠোকাঠুকি, গা-ধাক্কাধাক্কি; গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে হুড়মুড়িয়ে সামনে পিছনে। উৎকণ্ঠায় বড়দি তাকিয়ে থাকেন ড্রাইভারের দিকে। হৃষীকেশ থেকে যখন বাস্ ছাড়ে—সময় বয়ে যায়, তবু ড্রাইভারের দেখা নেই। শেষে একজন গিয়ে দরজায় ধাক্কা মেরে বিছানা থেকে টেনে তুলে এনে তাকে বসিয়ে দিল স্টিয়ারিং ধরিয়ে। গোলগাল ফরসা মুখে আধবোজা লাল চোখ দুটো তখনো খোলে নি পুরোপুরি। ড্রাইভারের পিছনের সীটেই বসেছিলাম আমরা। একটা সিগারেট মুখে পুরে সে বাঁ হাত পিছনে বাড়িয়ে বলল, 'ম্যাচেস্?' টুকিটাকি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্গে দেশলাইও ছিল সঙ্গের ঝোলাতে। নিরু বের করে দিতে যাবে, বড়দি তার হাত চেপে ধরলেন, চাপা গলায় বললেন, 'পাগল নাকি দেশলাই দেবে? দেখছ না অবস্থা। কী রকম বেহুঁশের মতো গাড়ি চালাচ্ছে। মারাত্মক পথ, এর উপরে সিগারেট খেতে থাকলে বাঁচবার আশা থাকবে কারো?'

কাছাকাছি ছিলাম আমরাই। সেই আমরাই যদি না দেব দেশলাই, তো পাবে আর কোত্থেকে সে? সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে চেপে যখন দেখল কে ধরাবার আর উপায় নেই, তখন তা মুখ থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে বাঁ হাত দিয়ে স্টিয়ারিঙে তাল ঠুকতে ঠুকতে গান ধরল—'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে'।

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল নিরু। পাহাড়ির মুখে বাংলা গান, তায় আবার কবেকার কোন্ ছেলেবেলায় শোনা। নিরু উচ্ছ্বাসের আবেগে দেশলাইটা বের করে এগিয়ে দিল তাকে। বললে বড়দিকে, 'এর পরও কি না দিয়ে পারি থাকতে ?'

ব্যাসচটি বাস্‌স্টেশন। যাওয়া-আসার পথে সকল বাস্‌ই থামে একবার এখানে। উলটোমুখী বাস্ এসে না পৌছনো পর্যন্ত থেমে থাকে অন্যটি, পথ পরিষ্কার চাই। এ-সব পথে দুটো বাস্ মুখোমুখি পড়ে গেলে সর্বনাশ। না পারবে পাশ কাটাতে, না আগু-পিছু হটতে। তাই আপ ডাউন সব বাস্ এসে থামলে, দেখে দেখে, হিসাব মিলিয়ে, পথে আর বাস্ নেই স্থির জেনে তবে আবার চলতে শুরু করে। আমাদের বাস্‌ও থামল। দেখা গেল দেবপ্রয়াগ থেকে যে বাস্ ছাড়বার কথা তা এসে পৌছয় নি এখনো।

যাত্রীরা নেমে ঝরনার জলে হাতমুখ ধুয়ে চটি থেকে তৈরি গরম গরম ডাল-রুটি কিনে খেয়ে নিতে লাগল। দেখাদেখি আমরাও খেলাম। বেশ লাগল। চাও খেলাম। এই-সব বাস্‌স্টেশনে তৈরি খাবার পাওয়া যায়। যেতে আসতে যাত্রীরা খায়। নইলে রাঁধবার সময় কোথায়! শুনেছি আরো উপরে উঠবার সময়, হাঁটাপথ ধরব যখন, এই সুবিধেটা পাব না আর।

বাস্ ছাড়বার দেরি দেখে একটা চওড়া পাথরের উপরে উঠে গা এলিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ঝিরঝিরে শীতল বাতাস, ঠাণ্ডা পাথর, ছায়ায় ঢাকা জায়গাটি। গরম আলোয়ানে গা মুড়ে না-জানি কোন্ স্বপ্নরাজ্যে চলে গিয়েছিলাম। ঘন ঘন হর্নের শব্দে উঠে বসলাম।

ও-বাস্ এসে গিয়েছে, এ-বাস্ ছাড়বার জন্য তৈরি হয়েছে। যাত্রীদের ঠেলেঠুলে আপন স্থান বেছে নিলাম। আবার বাস্ ছাড়ল। সরু পথ, পাহাড়ি বস্তি, ঝাউ-দেবদারুর বন, সবুজ যবের খেত। নেশা লাগায় চোখে। খুদে খুদে বাড়ির ছাদে রোদে শুকোয় হলুদ ডাল, লাল লঙ্কা, সবুজ কলাই; নেড়েচেড়ে দেয় ফিরে ফিরে পলার-মালা-গলায় পাহাড়ি গিন্নি। পিতলের কলসী হাতে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়ে ঝরনার ধারে পাথরের গায়ে গা লাগিয়ে অলস ভঙ্গিতে, জল ভরতে এসে। শুকনো ডাল মটমট ভাঙে জীর্ণ বুড়ি আঁকশি দিয়ে টেনে লম্বা গাছ থেকে। বেশ লাগে।

দেখতে দেখতে রোদ তেতে ওঠে, হিমেল হাওয়া গরম হয়ে গা ভাপিয়ে

তোলে। ঝিম্‌ঝিম্‌ করে মাথার ভিতরটা। দেবপ্রয়াগে এসে পৌঁছই। ঘড়ির কাঁটায় বেলা তখন ঠিক একটা।

পাণ্ডা সূর্যপ্রসাদকে ঠিক করা ছিল আগে হতেই। তিনি এসে নামিয়ে নিলেন অলকনন্দা-ভাগীরথীর সংগমস্থল দেবপ্রয়াগে।

পুলের উপর দিয়ে ভাগীরথী পার হয়ে বাজার-বসতির ভিতর দিয়ে এগিয়ে আর-একটা পুল পেরিয়ে অলকনন্দা ডিঙিয়ে এপারে এলাম। এপারেও দোকানপাট, পাণ্ডার বাড়ি, যাত্রীর আবাস— ভাগীরথীর পাড়ের মতন। সূর্য পাণ্ডার বাড়ি অলকনন্দার পাড়ে। পাণ্ডারা যে যার যাত্রীদের নিজ আওতায় রাখে, পাকাপাকি দখলস্বত্ব বজায় রাখতে। ক্লান্ত শরীরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি উপরে উঠে তবে পাণ্ডার বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। পাহাড়ি দেশে যেমন হয়— খুপরি খুপরি ঘর, ছোট্টো বারান্দা, সরু সিঁড়ি, অন্ধকার দেয়াল, এও তেমনি। নামডাক আছে সূর্যপ্রসাদের। ভেবেছিলাম তাঁর নিজ বাড়ি যখন, আরামেই থাকতে পাব একটা দিন, একটা রাত্তির। তেতলার একটা ঢাকা বারান্দায় আমাদের নিয়ে গিয়ে যখন বাসস্থানের ব্যবস্থা দেখালেন, আপনা থেকেই সিঁটকে উঠল নিরুর নাক। সূর্যপ্রসাদ ঝানু লোক, দেখে এগিয়ে গেলেন নিরুর কাছে, বললেন, 'ও প্রথম প্রথম এমন সকলেরই হয়। সব জায়গাই নোংরা লাগে, গন্ধ লাগে, আলো হাওয়া কম লাগে। পরে চটিতে থাকতে থাকতে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখনো ধোপাবাড়ির পাটভাঙা কাপড় পরনে আছে কি না, সবাইকে বলবেন "হটো, হটো", "ওদিকে সরো"। যাক-না দুদিন, চটির ধুলো-কালিতে ময়লা হোক গা, তেলচিটে হোক শাড়ি, তখন বলবেন লোকদের ডেকে ডেকে, "এসো ভাই এসো, দূরে কেন, কাছে এসে বোসো"।'

তাঁর কথার ভঙ্গিতে হেসে ওঠে নিরু। বলে, 'বনবে ভালো এঁর সঙ্গে।' পাণ্ডাও হাসেন, কায়দায় ফেলতে জানেন তিনি লোককে।

নিরু বলে, 'পাণ্ডাজি, বুঝলাম সবই। তবু, মাটির মেঝে একটু নিকিয়ে ঝিকিয়ে রাখলে দোষটা কী। ধুলোটা কমে, পরিষ্কারও দেখায়। আর, কার-না-কার ব্যবহৃত জায়গা ভেবে মনটাও পিটপিট করে না।'

পাণ্ডা বললেন, 'কী যে বলেন! পরিষ্কার কি রাখতে দেয় যাত্রীরা?' নিরু বলে, 'তবে ক'টা খাটিয়া এনে দিন, শোব কিসে?'

'কতজনকে খাটিয়া দেব বলুন দেখি? বানের জলের মতো যাত্রী আসে। খাটিয়া দিয়ে কুলোতে পারে কেউ কখনো? তার চেয়ে দিব্যি মাটিতে বিছানা পেতে হাত-পা ছড়িয়ে আরামে ঘুমোবেন। যাত্রী বেশি হলে, চিত হয়ে ঘুমিয়েছিলেন, কাত হয়ে যাবেন, ল্যাঠা চুকে যাবে। নয় তো কেউ খাটিয়ায়, কেউ মাটিতে, রাত-দুপুরে মারামারি লেগে যাবে যে।'

রসিকপুরুষ সূর্যপ্রসাদ মুহূর্তে জমিয়ে তোলেন আসর। সব অব্যবস্থার বাহাদুরি নেন কেবল এক কথার জোরে, ক্ষিপ্ত যাত্রীকে বশেও আনেন সেই জাদুবলে। যাত্রী চরানো জাত-ব্যাবসা যাদের, এই গুণটি না থাকলে তাদের চলবে কী করে? রোগা পাতলা ছোট্টোখাট্টো মানুষ সূর্যপ্রসাদ; বেশ বাংলা বলেন। পূর্ববঙ্গের যাত্রীর সঙ্গেই বোধ হয় কারবার বেশি, তাই কথার সুরে পরিষ্কার বাঙাল টান। নিরু বললে, 'তাইতেই বোধ হয় আরো ভালো লাগছে এঁকে।'

সূর্যপ্রসাদ বললেন, 'এই ক'টা-মাস এখানে থাকি, তার পর যাত্রী আসা বন্ধ হলেই কলকাতায় চলে যাই। বাড়ি আপিস সব সেখানে। ছ মাস কলকাতায় বসে বসে যাত্রী জোগাড় করি। নয় তো পেট ভরবে কিসে? আমাদের ব্যাবসাই তো এই কিনা। পিতৃপুরুষের দান।'

এখান থেকে আরো উপরে পাহাড় বেয়ে কোথাকার কোন্ ঝরনা হতে এক কলসী জল নিয়ে এল জল্‌পা। তাই ছিটেফোঁটা ছিটিয়ে হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিলাম। পাণ্ডার লোকই তৈরি করে দিলে। বাজার করতে টাকা দিয়ে দিলেন দাদা। দুপুরের খাওয়াও তাঁর কাছেই খাব, কে আর রান্নার ঝঞ্ঝাট পোহায়। প্রথম দিনের অনভ্যাসের পথশ্রমে পরিশ্রান্ত সবাই।

ভাপসা গরমে ঘেমে উঠেছে প্রতিটি চুলের গোড়া। স্নান করে নিতে পারলে স্বস্তি পাওয়া যেত। চুলের ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে নিরু তাকায় চার দিকে। যেখানে এসে উঠেছি, কাছাকাছি জলের চিহ্ন দেখি না কোনো। ঝরনা, যেখান থেকে জল্‌পা জল আনল, সেখানে উঠবে কে? ক্ষমতা নেই কারো আর পাহাড় ভাঙবার। অলকনন্দা, তাও ঐ অতখানি

নেমে আবার উঠে আসতে হবে স্নানের পরে সেই পথ বেয়ে। নীচের দিকে তাকায় নিরু, বললে, 'অসম্ভব। বশে নেই পা।'

হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এলেন সূর্যপ্রসাদ, বললেন, 'কিছু ভাববেন না। এমন করে নিয়ে যাব টেরও পাবেন না। ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাতালে নিয়ে গিয়ে ভাগীরথীতে স্নান করিয়ে আনতে পারি। পরীক্ষা করে দেখবেন? চলুন।'

বড়দি বললেন, 'দেবপ্রয়াগে শুনেছি সংগমে স্নান করতে হয়। সে নাহয় কাল শুভক্ষণে করা যাবে। পিণ্ডদান ইত্যাদি নানা ব্যাপার আছে। আজ কোন্ গঙ্গাতে স্নান করি— ভাগীরথী, না, অলকনন্দায়? অলকনন্দা তবু কাছে, ভাগীরথীতে যেতে হলে অনেকটা হাঁটতে হবে। অথচ ভাগীরথীই নাকি দেবপ্রয়াগের আসল গঙ্গা। সূর্যপ্রসাদ বললেন, 'কী যে বলেন! অলকনন্দা হল স্বর্গের নদী, তার সঙ্গে কার তুলনা? ভাগীরথীর? ছিঃ। ভাগীরথীকে তো শেষে ডেকে আনা হয়েছে। কোন্‌টা ভালো, দত্তমশাই, আপনিই বলুন তো, অ্যাঁ?'

তাক্ বুঝে কথা ছুঁড়তে সূর্যপ্রসাদ সুদক্ষ, তা প্রথম আলাপেই বুঝেছি সবাই। ক্লান্ত শরীর হালকা হয়ে ওঠে তাঁর কথার চাতুরীতে। উঠে শাড়ি গামছা হাতে নিয়ে সরু গলি ধরে নামতে নামতে অলকনন্দার তীরে চলে আসি। ছোটো-বড়ো কালো পাথর জেগে আছে পাড়ের কাছে কয়েকটা। তারই এক-একটাতে এক-একজনা গিয়ে বসি। ঘূর্ণি দিয়ে তোড়ে ছুটেছে জল। সূর্যপ্রসাদ বললেন, 'এ-ঘটি দিয়ে জল তুলে কোনোমতে স্নান সারুন। সাবধান, জলে নামবেন না কেউ, বা পা পিছলে পড়বেন না। একবার পড়েছেন কি গেছেন, আর দেখতে হবে না আলোর মুখ। ওস্তাদ সাঁতারুদেরও রক্ষা নেই এর হাত থেকে। এ বড়ো সাংঘাতিক গঙ্গা। আমার বউদিকে সেবার নিয়ে গেল ভাসিয়ে। ঐ যে পাথরটায় আপনি বসেছেন, বড়ো দেখে বউদি ঐটাতে বসে একদিন কাপড়চোপড় কাচলেন, মাথা ঘষলেন। গিন্নিবান্নি মানুষ, সময় লাগত তাঁর স্নানে, হঠাৎ সেদিন কী করে পা ফসকে যায়, না কী হয়, বদরীনাথ জানেন, বউদি পড়ে গেলেন জলে। আধঘণ্টা ছিলেন— ঐ যে, ঐ ঘূর্ণিটাতে। ঘূর্ণির ঘোরে ঐখানটাতে এসে বার বার তিন বার হাত তুলেছিলেন। সোনার-চুড়ি-ভরতি ফরসা হাত ঝিকমিক করে উঠেছে রৌদ্রে। তার পরই স্রোতের টানে কোথা হতে কোথায় যে চলে গেলেন কে জানে। আর দেখা গেল না।

ভিজে মাথার উপর ভিজে কাপড়ের পুঁটলি চাপিয়ে এক পা এগোই, আর ফিরে ফিরে তাকাই। সর্বনাশী অলকনন্দার কিসে এত উন্মত্ত উল্লাস!

নিরু বলে, 'একটি মেয়ে তলিয়ে যায় চোখের সামনে? ঘূর্ণির কাছে হার মানে না এমন কোনো পুরুষ কি নেই এখানে?'

'থাকবে না কেন? খবর পেয়ে তখনি ডাকা হল, একদল জেলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কত খোঁজাখুঁজি, কত তোলপাড়, কোনো হদিস মিলল না আমার বউদির। দু মাস অবধি লোক ভাড়া করে পাড়ে পাড়ে পাহারা রাখা হল, হরিদ্বার অবধি। অজস্র ব্যয় হল। টাকার দিকে তাকাই নি তখন। ভেবেছিলাম, যদি দেহ পাওয়া যায় তো ক্রিয়াকর্মটা করাব শাস্ত্রমতে। পরে গুজব শুনি— লোকের মন, লোভ যাবে কোথায়— এক ডোম নাকি পেয়েছিল, গা-ভরতি সোনার গহনা দেখে লোভ সামলাতে পারে নি। গয়না-গুলো খুলে নিয়ে, তার পর পাথর বেঁধে দেহ ডুবিয়ে দিয়েছে।'

বাড়ির দোরে এসে পড়ি। রঙিন ওড়নার ঘোমটা ঝুলিয়ে একদল কচি কুমারী ঘুরঘুর করে আমাদের ঘিরে। জন্মাবধি যাত্রী দেখেও আশ মেটে না, কৌতূহলী দু চোখে তাই কত-না বিস্ময় ভরা। গোলগাল সুন্দর একখানি মুখের দিকে নজর করে নিরু বলে, 'বড়দি, তোমার কুমারীপূজার কুমারী দেখো।'

কল্পনায় সাজ দেখি: বড়দি এনেছেন আলতা, চিরুনি, বালা, বাসন্তী রঙের শাড়ি, পলার মালা। ভারি সুন্দর মানাবে।

সূর্যপ্রসাদ বললেন, 'আজকাল হালই বদলে গেছে। আগে কলকাতায় যেতাম, বরাবরই তো বাংলাদেশের সঙ্গে কারবার আমাদের, আগে মায়েদের মুখ দেখতে পেতাম না, ঘোমটায় ঢাকা থাকত। আজকাল মুখ খোলা।' নিরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি পাড়াগাঁয়ে থাকেন, আপনি কী বুঝবেন? এই মা খানিক বুঝবেন, এই মা তো কলকাতাবাসী', বলে সূর্যপ্রসাদ সোজাসুজি বড়দির দিকেই ঘুরে বসলেন, বললেন, 'বুঝলেন মা, আমাদের সমাজে ও-সব একেবারে নেই। হাতের কবজি অবধি ঢাকা জামা প'রে থাকবে মেয়েরা মার পেট থেকে পড়েই। হুটহাট বাইরে বের হওয়া তো দূরের কথা— আপনারা অনবরত পান খান—আমাদের মেয়েরা পান খেল তো জাতই গেল। ও মেয়েকে আর ঘরে নেবে না কেউ। কড়া শাসন।'

ওপারের পাহাড়টা ছেয়ে কেমন যেন একটা রুক্ষ ভাব। গাছপালা কোথাও কিছু নেই, কেবল একটা জায়গায় একটুখানি সবুজ, কয়েকটা কলা-গাছ আমগাছের। যেন ছোট্টো একটি নীড়ের শীতল ছায়া। অতদূর থেকে মানুষের সেই স্নিগ্ধ স্পর্শ এসে ছুঁয়ে যায় মন। কেউ কি থাকে ওখানে?

সূর্যপ্রসাদ বললেন, 'থাকতেন। এক সাধু বাস করতেন। সে এক গল্প। বহু বছর ওখানে তিনি একলা থেকে তপস্যা করলেন। দেখতেই তো পাচ্ছেন, জনমানব যাবার উপায় নেই, দুর্গম স্থান। দু-চার জন ভক্ত যাওয়া-আসা করত মাঝে মাঝে। অনেককাল কাটল। সাধু দেখলেন তাঁর জীর্ণ শরীরটা এবার ত্যাগ করবার সময় হয়েছে। একদিন নিজেই বাজারে গিয়ে তিল চন্দন কিনে এনে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে বিধিমত যজ্ঞ করে "ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা" ব'লে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করলেন। গত বছর ঘটে গেছে এই ঘটনা।'

তেতালার এই বারান্দা থেকে গোটা দেবপ্রয়াগ ভালোভাবে দেখা যায়। এক দিকে গঙ্গোত্রী হতে নেমে এসেছে ভাগীরথী, অন্য দিকে বদরিকাশ্রম থেকে এসেছে অলকনন্দা। দু দিক থেকে দুজনে এসে মিলেছে দেবপ্রয়াগের বসতি-ভরা তিন-কোণা কালো পর্বতটার সামনে। যেন দুই শুভ্র বাহু বাড়িয়ে আলগোছে আগলে আছেন মা যশোদা তাঁর কোলের শ্যামল কৃষ্ণকে।

অলকনন্দা, ভাগীরথী, দুইয়ে মিলে এক হয়ে এখান থেকে এক নাম নিল—গঙ্গা। এইখানেই গঙ্গার সৃষ্টি।

শাস্ত্রে বলে, দেবপ্রয়াগ দেবলোক, স্বর্গের সম্রাট্ ইন্দ্রের রাজধানী। স্বর্গের পথে পঞ্চ লোক— দেবলোক, সূর্যলোক, সত্যলোক, শিবলোক ও বৈকুণ্ঠধাম। পর-পর রাজ্য পাহাড় পেরিয়ে। বড়দি বলেন, 'দেবরাজ্যে নাকি দেবতার ছড়াছড়ি। আমরা দেখতে পাই না বলেই হাসাহাসি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করি। শত শত ভক্ত এ-সব স্থানে এই চোখেই কত দেবদেবী দর্শন করেছেন এসে।'

অলকনন্দার ওপারে উঁচু বাঁধানো ঘাট। মেয়েরা আসছে জল নিতে। রূপসী রমণীদল। ফিকে রঙের পাতলা ওড়না গায়ে, মাথায় পিতলের কলসী নিয়ে, বাঁ হাতে শাড়ি সামলে, ডান হাত হাওয়ায় দুলিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়িতে পা ফেলছে, যেন নৃত্য-ছন্দে মেনকা উর্বশী নেমে আসছে সুরলোকের নিত্য আসরে। দূরের আকাশে কোন্ কোণায় মেঘ জমেছে, তারই ছায়া ভেসে

চলল পাহাড়ের বুক বেয়ে। ছায়া চলে যেতে এল পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ, ঢেকে ফেলল পাহাড়ের গা।

সেই সাদা মেঘের পর্দায় ফুটে উঠল শক্ত হয়ে এ পাহাড়ের ঝাউ-মনসার ঝোপ। আলো তলিয়ে গেল, অন্ধকার এগিয়ে এল। এক দুই করে বাতি জ্বলে উঠল পাহাড়িদের ঘরে। রাত্রির কোলে কালো পাথরের বুকে সেই অসংখ্য আলোর ঝিকিমিকি এতক্ষণে ইন্দ্রের রাজধানীর ঐশ্বর্য এনে ঢেলে দিল মনে।

পরের দিন। ভোরে উঠেছি। আজ অনেক কাজ। পঞ্চ প্রয়াগ পড়ে পথে যেতে— দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ। প্রয়াগে পিতৃতর্পণ করা শাস্ত্রের বিধি। বিশেষ করে দেবপ্রয়াগ প্রসিদ্ধ এরই জন্য। দাদা এখানে তর্পণ করবেন ঠিকই ছিল। পাণ্ডাদের সঙ্গে আগে হতে রফা না করে নিলে দক্ষিণা নিয়ে বড়ো গোলমাল বাধে পরে। সূর্যপ্রসাদ বললেন, 'আপনি কত পর্যন্ত খরচ করতে চান তাই বলুন। সব রকমেরই বিধান আছে। গো-দান করবে? এক শো পঁচিশ টাকা লাগবে। না পারলে পঞ্চাশ, তাও না পারলে পঁচিশ, না হয় পনেরো, না হয়, না হয় একটা ব্যাঙ ধ'রে গো-দান করো। আমাদের শাস্ত্রে কী নেই বলুন?'

'দেবপ্রয়াগ নাম হল কেন জানেন?' শুধোন সূর্যপ্রসাদ।

বলি, 'শুনি, কেন?'

'দেবস্থানের জন্য ও নাম হয় নি। টিহিরির গুরু দেবশর্মার নামে নাম হল দেবপ্রয়াগ। এটা টিহিরি রাজ্য তো? দক্ষিণ থেকে এনেছিলেন তাঁকে। আমরা তাঁরই বংশধর— আসলে মারাঠী। এখানে কাক দেখতে পাবেন না। টিহিরির রানীর অভিশাপ আছে। মৃত্যুর পর রাজাদের শবদেহ এখানে আনে। এক রানী স্বামীর সঙ্গে সতী হতে চেয়েছিলেন, দেয় নি হতে। রানী তাই শাপ দিলেন, "যেখানে আমাকে সতী হতে দিল না সে জায়গার পিণ্ড কাকে ছোঁবে না।" দেখুন-না ক'দিন থেকে এখানে। এ পাহাড়ে, সে পাহাড়ে কাক এসে বসবে, কিন্তু দেবপ্রয়াগের এই পাহাড়টুকুর উপর দিয়ে উড়েও যাবে না কোনো কাক।'

অলকনন্দা-ভাগীরথীর সংগমে বাঁধানো ঘাট, ঘাটে মোটা লোহার শিকল। যাত্রীরা এই শিকল দু হাতে শক্ত করে ধরে দু সিঁড়ি জলে নেমে, মরি বাঁচি করে

ডুব দিয়ে ওঠে। আমরাও তাই করলাম। মাত্র দুটো ডুব, দু-চার মিনিটের ব্যাপার, পাড়ে উঠলাম যখন মনে হল বিরাট একটা যুদ্ধ সারা হল। কী ভীষণ গতি, যেন উন্মাদের অট্টহাসি। কাছে থাকলে আতঙ্কে বুক কাঁপে। একে শীত, তায় কন্‌কনে জলে স্নান, তার উপরে দুর্দান্ত হাওয়া— কাঁপতে কাঁপতে কাপড় বদলে রোদ দেখে ঘাটের পাশে বড়ো পাথরটায় পিঠ লাগিয়ে কুঁকড়ে বসি। ঘাটের উপর খানিকটা জায়গা জুড়ে বাঁধানো চাতাল। অনেক যাত্রী বসে গেছে পিতৃপুরুষদের তর্পণ করতে। গঙ্গাজলে আটা মেখে ছোটো ছোটো গুলি পাকিয়ে শানের উপরেই সারি সারি রেখে তিল হাতে নিয়ে কুশের আংটির জল ছিটিয়ে নামে নামে পিণ্ডদান করছেন দাদা। মাতৃকুল পিতৃকুল শ্বশুরকুলের বিগত সবাইকে আহ্বান করতে সময় লাগবে অনেক। গরম চাদরে পা ঢেকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসি।

নিরু বিড়্‌বিড়্‌ করে পাশে ব'সে, 'স্বর্গে গেছেন, সুখে আছেন, এই আটার গুলি খাবার জন্যে কেন মিছে তাঁদের ডেকে আনা ? তাঁদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু করবার বাসনা হয়, তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবার যদি কামনা জাগে মনে, তবে অন্য উপায় কি আর নেই কোনো ? ঐ দেখো, দেখো-না, ওদের তর্পণ শেষ হয়ে গেল, আর আটার গুলিগুলো কেমন হেলাফেলা করে জলে ছুঁড়ে দিল। সব-কিছুরই একটা সৌষ্ঠব থাকা দরকার। বেশ তো, শাস্ত্রমতে তিল গঙ্গাজল আটার পিণ্ডি দিয়ে পিণ্ডদান করলে— তামার থালায় ভালো করে সাজিয়ে করো। পরে থালা-সমেত ঘাটে নিয়ে যাও, ধীরে ধীরে সসম্মানে আটার গুলি জলে তলিয়ে দাও। কেমন একটা শান্ত গম্ভীর সংযত শ্রদ্ধা ফুটে উঠবে তাতে।'

সংগমের সামনের চড়ার উপরে মস্ত একটা পাথর, সেই পাথরের উপর সুন্দর একটা বাংলো-বাড়ি। শৌখিন লোক, যিনি করিয়েছেন এটি। অমন জায়গায় থাকতে পাই তো বেশ হয়। কেউ থাকে না নাকি এখন ? ধাঁ করে মনটা কালো পাথর বেয়ে লাল দেয়ালের গায়ের কাঁচের জানালাটা খুলে ভিতরে গিয়ে ঢুকে বসে।

সূর্যপ্রসাদ বললেন, 'দেখতেই ওটা সুন্দর, থাকার পক্ষে নয়।'

'নয় কেন ?'

'এখন না-হয় দেখছেন নামা-ওঠার পথ আছে ; ভাবছেন, বাঃ বেশ

সুবিধের তো ; কিন্তু যখন পাহাড়ের বুক পর্যন্ত জল উঠে যায়, আর এই এমন বেগ, অবস্থাটা একবার ভাবুন দেখি তখনকার ? না পারে তারা হাটবাজার করতে, না পারে কোনো খবরাখবর রাখতে। একদম দ্বীপের মধ্যে নির্বাসন। এই খরস্রোতে নৌকাও চলে না। কোন্ ভরসাতে থাকবে লোক ? নয় তো যে করেছিল বাড়িটা, শখ করেই করেছিল, ছিলও কিছুকাল। কিন্তু যেই জলে ঘিরল একবার, সেই-যে ভয়ে পালাল, আর আসে নি।

ঘাটে দাঁড়িয়ে কাপড় কাচবার কায়দাটি বেশ, পাহাড়ি বউয়ের আঁচলের এক কোণ মুঠোয় চেপে ছেড়ে দিল জলে, লম্বা শাড়ি স্রোতের টানে আপনা-আপনি আছাড়ি-বিছাড়ি খেল, ধুলোমাটি সাফ হল, বউ আস্তে আস্তে তা টেনে তুলে নিংড়ে রেখে দিয়ে আর-একখানি ছাড়ল।

সুর্যপ্রসাদ বললেন, 'ঐ যে শাড়ির ঐ মাথাটা ভাসছে, তার একটু ও দিকেই ঘাট হতে হাত কুড়ি দূরে বশিষ্ঠকুণ্ড। একটা পাথর আছে, এখন জলে ডুবে গেছে, জল কমলে দেখা যায়। ঐখানেই দেবরাজ ইন্দ্র বশিষ্ঠকে দিয়ে যজ্ঞ করিয়েছিলেন। পাথরের মাঝখানটায় কুয়োর মতো গর্ত, ওটাই ছিল যজ্ঞকুণ্ড।'

এই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডলের একজন। আর এই যজ্ঞের উপলক্ষ নিয়ে কত আখ্যান-উপাখ্যানই-না সৃষ্টি হয়ে গেল ; শিশুকাল হতে কতবার শুনে আসছি কত জনার মুখে, আজও তা ম্লান হয় নি একটুও মনের দিব্যলোকে।

হুহু করে ভাগীরথীর জল বিরাট পাথরটায় ধাক্কা খেয়ে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ছিল উপরের দিকে। তারই কণা কণা জলবিন্দু ভিজিয়ে দিয়েছে পিঠের চাদর। উঠে দাঁড়ালাম। পিণ্ডদান শেষ হয়েছে, আটার পিণ্ডগুলি কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাতে তুলে জলে ফেলে দিলেন দাদা, মাছগুলি কিল্‌বিল্ করে ঝেঁকে পড়ল খেতে। বিচিত্র লীলা। 'উজান জলে মছলি চলে, গজরাজ ভেসে যায়'— বিশাল গজরাজের দর্প চূর্ণবিচূর্ণ হয় যে স্রোতের দাপটে, সেখানে অতিক্ষুদ্র মাছগুলি এসে খেলে বেড়ায় সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে।

ঘাটের উপরে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, মন্দিরের পাশে পাথরের একটা অসমাপ্ত সিংহাসন। পাণ্ডা বললে, এই সিংহাসনে রামচন্দ্র এসে বসেছিলেন। মন্দির, মন্দিরের পাশ, সব দেখে দোকান হতে চা পুরি প্যাঁড়া খেয়ে যাবার জন্যে

তৈরি হই। এগারোটায় বাস্ ছাড়বে, সময় নেই বেশি। সূর্যপ্রসাদ উপদেশ দিলেন, 'এখানকার মাছির কামড় বড়ো সাংঘাতিক, কামড়ালে ঘা হয়ে যায়, শুকোতে চায় না সহজে। খালি গায়ে থাকবেন না, আর বেশি স্নান করবেন না। মাটিতে গা ঢেকে থাকলে মাছির কামড়ে পোকা হবে না ঘায়ে। আর শরীরের দুশমন মন, শরীরের বন্ধুও মন। শরীর প্রফুল্ল রাখতে হলে মন প্রফুল্ল রাখবেন। মন প্রফুল্ল রাখতে হলে খুব স্ফূর্তি করে পথ চলবেন। দেখবেন, মেজাজ গরম কখনো করবেন না, একবার গরম করেছেন কি গোটা পথেও আর ঠাণ্ডা হবে না। খুব হুঁশিয়ার। ভাত খাবেন গরম, কথা বলবেন নরম। নরম কথাটি বলবেন, আর যখন যা খাবেন গরম গরম খাবেন। কোনো ব্যাধি আসতে পারবে না কাছে। ব্যস্, এই কয়টি কথা মেনে পথ চলবেন। দেখবেন, রোগা আছেন মোটা হয়ে ফিরবেন; আর আপনার মতো ভারী থাকলে, আঁটসাঁট হয়ে আসবেন।'

মেজাজ গরমের কথা কিন্তু জ্ঞান মহারাজও বলেছিলেন। শুনে নিরু বিদ্রূপভরে হেসে উঠেছিল। জ্ঞান-মহারাজ হেসে বলেছেন, 'হুঁ, কত জনকে দেখলাম এই পথে যেতে আসতে। পথের কী গুণ, দলের মধ্যে মন-কষাকষি হবেই হবে, নেমে না আসা পর্যন্ত সে ভাব যায় না। শুনলে হাসি পায়, অতি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মনোমালিন্য হয়ে যায়। পর তো দূরের কথা, অতি আপন জনের সঙ্গেও হয়। মা-মেয়েতে হয়, মাসি-বোনঝিতে হয়, বোনে বোনেও হয়। এমন যে আমার পরিচিতা সদাহাস্যময়ী স্থির ধীর ক্ষমাশীলা মহিলা, চোখে পড়ে না সহজে দ্বিতীয় আর-একটি, সেবার কেদার-বদরী গেলেন আপন জনের সঙ্গে, তাঁরও দেখি একদিন মুখ ভার হয়ে উঠল। বলি, কী হল মা, মুখ ভার দেখি কেন? শুনলে এখন হাসবেন আপনারা, অতি সামান্য ব্যাপার, মা একদিন শখ করে রডোডেণ্ড্রন ফুল তুলেছেন আঁচল ভরে, নিজের হাতে পুজোয় দেবেন দেবতার, দিদি এসে ভাগ বসিয়েছেন সেই ফুলে। মাকেই যদি মন খারাপ করতে হল তো আপনারা কোন্ ছার। বেশ তো, ফিরবেন তো এই পথেই, দেখব কে কেমন মুখ নিয়ে ফেরেন, ঠিক ঠিক এসে বলতে হবে কিন্তু সব খুলে।'

কী যেন গোলমাল বেধেছে টিকিট-ঘরে, বাস্ ছাড়তে দেরি এখনো আধঘণ্টাটাক। টিকিট-ঘরের ছায়াটুকুতে বসে, উঁচু হতে নীচের দেবপ্রয়াগকে

ভালো করে দেখে নিই আর-একবার। আবার কবে আসব না আসব কী জানি। কাল রাত্রে সূর্যপ্রসাদের বাড়ির তেতলার বারান্দায় শুয়ে বারে বারে চোখ খুলে দেখেছি চার দিক আর ভেবেছি, বেশ হত যদি থেকে যেতে পারতাম আরো কিছুদিন এখানে। ভালো লেগে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, জানি না চিনি না, কেউ এসে কথা কইবে না, এমনিতরো একটা সামনে-খোলা বারান্দায় একাকী চুপটি করে বসে থাকি আর দু চোখ মেলে আলোতে-আঁধারে নগরের শোভা দেখি।

অলকনন্দার তীর ধরে পথ। জলধারার নিশানা নিয়ে মানুষ চলেছে মহাপ্রস্থানের পথে। এ পথের ভুলভ্রান্তি নেই।

বেলা তিনটেয় এসে পৌঁছই কীর্তিনগরে। বাস্ এই পর্যন্ত এসে থেমে থাকে। এখান থেকে তিন মাইল দূরে শ্রীনগর। শ্রীনগর হতে ফের বাস্ ধরতে হয় রুদ্রপ্রয়াগে যেতে। মাঝখানে এই কীর্তিনগর হতে শ্রীনগরের পথটুকু হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কীর্তিনগরের দোকানে গরম চা খেয়ে শরীরে উৎসাহ জাগিয়ে পুল পেরিয়ে আসছি এপারে, একদল বাচ্চা মেয়ে পথ আটকে পয়সা চাইল। মুখ গম্ভীর করে পাশ কাটাতে যাব— দুজন দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে চলার সামনে নাচতে শুরু করে দিল। যতই এগোই তারাও আগে আগে দৌড়ে গিয়ে গান ধরে আর ঘাগরা ঘুরিয়ে কোমর বেঁকিয়ে মাথায় হাত তুলে হেলে দাঁড়িয়ে হাসে। এবারে কান না পেতে পারি না— বুঝতে পারে তারা, চট করে ভঙ্গি বদলে আবার দু পা দৌড়ে এগিয়ে গানের সুরে সুরে নাচতে শুরু করে :

রাজা খাওয়ে হালুয়া পুরি
বরফী বানায়কে,
আউর, যোগী খাওয়ে রুখা-শুখা
ধুনী জ্বালায়কে।

কচি মেয়ের ছোটো ঘাগরার দোলা, ছেঁড়া ওড়নার লালিত্য, সরল দুষ্ট হাসি সব মিলিয়ে মনে সহজ আনন্দ জাগে। পয়সা না দিয়ে আরো কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে সঙ্গে টেনে আনি, আর গান শুনি :

রাজা ওঠি মৃগছালা
তাঞ্জামকী বীচ্‌মে,
যোগী ওঠি মৃগছালা
চিমটি বাজায়কে।
ডাণ্ডীমে শেঠ যায়
পয়সা বিলায়কে,
যোগী যায় নাঙ্গাপায়
ভিখ্‌ মাঙ্গায়কে।
তুলসীমে সাধু যায়
রামগুণ গায়কে॥

তাদের খিল্‌খিল্‌ হাসিতে ভরে ওঠে সরু পথটুকু। এবার এক-এক আনা হাতে দিতেই তারা মুহূর্তে সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে পিছনে-আসা যাত্রীর পথ আটকে নাচ-গান শুরু করে দিল।

শান্ত শীতল পায়ে-চলার পথটি। থেকে থেকে পাহাড়ি ঘোড়সওয়ারদের পর্ণকুটির। অথর্ব যাত্রীরা ঘোড়া নেয় হয়তো এই পথটুকু পার হতে। ভাঙা মন্দির, আম বট আক, ধানের খেত পাশে ফেলে চলি। নীল পাহাড়ে ঘেরা চার দিক। নীচের উপত্যকায় বিস্তীর্ণ অলকনন্দা, অনেকখানি পথ অতিক্রম করে এসে অলস আবেশে এলিয়ে দিয়েছে নিজেকে এখানে কয়েক মুহূর্তের তরে। সবুজ ঘাস সাদা বালির চড়ার ফাঁকে ফাঁকে অলকনন্দার স্থির রুপালি জল পদ্মানদীর স্মৃতি জাগিয়ে তোলে মনে। এই জায়গায় এই অলকনন্দাকে দেখে কে বলবে এ চঞ্চলা পর্বতদুহিতা। এ যেন শ্যামল বসুন্ধরার কোমল কন্যাটি, সাদায় সবুজে আলোতে ছায়াতে স্নিগ্ধা সুন্দরী।

কমলেশ্বর শিব আছেন এ পথে। সহস্র কমল দিয়ে শিবের পুজো করে বিষ্ণু সুদর্শনচক্র লাভ করেছিলেন এইখানে। সহস্র কমলের পুজো-পাওয়া শিব কমলেশ্বর নাম নিয়ে আছেন আজও, পথ হতে বেঁকে বাঁ দিকে খানিকটা ভিতরে ঢুকে জনপদ দিয়ে চলতে চলতে পেলাম তাঁকে। বহু পুরাতন মন্দির, নির্জন নিরালা। আশে পাশে দু-চারজন পাণ্ডা-পূজারীর ঘর নিয়ে ছোট্টো গাঁ। যাত্রীর সাড়া পেয়ে ছেলে মেয়ে বুড়ো যে কটি ছিল ভিড় করে ঘিরল: 'সুই তাগা দে।'

শশী মহারাজ যাত্রার বহুপূর্বেই বড়দিকে লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় দ্রব্য কী কী নিতে হবে সঙ্গে। সেইসঙ্গে এও জানিয়েছিলেন, প্রচুর পরিমাণে ছুঁচ-সুতো নিয়ে আসবেন। জ্ঞান মহারাজও বলেছিলেন, পাহাড়িরা টাকাপয়সার চেয়ে ছুঁচ-সুতো পেলে খুশি হয় বেশি। বনে জঙ্গলে থাকে, ছয় মাস তো লোকের মুখই দেখে না। দোকান-হাটই বা পাবে কোথায় তারা এইসব খুচরো জিনিস কিনতে। অথচ গরিব মানুষ সব, সেলাই করে করে কেবলই ছেঁড়া জোড়া দেয়। ঐ রকম জোড়ায় জোড়ায় নরম কম্বলের জামা ওদের শক্ত হয়ে ওঠে এক-এক সময়ে। কিছু তো কষ্ট নেই, কাঁধের ঝোলাতে রোজকার মতো কতকগুলি ছুঁচ গুটিসুতো রেখে দেবেন, থামতেও হবে না, ওরা এসে হাত পাতবে, চলতে চলতেই দিতে থাকবেন। ভারি খুশি হবে ওরা দেখবেন। আর মেয়েরা যদি টিপ কুম্‌কুম্ পায় তো কথাই নেই। বুঝতে তো পারবেন না ওদের ভাষা, ওরা ইশারায় আপনার কপাল দেখিয়ে ঐ জিনিস চাইবে আর খিল্‌খিলিয়ে হাসবে। সে বড়ো মজার।

জ্ঞান মহারাজের বর্ণনাগুলি বড়ো সুন্দর। এমন সরস করে বলেন! হরিদ্বারে যখন আট্‌কে ছিলাম রোজই শুনতাম তাঁর মুখে এ পথের গল্প। এক-দিন তাই বলেছিল নিরু, 'আর বসে বসে ভালো লাগছে না। লোকবিদ্রূপের লজ্জা যদি না থাকত তো এখান হতেই ফিরে যেতাম। আপনার কাছে যে ভাবে সব শুনলাম, ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে কিছুমাত্র অসুবিধেয় পড়ব না।' এমন-কি ঐ-যে ছোটো ছেলেটা আমার সামনে আজ হাত পেতে দাঁড়িয়েছে এসে, তার থ্যাব্‌ড়া লাল নাকটার ডগার ভন্‌ভনে কালো খুদে মাছিটাকেও যেন স্পষ্ট দেখেছিলাম সেদিন আমরা কনখলের গেস্ট্‌-হাউসে বসে।

ভীষণাকার একদল মোষ হুড়্‌মুড়্‌ করে ঢুকে পড়ল পথে একেবারে আমাদের গায়ের উপরে। রক্তবর্ণ চক্ষু, কালো লোমের চেকনাই, উদ্ধত জোড়া শিং— এক ফালি পথে গা ঠেসাঠেসি হতেই ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। যুবক রাখাল ভরসা দিয়ে মোষ আর মানুষের মাঝখানে দাঁড়াতে, আমরা ছুটে এসে ফাঁকা জায়গায় হাঁফ ছাড়লাম। সারা দিনের পরে ঘরে ফিরছে মাঠের মোষ ; পথ-জোড়া অচেনা প্রাণীর ভিড়ে বাধা পেয়ে বিরক্ত তারা, সামনে এগোবার আগে একবার গা কাঁপিয়ে দুই শিং ঝেড়ে হুংকার দিয়ে উঠল আমাদের দিকে তাকিয়ে।

সাড়ে চারটে নাগাদ শ্রীনগরে এলাম। শহরে ঢোকবার মুখে পুলিস আটকায়, টিকা ইনজেক্‌শন্‌ নেওয়া হয়েছে কি না। সার্টিফিকেট দেখতে চায়। যার নেই তাকে জোর করে টিকা ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিয়ে দেয়। মাড়োয়ারি বুড়ি টিকার নাম শুনে ওড়না ঘাগরা গুটিয়ে মরি-বাঁচি ছুট দিয়েও রেহাই পেল না। দৌড়ে গিয়ে ধরল তারা। চাদর মুখে চেপে চ্যাচাতে থাকে সে, অশুচি ওষুধ আর পরপুরুষে ছোঁওয়ার আতঙ্কে।

বাস্‌-স্ট্যাণ্ডের গায়ে লাগা খড়্‌গ সিং-এর ন্যাশনাল হোটেল। ভোর-রাত্রে বাস্‌ ছাড়বে, কাছে থাকাই সুবিধে। আজ রাত্রেই টিকিট কাটতে হবে, যাত্রীর ভিড়ে ঠাঁই মিলবে না সহজে, কে জানে এক দিন দু দিন তিন দিন, কয় দিন এখানে অপেক্ষা করতে হয়।

ঠাণ্ডা জলে স্নান করে আরাম লাগল। খড়্‌গ সিং-এর হোটেলে পাতলা ডালরুটি, পাঁপড়ভাজাও পাওয়া গেল, খেয়ে দোতলায় পথের উপরকার ঢালা বারান্দায় পর পর যাত্রীর পাশে আমরাও স্থান নিলাম।

একতলার দোকান থেকে কাঠের ধোঁয়া, লোকের কলরব, ফুলুরিভাজার গন্ধ ঠেলে উপরে উঠছে। যাত্রীরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে খিদের তাড়নায়, কেউ বলে এটা দাও, কেউ বলে ওটা। বগলাদিদি হোটেলের খাবার খাবেন না, ব্রজরমণকে নিয়ে দোকান ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পছন্দমত দামে মিলছে না পুরি-তরকারি যথেষ্ট পরিমাণে।

খোলা বারান্দার কিনারা ঘেঁষে বসি। দস্তুরমত বড়ো শহর শ্রীনগর। দালানে দোকানে গাছে গাড়িতে রাজপথ ভরাট। ঘুরে ঘুরে এই রাতে খানিক বেড়ালে হত। কিন্তু কাকে বলি?

ভোর রাত্রে আবার বাস্‌এ চড়লাম। চমৎকার পথ, দুদিকে সবুজের ছড়াছড়ি। কচি ধানের উজ্জ্বল নরম শিষ উপত্যকা ভরতি। বাঁকে বাঁকে বাস্‌ ঘুরে চলেছে, মুখ বাড়িয়ে আছে নিরু জানালা দিয়ে— কোন্‌ বাঁক ফিরতে দেখা দেবে রুদ্রপ্রয়াগ। প্রথম দেখার পুলক, সে যে আলাদা জিনিস। সবুজের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে একটা মোড়ের মাথায় যেই এসেছে বাস্‌, সে বলে ওঠে, 'ঐ, ঐ তো রুদ্রপ্রয়াগ।' প্রয়াগ দেখে চিনতে শিখে গেছে এর আগে সে। আর কি ভুল হয়?

দু দিক হতে দুই গঙ্গা এসে মিলেছে একটা পাহাড়ের মুখে। তার

গা-ভরা লালে সাদায় অঙ্গ-ঘেঁষাঘেঁষি ছোটো ছোটো বাড়ির চাল, যেন সারি সারি খেলাঘর। বিশেষ করে একটা জায়গায় যেন ছাদে ছাদে ভিড় লেগে যায়, দূর থেকেই বোঝা যায় সংগমের ঘাট ওখানটায়। বাস্ থামল। পুল পেরিয়ে অলকনন্দার এপারে এলাম। পাহাড়ে উঠতে বাঁ দিকের সারিতে চটি, দোকান, ধর্মশালা, পর পর ঘাট অবধি। ঘাটের উপরে বটের ছায়ায় ঢাকা সুশীতল আশ্রম একটি। জ্ঞান-মহারাজ এই আশ্রমের কথাই বলে দিয়েছিলেন আমাদের যে, 'স্বামী সচ্চিদানন্দ, অন্ধ সাধু, অতিশয় জ্ঞানী গুণী, তিনি নিজে টোল খুলেছেন ওখানে। ছাত্র পড়ান। যতটুকু সময় রুদ্রপ্রয়াগে থাকবেন, ওঁর কাছেই সময় কাটাবেন; যদি কিছু জানবার থাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন।'

সামনে স্রোতস্বিনী-ধারা। গাছের ছায়ায় বাঁধানো আঙিনায় দাঁড়িয়ে মনে হল, এইখানে শুয়ে হাতে মাথা রেখে খানিক দেখি একমনে তাকে।

খড়মের শব্দ লক্ষ্য করে তাকাই— ঋষিতুল্য সাধু এক পায়চারি করছেন ছায়ায়, যুবক ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ভাবে বোধ হয়, কিছু গভীর তত্ত্ব সহজ করে মেলে ধরছেন তিনি বাক্যের সাহায্যে শিষ্যের সামনে। চোখ দেখে বুঝি ইনিই সচ্চিদানন্দ। যুবকের চোখে আমাদের দেখে তিনি এগিয়ে এলেন কাছে। জানতে চাইলেন, কে আমরা, কোথা হতে এসেছি, কী করতে পারেন তিনি আমাদের জন্য। সুমধুর কণ্ঠস্বর। গেরুয়া চাদরের খুঁটটা মুখের সামনে তুলে কথা কইছেন, পাছে কোনোপ্রকারে থুথু ছিটে আসে। এত সযত্ন সতর্কতা। দুঃখ করলেন, বললেন, 'আগে হলে থাকবার ভাবনা ছিল না আমার এখানে। কিছুদিন হল ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হয়েছে এটা, ছাত্রতে ভরতি হয়ে গেছে সব। স্থানেরই অকুলান।' তাঁকে বিব্রত না করে, কালী-কম্‌লেওয়ালার ধর্মশালা কাছেই, তাতেই থাকব ঠিক করলাম। কতটুকু সময়েরই বা কথা। দুপুরটুকু মাত্র। আশ্রমের স্নিগ্ধ ছায়াটুকু মায়া ঢালে মনে। বারে বারে পিছু ফিরতে ফিরতে পথে নামি।

হাজার হোক দাদার ওকালতি বুদ্ধি! আমরা তো বারণই করেছিলাম, বলেছিলাম, 'পথে পথে চটি আছে, দরকার পড়লে ডাক-বাংলো আছে— ধর্মশালার কী দরকার? ও সাধুসন্ন্যাসীদের জন্যই থাক্।' ভাগ্যে দাদা শোনেন নি— হৃষীকেশে কালী-কমলেওয়ালার ছত্রে গিয়ে বদরীনাথ পর্যন্ত

উনত্রিশটা চটির প্রবেশপত্র নিয়ে রেখে দিলেন, বললেন, 'এ পথে আমরাও সাধুসন্তের শামিল। বলা যায় না কখন কোথায় কি ভাবে ঠেকি। সব কিছুর জোগাড় থাকা ভালো।'

এবারে সেই কাগজখানা দাদা পকেট থেকে বের করলেন। তাতে লেখা শ্রীমান অমুক দত্তজি, মোকাম অমুক, জিলা অমুক-বালোকে সাথ আট আদমি যাত্রা শ্রীবদ্রনাথজি কেদারনাথ কো আতে হৈঁ। ইন্‌কি খাতিরদারি কর্‌না। ইন্‌কো কিসি তরহ্ কি তকলিফ ন হোয়ে— ইত্যাদি পাকাপোক্ত ম্যানেজারের নামস্বাক্ষর-করা দিনতারিখ-দেওয়া হুকুম্।

লম্বা দোতলা ধর্মশালা, বহু যাত্রী থাকতে পারে এককালীন। উপরের বারান্দায় স্থান নিই আমরা। চৌকিদার একটা ছেঁড়া শতরঞ্জি পেতে দিয়ে গেল খাতির করে। বসে সময় নষ্ট করলে চলবে না। আজ হতে পথে চলা, পথে রান্না শুরু। দোকান থেকে চাল ডাল আলু ঘি কেনা হয়। বড়ো বড়ো গোলাপি পেঁয়াজ ঝুড়ি ভরা, শুধু পেঁয়াজের তরকারি রেঁধে খায় এরা— এ দিকে পেঁয়াজকে বলে রামগোটা। রামপাখিও দেখলাম নগরে ঢুকবার মুখে। বোধ হয় জমাদারদের পোষা; শখের যাত্রীও আসে অনেক, শখের হাঁটা হাঁটতে, তাদের প্রয়োজনে লাগে। এইরকম স্থানে ঐ রকম কদাকার মুরগিগুলি দেখে ভালো লাগে নি কেন কী জানি। পেঁয়াজ দেখে শখ যায় নিরুর; বললে, 'পেঁয়াজে দোষ থাকতে পারে, রামগোটায় দোষ কী? নামেই ধুয়ে গেছে সব। কিনি কিছু?' বাধা দেন বড়দি। বলেন, 'কিরণ, বগলা বৈষ্ণব সঙ্গে, কী দরকার ছোঁয়াছুঁয়ি, ভাগাভাগি করে। যা হয় এক ডাল ঝোল ভাত ফুটিয়ে খেয়ে নেব সবাই একসঙ্গে। ঘি বরং একটু বেশি করে কেনো; খাঁটি ঘি, দেশে তো আজকাল পাওয়া যায় না এখন, অন্য জিনিসের অভাব ঘিয়ে পুষিয়ে নেবে।'

অগত্যা রামগোটা আর কেনা হয় না। ঠোঁট ফুলিয়ে বক্‌বক্ করে নিরু, 'সাত্ত্বিক আহার, শুদ্ধ চিত্ত, সৎ প্রসঙ্গ, পাহাড়ি পথ—বাপ রে বাপ। একসঙ্গে এত টাল সামলানো দায়।'

চটিওয়ালাই পিতলের হাঁড়ি ঘটি থালা বের করে দিল। হাঁড়িগুলির বুকটা ভিতরটা পরিষ্কার ঝকঝকে, তলাটা কাঠের আগুনে পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে আছে। ও দিকটা আর সাফ করবার হাঙ্গামা করে না যাত্রীরা। মনে

হয় কালো লোহার চাকৃতি কেটে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সোনালি রঙের পিতলের হাঁড়িগুলির তলায়। যেন কালোতে-হলুদে কুটুম-পাখিটি।

কাঠও দেয় চটিওয়ালা উনুন ধরাতে। জল্‌পাকে রান্নার জিনিস বুঝিয়ে দিয়ে আমরা এগোই ঘাটের দিকে। বাসনা মনে, ধীরে সুস্থে স্নান সেরে আসতে রান্নাও শেষ হয়ে যাবে ততক্ষণে। গরম দুটি ভাতের জন্য অস্থির চিত্তে অপেক্ষায় থাকতে হবে না খিদের মুখে।

সরু ঘাট সিঁড়ি ধরে নেমে গেছে কত নীচে সংগমে, দুই স্রোতস্বিনীর পূর্ণ বেগের মিলনস্থানে। ভির্‌মি লাগে দাঁড়িয়ে খানিক দেখলে। নিজের দৃঢ়তা অবশ হয়ে আসে। দৃষ্টি তুলে এনে পায়ের পাতায় ফেলি। থেমে থেমে অতি সাবধানে সিঁড়ি নামি। এ ঘাটে জলে নামবার উপায় নেই। লোহার শিকল ধরে পাড়ে বসে ঘটি-ভরা জল মাথায় ঢালতে হয়। উত্তাল স্রোতের প্রলয়। চূর্ণবিচূর্ণ হয় পাথর চোখের নিমেষে এর এক আছাড়ে।

কোলের উপর নজর নামিয়ে শিকল ধরে বসি, আড়চোখে চাই, দেখি সিঁড়ির ডান দিকে মন্দাকিনী। জল তুলতে গিয়ে থমকে থেমে থাকি। তীব্র গতির কী সুসংযত মাধুর্য। মনে পড়ে যায়, মন্দাকিনীর জন্য একটা চাপা আগ্রহই যেন টেনে এনেছে আমায় এতদূরে। নামেরও কী আকর্ষণী শক্তি! প্রিয়সমাগমে চলেছে দুই জনা— মন্দাকিনী অলকনন্দা। মিত্রতার সময় এ নয়, বিরোধে কালক্ষয় করার সে ধৈর্যও নেই। ভয়ংকরী কলহিনী অলকনন্দা পথ ছেড়ে দেবে না। এতদূর এসে ফিরে যায় কোথায় মন্দাকিনী? কার কাছে? সেও যে সেই তারই ডাক শুনে ছুটে এসেছে একলা এতটা পথ। কোথায় কোন্‌ সুদূরে বুক পেতে আছে মহাসাগর, ঝাঁপিয়ে গিয়ে যে পড়বে সেখানে। প্রিয়মিলনে ব্যাঘাত ঘটাবে নিজের, অপরের? নীরব দৃঢ়তায় মন্দাকিনী মিলিয়ে দেয় নিজেকে অলকনন্দার মধ্যে। জয়ের উল্লাসে ঘন ফেনপুঞ্জ উথলে উথলে গর্জে এসে গ্রাস করে অলকনন্দা তাকে। এক দিকে উন্মাদিনী ধবলী অলকনন্দার উচ্ছৃঙ্খল আস্ফালন, আর-এক দিকে একাগ্রমুখী শ্যামলী মন্দাকিনীর শান্তকরুণ আত্মবিলয়। ভাবি, এই অলকনন্দাই যখন গিয়ে মিলবে সাগরে, তার আনন্দ-অধীরতার উচ্ছল নৃত্যের অভ্যন্তরে মন্দাকিনীর মৃদুকোমল স্পর্শ কি পুলক-শিহরণ জাগাবে না সাগরের বুকে? প্রিয়ার আলিঙ্গনের এই গোপন স্পর্শটুকু অন্তরে না পেলে কি ধ্যানী শিব বসতে পারতেন অমন মহাধ্যানে

মগ্ন হয়ে। তাই তো তাঁর ঠোঁটের রেখায় চোখের কোণায় ফুটে ওঠে ঐ মৃদুগভীর নীরব হাসি। চোখে না পড়ে কি পারে তা দেখতে চাইলে?

সবুজ সাদা দুই রঙ, একমুখী দুই জলধারা ডাইনে বাঁয়ে। ধীরে ধীরে অতি সাবধানে সিঁড়ির ডান দিক ঘেঁষে বসি, ঘটি ভরে জল তুলে নিই, এই মন্দাকিনীর জলই একটু ঢালব মাথায়।

জল্‌পার রান্নার তোড়জোড়ই সারা হয় নি এখন পর্যন্ত। নীচে হতে কলসী ভরে ঝরনার জল তুলে আনল এতক্ষণে, ডাল চড়াবে বলে।

ভিজে কাপড় রোদে মেলে পথের ধারের গাছতলাটায় গিয়ে বসি। কিচিমিচি রব তোলে মাথার উপরে কাকে শালিখে। পুরু লোমের ভিতরে থাবা ঢুকিয়ে কান চুলকোয় বাচ্চা কুকুরটা। তেলচিটে টুপিটা হাতে খুলে কুলির দল এসে শোয় গুঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে।

মৌচাক ঝুলছে ভিতরের ডালে ঘন পাতার আড়ালে। বন্‌বন্‌ উড়ছে কেবলই চাক ঘিরে। বড়ো অস্থিরতা। বাসা বেঁধেছিস, মধু জমিয়েছিস, থাক্-না এবার খানিক স্থির হয়ে চাকের গায়ে চুপটি করে। কিসের এত ছটফটানি? ভালো লাগে না। উঠে পড়ি। চটির দোকানের উপরেই খুপরি একটা ঘর—জল্‌পা রান্না করছিল, গিয়ে হাত লাগাই আলুর খোসা ছাড়াতে। বনে বাগানে চড়ুইভাতি করতে ছোটোরা যেমন তিনটে নুড়ি সাজিয়ে রান্না চাপায় সেইরকম ছোট্টো ছোট্টো কাঠের উনুন দেয়ালের গায়ে এক সারি। দু-তিন দল কাণ্ডিওয়ালা ডাণ্ডিওয়ালারাও এসেছে এই ঘরে রাঁধতে। হাঁড়ি-ভরা মসলা-গোলা জলে আলুর ঝোল চাপিয়ে হাতে টিপে টিপে আটার রুটি সেঁকছে আগুনে। পুবদিকের ছোট্টোতর দরজাটা দিয়ে দেখা যায় বিশাল বিশ্বের একটু-খানি অঙ্গ, ঝাউগাছের সবুজ মায়া, নীল পাহাড়ের গম্ভীর ডাক, ধূসর আকাশের উদাস হাতছানি। সহসা মনে হল যেন কোন্ এক মায়ারাজ্যের নির্বাসিতা রাজকন্যা একাকী আমি এই গুহার গহ্বরে সোনালি আলোয় ধোয়া একটুকরো জগতের সৌন্দর্য নিয়ে বসে আছি অনাদিকাল হতে।

ইচ্ছে করে, দরজার পাশের উনুনটাই দখল করে নিয়ে বসি আগুন জ্বালাতে। কুলিদের উনুনের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার, যত ফুঁ দিই নিজের উনুনে,

নিজের চোখের জলে বুকের কাপড় ভাসে। দিদিমা বলতেন, 'নিজের গরজ বড়ো গরজ।' রান্নাঘরের মতো এমন গোপন তপস্যার কুঠি আর বুঝি কোথাও মেলে না মেয়েদের। তাই তো দরদী বৈষ্ণবকবি কথায়-কথায় রান্নাঘরে ঢোকাতেন শ্রীরাধাকে, "রন্ধনশালাতে যাই, তুঁয়া বঁধু গুণ গাই, ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি।" এ কান্না একবার জাগলে কি আর রক্ষা আছে!

দেখতে দেখতে আরো অনেক যাত্রী এসে পড়েছে, কালী-কম্‌লেওয়ালার খালি ধর্মশালা ভরে উঠেছে। একদল বাঙালিও এসেছেন কলকাতা হতে ধুম-ধাড়াক্কা করে ডাণ্ডি-বেহারার কাঁধে চড়ে। নিরু শুধোয়, 'আপনারাও আজ থেকেই চলতে শুরু করবেন নাকি?'

ডুরেশাড়ি-পরা পুত্রবধূকে নিয়ে ঘাটে চলেছেন গিন্নিমা, বললেন, 'না ভাই, আজ আর পারব না। এই অবেলায় এসেছি, নাইতে খেতেই বেলাটুকু শেষ হয়ে যাবে। প্রথম চলাটা ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শুরু করলে ভালো না? আমরা অবিশ্যি ডাণ্ডিতেই যাব, সঙ্গের লোকজনের স্থবিধে-অস্থবিধের কথা ভাবছি। আপনারা কিসে যাবেন?' দু হাত জুড়ে কেদার-বদরীর উদ্দেশে ঊর্ধ্বে প্রণাম পাঠিয়ে বড়দি বললেন, 'আমাদের সামর্থ্য ভাই সামান্য। তাঁর নামে হেঁটেই রওনা হব। দেখি কতখানি দয়া পাই।'

কাণ্ডিওয়ালা-ডাণ্ডিওয়ালার ভিড় জমে। এখান হতেই ভাড়া করে নেওয়া হয় তাদের। কাণ্ডি হল, চা-বাগানে পিঠে যে ঝুড়ি বেঁধে চা তোলে কুলিরা, সেই রকমের ঝুড়ি বিশেষ। সামনের দিকটা কাটা। ভিতরে যাত্রীর কম্বল ইত্যাদি পুরে বসবার গদি মতো হয়। কোনো রকমে পা মুড়ে স্থির হয়ে বসে থাকতে হয় যাত্রীকে কাণ্ডিতে চেপে পাহাড়ির পিঠে। এক পাহাড়িই বয় কাণ্ডি। সকলে সমান টাকা ঢালতে পারে না, শীর্ণ শরীরে সামর্থ্য কম যাদের তাদের পক্ষে কাণ্ডি ছাড়া উপায় কী? ডাণ্ডি হল কাঠের চেয়ার, পালকির মতো ডাণ্ডা বের করা, চার পাহাড়িতে বয়, আরামে যাওয়া যায়।

বড়দির আর দাদার জন্যই ভাবনা। বিশেষ করে বড়দির ঐ তো শরীর, হাড় কখানা সম্বল। তার উপর বয়সের কথাও তো ফেলে দেবার নয়। ছেলেদের আশ্বাস দিয়ে এসেছেন, শারীরিক শ্রম হতে দেবেন না, পথে ঘাটে পেট পুরে খাবেন, ডাণ্ডিতে চড়ে ড্যাড্যাং ড্যাং যাবেন, শাল কম্বলে গা মুড়ে রাখবেন—কত কী। নিরু বললে, 'তোমার আর দাদার জন্য দুখানা ডাণ্ডি নেওয়া যাক

অন্ততপক্ষে ?' জিব কামড়ে মাথা নেড়ে বড়দি বললেন, 'পাগল ! জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে লোকে আসে এ পথে। কত আকাঙ্ক্ষার পরে কোন্ সুকৃতিবলে আসতে পেরেছি এতকাল পরে। চার পাহাড়ির কাঁধে চড়ে আবার ঋণ বাড়িয়ে যাব শেষে ? সে কি হয় ?'

কী আর করা যায় ? কালক্ষেপ না করে তৈরি হয়ে নিই। আজ হতে পায়ে চলা শুরু হল। বুদ্ধি করে বড়দি জোড়া জোড়া পট্টি এনেছেন জনে-জনের নামে। বললেন, 'পুলিসের মতো করে পায়ে জড়িয়ে বেঁধে নাও, নয় তো পায়ের ব্যথায় পা ফেলতে পারবে না একবার চলেই। গরম কাপড়ের আঁট বাঁধনে রক্ত-চলাচল সহজ থাকবে, চলার সময়ে পা তুলতে ফেলতে হালকা লাগবে।' মোজার উপর কেড্‌স্ পায়ে দিই। সেই ঢলঢলে জোড়াটা, হরিদ্বারে কেনা হল যেটা। কেড্‌স্ এনেছিলাম আমরা কলকাতা হতেই কিনে তিন-তিন জোড়া এক-এক জনে। কেড্‌সই একমাত্র জুতো এ পথে চলতে। হরিদ্বারে থাকতে দিন আর কাটে না, একদিন বড়দি পরামর্শ আঁটলেন, 'নতুন জুতো পায়ে দিয়ে একটু অভ্যেস করে রাখা ভালো ; চলো আজ বিকেলে কেড্‌স্ পরে বাজারে যাই।' ধব্‌ধবে আন্‌কোরা সাদা জুতো পায়ে দেখে সব দোকানিই হেসে একবার করে শুধোল, 'মাইজিরা কি কেদার-বদরী যাচ্ছেন ?' বুঝলাম, কেবল আমরা নয়, অনেকেই বোধ হয় এই প্র্যাক্‌টিস্‌টা এখানে এসে করেন। মনটা খুশিতে ভরা ছিল, টুকিটাকি জিনিসপত্তরও কিছু কেনা হল। ফিরবার পথে পায়ে কেমন কষ্ট হতে থাকল। ঘরে ঢুকে জুতো-মোজা খুলেছি কি দেখি, পায়ের দশটা আঙুলের আটটাতে ফোস্‌কা উঁচু হয়ে উঠেছে। বড়দি, মেজদি, নিরু, সকলেরই এক অবস্থা। ক'দিন গেল আঙুলের সেবা করতেই। বড়দি বললেন, 'এ তো চলবে না, কবে রওনা হতে হয়, চলো, আজ গিয়ে আর এক-এক জোড়া জুতো কিনে আনি সবাই।' জুতো কেনা হল পায়ের চেয়ে চার আঙুল বড়ো মাপের। বড়দি বললেন, 'এই ভালো, জুতোয় পায়ে অচ্ছুৎ ব্যবস্থা। আঙুলের ডগা ছুঁতেই পারবে না জুতোর মাথা। আশ্চর্য, এতজনে এত উপদেশ পরামর্শ দিল, আর এই আসল কথাটাই বলল না কেউ যে, পাহাড়ি পথে ঢিলে জুতো পরাই বিধেয়।'

জুতো মোজা পট্টি লাগিয়ে কোমরে শাল জড়াই। দরকার পড়লে খুলে গায়ে দেওয়া যাবে। মালপত্তর যাবে কুলির পিঠে, হয় আগে আগে, নয়

পিছনে। তারা চলবে তাদের ইচ্ছেমত। পথের মাঝে শীতে কাঁপলে তাদের পাব কোথায় তখন? তা ছাড়া দড়িদড়া দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যা করে বেঁধে মাল পিঠে ফেলে, কথায়-কথায় তা খোলা যে সহজ কথা নয়। শোলার টুপি দিলাম মাথায়, রোদ বাঁচাতে। ছাতা আনতে পারতাম, ছাতার কথায় জ্ঞান মহারাজ বলেছিলেন, 'ও কি প্লেনের রাস্তা পেয়েছেন, ছাতা ধরে ধরে চলবেন? ছাতা ধরা তো দূরের কথা, মনে হবে নিজেকে কেউ ধরলে যেন বাঁচি। যতটা পারেন ঝরঝরে রাখবেন নিজেকে।'

চোখে দিয়েছি সান্‌গ্লাস, এটার নির্দেশ সবাই দিয়েছিলেন, নয় তো নাকি গ্লেয়ার লাগে চোখে। কাঁধে ফেললাম ত্র-স্মৃতির ঝোলা— পেনসিল, কাগজ, লজেন্স, চুয়িংগাম আর একখানা 'নৈবেদ্য'। হাতে নিলাম শশী মহারাজের দেওয়া সেই মোটা বেতের ছড়িটা।

নিরু বললে, 'এবার সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম নিয়ে শুরু করো পথচলা।'

বাঁয়ে মন্দাকিনী রেখে চলেছি পাড় ধরে। দাদা মেজদি বগলাদিদি আমরা পর পর, একের পিছু অন্যে, লাইন বেঁধে। কালো পাহাড়ের গায়ে যেন লাল পিঁপড়ের সারি চলেছে পিল্‌পিল্ করে। একজোড়া মাড়োয়ারি স্বামীস্ত্রীও সঙ্গ নিয়েছে আমাদের। জমাট দলে ভরসা পায় তারা মিশে, এসেছে জয়পুরের এক গ্রাম হতে। বলে, 'আর কেউ নেই আমাদের সংসারে, কেবল এই দুই আত্‌মা আছি।' প্রৌঢ় স্বামীর প্রৌঢ়া স্ত্রী, ঘাগরা দুলিয়ে ওড়না উড়িয়ে পাশে পাশে হাঁটে। সিঁথির টিকলি উঁচু হয়ে আছে ঘোমটার নীচে, মাথায় কেরোসিন-টিনের ট্রাঙ্ক। এরকম ট্রাঙ্ক দেখেছি হরিদ্বারের বাজারে, কেরোসিন-টিনেরই একটা পিঠ কেটে কবজি এঁটে ডালা বসানো। তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখা যায় ট্রাঙ্কের মতো। যাত্রীদের পক্ষে সুবিধের। ট্রাঙ্কে ছাতু, গুড়, পথের খাবার ভরে এনেছে দেশ থেকেই এরা। স্বামীর কাঁধে কাপড়ের পুঁটলি। থেকে থেকেই থামে তারা, ক্লান্ত স্ত্রীর মাথা হতে টিনের ট্রাঙ্কটা তুলে নেয় ক্লান্ত স্বামী নিজের ঘাড়ে, স্বামীর কাঁধের পুঁটলি স্ত্রী তোলে মাথার উপরে। আবার পথ চলে দুজনে আগুপিছু করে। নামি উঠি, পাহাড়ের পর পাহাড় পিছনে রাখি। যতই এগিয়ে চলি ততই যেন

ব্যূহে ঢুকি। লাল সাদা দুই রঙে, দুই মেঘ দুই দিকের আকাশে, পুবে পশ্চিমে। নীচে কলকল মন্দাকিনীর জল। পাহাড়ি ঝরনা ঝরে অলক্ষ্যে, তার ধ্বনি শুনি কানে। চুঁইয়ে আসে সেই জলেরই খানিকটা, পথের ধারের কালো পাথরটা ভিজিয়ে। পাহাড়ি মেয়ে শুকনো ডালের বোঝা নামিয়ে ছিঁড়ে নিল চওড়া পাতাটা অশ্বত্থগাছের চারা হতে। বোঁটার দিকটা ঢুকিয়ে দিল পাথরের ফাটলের ফাঁকে। তির্‌তির্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ল পাতার গা বেয়ে। আঁজলা পেতে তৃষ্ণা মিটিয়ে সেই জল খেয়ে মেয়ে চলে গেল পিঠের বোঝা পিঠে তুলে নিয়ে।

বিকেলের রোদ সামনা-সামনি এসে পড়েছে চোখে মুখে। পশ্চিমমুখী আমরা চলেছি। জ্ঞান মহারাজ হিসাব করে বলে দিয়েছিলেন, কোন্‌ পথটা সকালে চললে ঠাণ্ডায় চলব, কোন্‌ পথে বিকেলে চললে সূর্য পিঠের দিকে পড়বে, কোন্‌ চড়াইটা রাত-শেষে উঠলে ক্লান্তি কম লাগবে, কোন্‌ উতরাইয়ে মন বেলাশেষে ঘরমুখো গোরুর মতো ছুটবে। এত সূক্ষ্ম হিসাবের পরও এমন দুর্গতি কেন আমাদের?

জ্ঞান মহারাজ সঙ্গে থাকলে নিশ্চয় বলতেন: 'প্রথম দিনের চলা কিনা। হয়েছে কী, এ তো কিছুই নয়। যখন পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙোবেন, একবার খদে নামবেন, একবার উপরে উঠবেন, একবেলা গরমে সেদ্ধ হবেন, একবেলা শীতে হিহি কাঁপবেন—তখন বুঝবেন মজা। ভাববেন, কী করতে এসেছিলাম মরতে এখানে।'

সরু সরু দড়ির ঝোলা পুল মন্দাকিনীর উপর। হয়তো এপার ওপার বন বসতি, এ-পারে থাকে গৃহস্থ স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে, আর-পারে কাটে কাঠ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে। গাছে পাহাড়ে ঢাকা কোথায় যে তাদের বাড়ি-ঘর, নজরে পড়ে না কিছু। ঝোলা পুলের নিশানায় কল্পনা করে নিতে হয়।

সন্ধে হয়ে আসে। আলো-আঁধারের আধেক-দেখা পথ ধরে চলে আসি 'ছাতোলি'তে, চলার পথের প্রথম চটি; তিন দিক ঘেরা সামনে খোলা, লম্বা বারান্দা এক-একটি, ভিড় নেই তেমন একটাতেও, বেছে বেছে আশ্রয় নিলাম ওধারের শেষ চটিটাতে। সঙ্গে পুরি তরকারি আছে দুপুরের তৈরি। কাঠের ধোঁয়ার গুমোট ভাপ থেকে রেহাই পাব প্রথম রাত্তিরটা। ভাবছি যদি যাত্রী বেশি থাকত আর এই এক বারান্দার দেওয়াল-ঘেঁষা উনুনগুলি সব একসঙ্গে

জ্বলত, ধোঁয়াতে কালীতে এরই মধ্যে শুয়ে থাকতে প্রাণ বের করে দিত। জ্ঞান মহারাজ মিথ্যে বলেন নি— 'বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে যান যদি তো এক চটিতে একরাত থেকেই ফিরে আসবেন দূর হ'তে কেদার-বদরীকে নমস্কার করে।'

মেঝেতে বিছানা বিছিয়ে ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে নিতে দেহের ক্লান্তি জুড়িয়ে এল। নিরু বললে, 'ভাবতে ভালো লাগছে, পাশেই মন্দাকিনী, সারারাত আজ শুয়ে শুয়ে শুনব তার কথা। কী বলে— বুঝব কি ভাষা? গভীর রাত্রের গভীর কথা মনে কি একটুও দাগ ফেলবে না?'

বড়দি বললেন, 'ও কী করছ? বারান্দার অত পাশে নিয়ো না বিছানা— রাতের হিম বুকে বসবে যে।' খোলা আকাশের নীচে হোল্ড-অলটা আরো টেনে নিতে নিতে নিরু বলে, 'তাকিয়ে থাকব, ঘুম না আসা পর্যন্ত, গাছের ফাঁকের ঐ বড়ো তারাটির দিকে। বাধা দিয়ো না বড়দি আমায়।'

গভীর রাত্তিরের হাল্‌কা আকাশের গায়ে লাগা নিরেট কালো পাহাড়ের মাথায় জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে ধ্রুবতারা যেন কী এক আশ্বাসবাণী নিয়ে। ঘুমে অচেতন পৃথিবীকে নিভৃতে জেগে পাহারা দিচ্ছে যেন সে নিজে একাকী জেগে। খানিক আগেও কালপুরুষ ছিল কাছে কাছে দাঁড়িয়ে, সে এবার উঠে গেল উপরে। কতটুকু বা সময়, এরই মধ্যে কতখানি ঘুরে গেল পৃথিবী। স্তব্ধ রাত্রিতেও বিরাম নেই গতির, রেখা রেখে চলে নিঝুম আকাশের গায়ে। এই যে রাত্রিদিনের একভাবে চলা, ক্লান্তি নেই, নিদ্রা নেই, একদণ্ড বিশ্রাম নেই, নিজের সৃষ্টির উপর এমনই কি মায়া বিধাতার?

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বড়দি এসে নাড়া দেন, বলেন, 'উঠে পড়ো, আলো না ফুটতে রওনা দেব, তৈরি হয়ে নাও সারাদিনের মতো।'

এই তো শুয়েছি, এখনি উঠতে হবে? ধ্রুবতারাটি গেল কোথায়? ডুবে গেল কি পাহাড়ের তলায়? উঠলাম, হাত মুখ ধুয়ে লণ্ঠনের আলোতে চুলটাও আঁচড়ে নিলাম। বিছানাগুলো বেঁধে জড়ো করে রাখলাম, মন বাহাদুররা উঠে নিয়ে যাবে ওদের সুবিধামত। শিশির-ভেজা হাওয়া শির্‌শির্‌ করে লাগছে মুখে হাতে। নূতন উৎসাহে পা ফেললাম পথে। রাত-ভর বিশ্রামের পর, ভোররাত্রের স্নিগ্ধ স্পর্শে লম্বা লম্বা দু পা ফেলেই মনে হল, আর কী, চোখের পলকে গিয়ে উপস্থিত হব অগস্ত্যমুনি চটিতে। জ্ঞান মহারাজ বলে দিয়েছিলেন, 'বেশি হাঁটবেন না একসঙ্গে, দু দিনে ঘায়েল হয়ে যাবেন।

ধীরে ধীরে এগোবেন, না-হয় অন্যদের চাইতে ছুটো তিনটে দিন বেশি লাগবে, তা লাগুক, শরীর-মন প্রফুল্ল থাকবে। প্রথম দিকে দু বেলায় দশ মাইলের বেশি পথ চলতে একেবারেই চেষ্টা করবেন না। পরে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে নেবেন নিজেদের ক্ষমতা বুঝে।'

ইচ্ছে হচ্ছে, তিনি সঙ্গে থাকলে দেখিয়ে দিতাম, একদিন কেন, একবেলাতেই পারি আমরা দশ মাইল যেতে। জানি কি ছাই, দু পা আর ছ পা'তে কত তফাত? খানিক যেতে না যেতেই তড়্‌বড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া আমি সকলের চেয়ে পিছিয়ে পড়ি। বড়দি তাড়া লাগান, 'এসো, আবার দাঁড়ালে কেন?' নিরু বলে, 'রোসো, সিনারি দেখে নিই।' শিল্পী হওয়ার মস্ত সুবিধে, মান বাঁচিয়ে পথ চলা যায় সঙ্গীদলের সঙ্গে। জ্ঞান মহারাজের মুখের হাসি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তিনি থাকলে এগিয়ে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে থেমে দাঁড়াতেন, হেলে লাঠিতে ভর দিয়ে হেসে বলতেন, 'কেমন, ঠিক বলেছিলাম কি না?'

প্রভাতের আলো সবুজ মুকুট পরিয়ে দিয়েছে পাহাড়গুলির চূড়ায়। পুবের পাহাড়ের কোল দিয়ে চলেছি আমরা, পাহাড় পেরিয়ে নীচে নেমে এসে আমাদের গা ছুঁতে আলোর এখানো ঢের দেরি। ঝুমুঝুমু নূপুর বাজিয়ে পাশ কেটে চলেছে মন্দাকিনী, যেন লজ্জাবতী বধূ। আপন মনে আহ্লাদে চলতে চলতে অচেনা পথিক দেখে লজ্জা পেয়ে ত্বরিতে পায়ের নূপুর নরম তালে ফেলে, অবগুণ্ঠনে নিজেকে আড়াল করে। মৃদু মৃদু বাজে ধ্বনি শরমজড়িত সে পদসঞ্চারে। মাঝে মাঝে দেখে নেয়, পথিক গেল কোথায়, কত দূরে। দেখে হঠাৎ ঘোমটা খুলে ফেলে খিল্‌খিল্‌ হেসে ছোটে খানিক নিরালা সুযোগ বুঝে। ঠিক যেন দিদিমার শিশুকালের ছবিখানি। আট বছরের বউয়ের ছোট্টো দুখানি পা ঘিরে গোছা-ভরা মল পরিয়ে দিয়েছেন শাশুড়ি। চলবে ফিরবে বউ, শব্দ হতে পারবে না, এমনিই ছিল শাসন। পায়ের মলে রব উঠলেই পাড়াপড়শি নিন্দে রটাবে, বলবে বউ বেহায়া। পা টিপে টিপে পা ফেলেন, ঝমর্‌ ঝম্‌ বাজনা বাজে। কচি মন, উপায় পান না খুঁজে। শেষে অনাথা এক বুড়ি পিস্‌শাশুড়ি শাড়ির পাড় জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে দিলেন মল, লুকিয়ে একদিন। দিদিমা বলতেন, 'মনের দুঃখে দু পায়ে হাত দিয়ে বসে বসে কেঁদেছি কত।' অথচ সেই মলই মুখর করে তুলত বাপের বাড়ির আঙিনা, চঞ্চল দুখানা পা ঘিরে নেচে দুলে।

আড়াই মাইল দূরে রামপুর চটি ঠিক স্রোতের উপরে। নিরু বললে, 'আগে জানলে ছাতালিতে কাল না থেকে এখানেই থাকতাম এসে।' বলি, 'কী লাভ হত? রাত্তিরে এসে রাত থাকতে উঠেই তো চলে যেতে হত ভালো মন্দ উপভোগ করবার সময় পেতে কোথায়?'

নিরু বললে, 'তাও তো বটে— তা না থেকেছি, নেই। কিন্তু বসি এসো খানিক এখানে। তবু তো একটু থাকার ভাব থাকবে লেগে মনে।'

রাস্তার উপরের দোকান থেকে গরম চা-ভরা পিতলের গ্লাস হাতে নিয়ে বসি চটিতে। গাছের ছায়ায় ঢাকা দোতলার খোলা বারান্দা, তলা দিয়ে বইছে কল্লোলিনী, পা ঝুলিয়ে বসলাম সেখানে। নিরু বললে, 'এক-একটা জায়গায় এসে হঠাৎ কেমন উন্মনা হয় মন, আকাঙ্ক্ষা জাগে থাকতে। ক্ষণে ক্ষণে এই থাকার সাধ কেন আসে ভেবে পাই নে। কার সঙ্গ-আশায় মনের এই গোপন আকুলতা?'

ধানক্ষেতের চিকন সবুজ ঝল্‌মল্ করে তীরে। মন্দাকিনী মায়ের জাত, কোমল প্রাণের দান তার পাষাণের স্তরে স্তরে। কাটারি হাতে কাওনের ছড়া কেটে ভরে রাখে পিঠের ঝুড়িতে পাহাড়ি মেয়ে। মুঠো মুঠো কাটে লিক্‌লিকে লম্বা ঘাস নূতন বাছুরটাকে খাওয়াতে। ছটফটে বাছুর কেবলই লাফিয়ে বেড়ায় অসংযত পায়ে, তফাত জানে না উঁচুনীচুর। পা ফসকে পড়ে যদি যায় খদে, তাই বাঁধা আছে মার কাছাকাছি কাঠের খুঁটিতে। আগে চলতে শিখুক মার পায়ে পায়ে, তখন ছেড়ে দেবে নিশ্চিন্ত মনে। ঘরের গায়ে একফালি জমিতে লাউ কুমড়ো ঢেঁড়স ডাঁটা ঠাসাঠাসি বোনা। লম্বা মোটা ডাঁটাগুলি দেখে ইশ ইশ করেন কেবলই মেজদি। ডাঁটার উপর বড়ো লোভ তাঁর। বলেন, 'এরা না খেয়ে রেখে দেয় কেন এগুলি ক্ষেত বাহার করে? চাইলে দেবে না?— না, না, অমনি কেন নেব, পয়সা দিয়েই কিনব।' এখানকার ডাঁটার পাতাগুলি অন্য ধরনের; সরু লম্বা লম্বা, আমাদের দেশের মতো চওড়া চ্যাপ্টা নয়। খেতে কিরকম কী জানি?

এঁকেবেঁকে চলেছি, উঠছি, নামছি, সোজা হাঁটছি, উবু হচ্ছি, হাতের লাঠিতে ভর চাপাচ্ছি। সবাই বলেছেন, প্রথম দুদিনই হাঁটতে যা কষ্ট, পরে অভ্যেস হয়ে যায়। সেই ভরসা নিয়েই চলি। পথের মাটি ধ্বসে পড়েছে থেকে থেকে, সংকীর্ণ পথ সংকীর্ণতর করে। পাহাড়-চোয়ানো ঝরনার জলে

কাদায় পিছল পথ। নিক্ষ বলে, 'অতিসাবধানে পা ফেলো যদি-না ভৃগুপাতের কামনা থেকে থাকে মনে।'

শুনেছি বদরীনাথ পেরিয়ে আরো উপরে বরফের শিখরে এক উঁচু শৃঙ্গ আছে, বানপ্রস্থের পর অচল দেহ পরিত্যাগ করতে যেতেন সে আমলের তাঁরা সেখানে; গিয়ে লাফিয়ে পড়তেন নীচে। জ্ঞান মহারাজ গিয়েছিলেন দেখতে একবার। উঠতে উঠতে সেই শৃঙ্গের শেষ সীমায় পৌঁছলেই নীচে এক গভীর খাদ। খাদের ভিতর আবার একটা কুয়ো-মতন, কুয়োর আড়াআড়ি একটা পাথর, আগে নাকি সেটা সুতীক্ষ্ণ ছিল। কেউ পড়বামাত্র দুখানা হয়ে অতল কুয়োয় অদৃশ্য হয়ে যেতেন। জ্ঞান মহারাজ বলেন, 'সেই এককালে লোকে ভৃগুপাতে যেত। এখন? এখন আর কেউ যায় কি না জানি নে। গেলেও দেহরক্ষা করার সুযোগ পায় না, সরকার উলটে আরো তার শাস্তির ব্যবস্থা করে।'

পাহাড়ের চূড়া বেয়ে সূর্যের আলো নামতে নামতে আমাদের মুখে, মাথায়, ঘাড়ে এসে পড়ল। ঘেমে উঠলাম। কতদূর আর? ডাইনে তাকাই, বাঁয়ে তাকাই, মাইল ফার্লং পোস্ট্ গুনি— ফুরোয় না পথ কিছুতে! সবে মাত্র পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে অগস্ত্যমুনিতে আসতে ক্লিষ্ট ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আমরা, পথের পাশের পুরোনো বটগাছের বাঁধানো গোড়াতে কাঁধের ঝোলা নামিয়ে যে যার মতো এলিয়ে পড়লাম। শুধোলাম বড়দিকে, 'এইখানেই থাকা-খাওয়া তো তা হলে আজ দুপুরে?'

পথ থেকে কিছু উপরে কালী-কমলেওয়ালার চটি। যাব কি না সেখানে ভাবছি, নীচের চটিওয়ালা বাধা দিল। বললে, 'যেয়ো না উপরে, জল নেই, পাইপ খারাপ হয়ে গেছে তিন দিন হল। বড়ো কষ্ট লোকের, নীচ থেকে বয়ে বয়ে উপরে জল তোলা বড়ো মেহন্নতের ব্যাপার। তার চেয়ে এইখানেই রান্নাবান্না করো, থাকো, খাও। আমার দোকানে সব পাবে। সবজিও আছে, একদম টাটকা।'

পি. ডব্লু. ডি. সারা পথে জলের সুব্যবস্থা করে রেখেছে যাত্রীদের জন্য। অনেক উপর থেকে ঝরনার জল পাইপ দিয়ে ধরে এনে পথের পাশে জলের কলের মতো বাঁধিয়ে দিয়েছে খানিক দূরে দূরেই। যাত্রীরা অনেক নিরাপদ এতে ক'রে। রোগভোগের আশঙ্কা কম। শশী মহারাজ, জ্ঞান মহারাজও

বলে দিয়েছিলেন পই পই করে, 'তেষ্টা পেলে পাইপ-লাগানো জায়গা থেকে জল খাবেন। খবরদার, অন্য কোথাও জল খাবেন না, প্রাণ গেলেও না। আর যখন-তখন তেষ্টা পেলেই যে জল খেয়ে নেবেন তা করবেন না। পাঁচ মিনিট জিরোবেন, ঠাণ্ডা হবেন, মিষ্টি মুখে দেবেন— এতে যেন ভুল না হয় কখনো; রোজ পথে বের হবার আগে মনে করে সকলের সঙ্গের ঝোলাতে বা পকেটে কিছু কিছু মিছরি রাখবেন, তাই খেয়ে তবে জল খাবেন। আর যদি কখনো কদাচিৎ গঙ্গার জল খেতেই হয় তো জল তুলে দশ মিনিট রেখে দেবেন। পরে দু-তিন ভাঁজ করে রুমাল বা কাপড়ে ছেঁকে তবে খাবেন। যাচ্ছেন একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, অসুখে বিসুখে অনর্থক পথে পড়ে থেকে কী লাভ? সাবধান হতে কণামাত্র আলস্য করবেন না।'

পি. ডব্‌লু. ডি.-র কলের কাছেই দোকানদারের চটি। চটির এক পাশে একখানা ঘরে বাস করে সে স্ত্রীপুত্র নিয়ে। চাল, ডাল, কাঠ, মসলাও সেই ঘরেরই কোণায় বড়ো একটা কাঠের বাক্সে রাখা। রাত্রে বোধ হয় শোয় তার উপরেই। থাকবার জায়গা, রান্নার বাসন সবই মেলে চটিতে বিনা ভাড়ায়; কেবল একটি কড়ার, সেই চটিওয়ালারই কাছ থেকে কিনতে হবে রান্নার কাঁচা সামগ্রী সব। এই ওদের ব্যাবসা, সারা বছরের ভরণপোষণের আয় তুলতে হয় পরিবারের। তাই দাম কিছু চড়া। যতই উপরে ওঠা যায় ততই নাকি দামের হার বাড়তে থাকে। হবেও তো তাই— কত কষ্টে এই-সব জিনিস বয়ে তোলে এরা সেই নীচে থেকে। দাম বেশি হলেও যাত্রীদের এতেই সুবিধে বেশি। কুলির পিঠে চাল ডাল চাপিয়ে আনতে যে টাকা দিতে হয় কুলিকে, তার চেয়ে এ সস্তা পড়ে। হাঙ্গামাও কম। যেখানে যা জোটে, ফুটিয়ে নিয়ে খেলেই ঝঞ্ঝাট গেল। বেশির ভাগ চটিতে নাকি আলু ছাড়া আর কোনো সবজিই মেলে না। গত কয়দিন একটানা আলুর ঝোল খেয়ে অরুচি ধরে গেছে মুখে। শুনি, কতজনে এই পথে খালি ফলাহার সংকল্প করে দেবদর্শনে যান। কী করে পারেন?

চটিওয়ালা ক্ষেত হতে একটা লাউ, আর দুটো ঝিঙে ছিঁড়ে এনে সামনে ধরতেই আমরা সুড়্‌সুড়্‌ করে তার চটিতে গিয়ে উঠে বসি। ঠাঁই নিই। এতক্ষণ ইতস্তত করছিলাম পথে দাঁড়িয়ে। চটিওয়ালা সবজি তিনটের দাম নিল দেড় টাকা। বড়দি মেজদি আছেন, রান্নার দিকে আমাদের না গেলেও

চলে। হোল্ড-অলটা খুলে রবারের তোশকটা ফুলিয়ে দাদার জন্য বিছানা পাতলাম। ভালোভাবে যেন বিশ্রাম নিতে পারেন তিনি। নিরু বলে, 'দাদাই একমাত্র ভরসা এ পথে, তাঁকে সেবাযত্নে কুশলে রাখতে পারলে তবেই আমাদের আশা থাকবে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার।' বিছানা পেতে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকি। উপরের চটিটা কেমন? এর চেয়ে ভালো নিশ্চয়ই। দেখেই আসি-না একবার। ভাবতে ভাবতে উঠে আসি উপরে।

বেশ বড়ো চটি— দোকান, বসতি; ছোটোখাটো একটা পল্লী। ঢাকঢোলের বাদ্যি শুনে ভিতরের দিকে এগিয়ে যাই, একটা ফটক পার হই। মন্দিরের আঙিনায় শিঙা-কাঁসর-ঘণ্টাও বাজছে তার সঙ্গে। অগস্ত্যমুনির আশ্রম এটি। স্নানপর্ব চলছে অগস্ত্যের, তাই এত ঘটা। জুতো খুলে মন্দিরের ভিতরে ঢুকলাম। বহুকালের মূর্তি। নিত্য মাজাঘষা, বেশ-প্রসাধনে তামার মূর্তি গোলাপি জ্যোতি ফুটিয়ে বাহার ধরেছে। মূর্তির মুখের গড়ন ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে লেপাপোঁছা মুখে উঁচু নাকের এখন আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। কেবল বাঁকা ঠোঁটের ফিকে রেখায় হাসির একটু আভাস মেলে। আজ বিশেষ তিথি, সূর্য-ষষ্ঠী। অগস্ত্যমুনি সূর্যোপাসক ছিলেন, তাই বিশেষ ভাবে উৎসবের এই আয়োজন। দিনের চার প্রহরে পুজো হবে, হোম হবে, ধুমধাম ব্যাপার। পূজারী দুঃখ করলেন, আর-একটু পরেই শৃঙ্গার হবে, তখন দেখলে মন খুশি হত। নিরু বললে, 'যাই বল, এই কিন্তু আমার ভালো লাগছে বেশি। স্নান হচ্ছে, তাই আবরণ-আভরণ খুলে ফেলা হয়েছে, আসল মূর্তিটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নয় তো আসলকে আমরা দেখি না সচরাচর। নকল হাত, নকল মুখ, বসন ভূষণ, একে একে সব অঙ্গে যেন মুখোশ চাপানো। আগে জানতাম না এ রহস্য। সেবার কাশী গেলাম, অন্নপূর্ণার মন্দিরে, সোনার অন্নপূর্ণা, ভিতরে ঢুকতে দেয় না কাউকে, ধনরত্ন চুরি যাবার ভয়ে। একবার নাকি কী একটা ব্যাপার ঘটেছিল, কে কী চুরি করতে চেষ্টা করেছিল, সেই অবধি সোনার অন্নপূর্ণা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দূর হতেই দেখছি অন্নপূর্ণাকে, জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে সোনার মুখ প্রদীপের আলোতে, ভারি খুশি হলাম দেখে। চিবুকের গড়নটি ঠিক যেন দিদির চিবুকের মতন। পরদিন আবার গেলাম, দেখি অন্নপূর্ণার মুখখানা যেন কেমন-কেমন। রাতারাতি পালটে গেছে। বারে বারে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখছি, আমার

চোখেরই কি কিছু ভ্রম? বড়দি ছিলেন সঙ্গে, জিজ্ঞেস করলাম, "আলাদা রকমের মুখ দেখছ না আজ অন্নপূর্ণার?" বললেন, "কই, না তো? মায়ের মুখ আবার ক্ষণে ক্ষণে বদলায় নাকি? মা— মা'ই।" কিন্তু আমি যে নিশ্চয়ই জানি, এ চিবুক সে চিবুক নয়। বাড়ি এসেও মন স্থির হয় না। পাণ্ডাকে বলি, "অন্নপূর্ণার মুখ আজ অন্যরকম দেখলাম যে?" পাণ্ডা বললে, "আজ অন্য পূজারীর পালা। তাই সে তার নিজের সাজ দিয়ে সাজিয়েছে মাকে। সোনার আলাদা আলাদা মুখ থাকে পূজারীদের কাছে, নিজ নিজ পালা এলে তাই দিয়ে মূর্তি সাজায়।" সেই সেবারই জানলাম, শৃঙ্গার মানেই মূর্তির মুখে গায়ে হাতে পায়ে যার যেমন ঐশ্বর্য বুঝে সোনা-রুপোর মুখোশ পরায়, সর্বাঙ্গে অলংকার চাপায়; আসলকে চাপা দিয়ে জলুস ফোটায়। অগস্ত্যমুনিরও তাই হবে শৃঙ্গারে, স্নানপর্ব সমাধা হলে।' কোথা হতে বেশ বড়ো দুটি সূর্যমুখী ফুল তুলে এনে রেখেছে তাম্রপাত্রে। ফুলের বড়ো অভাব, পথে এখন পর্যন্ত ফুল তেমন পড়ল না চোখে; এক হলদে কলকে আর বুনো জবা ছাড়া।

বেরিয়ে এলাম মন্দির হতে। খালি হাতে ফিরব? এদিক-সেদিক ঘুরছি, মনে পড়ল বড়দি বলেছিলেন, বেলপাতা নিতে হবে কেদারনাথকে পুজো দিতে। বিল্বপত্র, তুলসীমঞ্জরী, কেদারনাথ বদরীনারায়ণ দুই দেবতার দুই প্রিয় জিনিস। মায়ের হাতের এয়োতির শেষ চিহ্ন সোনা-বাঁধানো নোয়াটি গলিয়ে গড়িয়ে এনেছেন বড়দি ভোলা মহেশ্বরকে পুজো দিতে স্বর্ণ বিল্বপত্র দুখানি, তবু কয়টি টাটকা সবুজ বেলপাতা নইলে কি মন মানে? দুঃখ করছিলেন তাই।

জ্ঞান মহারাজই নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন, 'কেদারনাথে বেলপাতা পাওয়া দুষ্কর। পেলেও সে শুকনো— পাণ্ডার কবেকার নিয়ে রাখা; পুজো করে আরাম পাবেন না। পথে আর কোথাও মিলবে না, এক শেষ ভরসা অগস্ত্য-মুনি। ওখান থেকেই কিছু বেলপাতা নিয়ে নেবেন সঙ্গে। ও ক'টা দিন টাটকাই থাকবে। এখান থেকে দিতে পারতাম, কিন্তু গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে সেই পাণ্ডাদের বেলপাতার অবস্থাই দাঁড়াবে।'

মন্দিরের পিছনে বেলগাছ, পূজারীর অনুমতি নিয়ে কোঁচড় ভরে বেলপাতা তুললাম। ছোটো ছোটো বেলও ধরেছে গাছে অনেক। বড়দি খুশি হবেন শিবের মাথায় বেল দিতে পেলে। কচি বেল সমেত দুটো ডালও নিলাম ভেঙে।

পাশে গরম চা, দুধের দোকান। এক কেটলি গরম চা নিয়ে গেলে হয় নীচে, সবাই মিলে খাওয়া যাবে। বড়দিরা হয়তো এতক্ষণে উনুন ধরিয়েছেন কি ধরান নি ; গরম চায়ে আগ্রহ দেখাবেন নিশ্চয়ই।

বুড়ো পাহাড়ি গড়গড়া টানছিল দোকানের কোণে বসে। বললেন, 'মাঈ, দেশের অবস্থা কী? যুদ্ধের কী খবর? এ-সব জায়গা তো জগৎ হতে আলাদা। আগুনে পৃথিবীটা পুড়ে গেলেও কেউ কিছু জানতে পারবে না এখানে। একটু আঁচ লাগবে না কারো গায়ে। এখন কাশ্মীরের জন্য এদিককার পাহাড়গুলি তবু খানিক রক্ষিত ; আগে তো কিছুই ছিল না। কেউ আছি কি মরেছি কে খবর নেয়? পাথরে থাকি, পাথর কেটে খাই, ব্যস্, জীবনের কাজ সারা হয়ে যায়। পশুর মতো জীবন। যখন আমি যুবক, কলকাতায় বউবাজারে ছিলাম কয়েক বছর। সে রাজ্যই আলাদা। সবাই কী চালাক। কত তাদের কাজ। মুসলমান-পট্টিতে ছিলাম, হিন্দুও অনেক ছিল, সব ভাই-ভাই। বুঝবার জো ছিল না কে হিন্দু কে মুসলমান। কেবল 'আদাব' আর 'নমস্কার' এই মাত্র তফাত ছিল। এখন শুনি এ ওর দুশমন। কী হল মাঈ দুনিয়া জুড়ে?'

গরম গরম বেসনের পকোড়ি আর গরম চায়ের কেটলি হাতে তুলে নিলাম। যাবার পথে ফেরত দিয়ে যাব বাসন। প্রথমে ইতস্ততঃ করছিলাম, আহা একটা ফ্লাস্ক্ সঙ্গে থাকলে কী ভালোই হত— গরম চা নিয়ে নিতে পারতাম এখান থেকে। দোকানীই বাতলে দিল, বললে, 'কেটলি ধরেই নিয়ে যাও না—ভাবছ কেন অত? আগে খেয়ে ঠাণ্ডা হও, ক্লান্তি কাটুক, তার পর জিনিস ফেরত দেবার কথা ভেবো।' বলি, 'পয়সাও যে নেই সঙ্গে।'

দোকানী হাসে। হাত নেড়ে ইশারা করে নীচে নামতে, বলে, 'জলদি জলদি নেমে চা খাও গে যাও,' বলেই মুখ ঘুরিয়ে এক খাবলা গোলা বেসন হাতে তুলে নিয়ে টপ্ টপ্ বড়া ছাড়তে লাগল গরম কড়াইতে।

যাত্রীদের 'পরে এদের অগাধ বিশ্বাস। জানে, একই আকাঙ্ক্ষা প্রাণে নিয়ে ধনী দরিদ্র সবাই আসে বিপৎসংকুল এই একটি পথে ; কী— না, দেবদর্শন করবে। এত কষ্টের পথ, এ কি ছলনা-চাতুরীর? যদিই বা কেউ কখনো এমন দোষ করে ফেলে, 'শিবজী'র নামে মেনে নেয় এরা, বলে, তাঁর মর্জি, তাঁর লীলা। বাদ-বিসংবাদ করে না এ নিয়ে, আক্ষেপও রাখে না মনে কোনো।

নিরু আগেই নেমে এসেছিল, এগিয়ে এসে বললে, 'শিগ্‌গির এসো, দেখো'সে কাণ্ড। বড়দি মেজদি দু বোনে নাস্তানাবুদ লাউ-ঝিঙে নিয়ে। ঐ তো চার আঙুল চওড়া আঠারো আঙুল লম্বা লিকলিকে লাউটা, তাই কুটতে তাঁদের কী বিরাট উদ্যোগ। খুশিতে আপ্লুত বড়দি একমুখ হেসে সেই ষোলো ফলার ছুরিটা বের করলেন, এলাহাবাদ স্টেশনে যেটা কেনা হল আসবার পথে। মেজদিকে দিয়ে বললেন, 'কিরণ রে, তুই কাট্‌ লাউটা, বিহারে কতকাল ছিলি, ছুরি দিয়ে কাটা অভ্যেস আছে তোর।' মেজদি বললেন, 'তুইও হাত লাগা দিদি, নয় তো এক হাতে কি সারতে পারব সবটা?' তাড়াতাড়ি দাদার পকেট-ছুরি নিয়ে বসে গেলেন বড়দিও। সে যা কাটাকুটির লণ্ডভণ্ড— এতক্ষণে হাত কেটেছেন কি পা কেটেছেন তা দেখবে এসো।'

মনে পড়ল, সেবার, শ্বশুর মারা গেছেন, দেশের বাড়িতে গেছি। একমাস অশৌচপালন। আপন জন যে যেখানে ছিলেন সকলে এসেছেন। বাড়িভরা ভিড়। নিরামিষ আহার। দু বেলা তরকারি কোটা, সে এক পর্ব, রকমারি তরকারি মেলেই বা এত কী করে রোজ? মিললেও লাউয়ের মতো বাড়-বাড়তি কার? পিতলের দুই গামলা ভর্তি লাউয়ের ঘণ্ট বরাদ্দ ছিল দুপুরে রাত্রে, তার পর আর যা যা হবার হোক।

নতুন বউয়ের আমেজ তখনো কাটে নি। আত্মীয় কুটুম্ব চার দিকে, কোথায় ঘুর্‌ঘুর্‌ করব, কে দেখে ফেলবে। বড়দি আমাকে এনে দোচালার রান্নাঘরের এক কোনায় বসিয়ে দিলেন, নূতন শান-দেওয়া বঁটি-দা দিয়ে, বললেন, 'নাও, এবার বসে বসে দু বেলার তরকারি কোটো, দিন কাবার হয়ে যাবে।' প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাউ, ধারালো দা, কায়দা পাই না হাত চালাতে। বড়দি বললেন, 'ওতে হবে না, কাজের বাড়িতে ওভাবে হাত চালালে চলবে কেন? ওঠো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি', বলে বঁটির গোড়ায় পা চেপে বসে ঘষ্‌ঘষ্‌ লাউগুলি চিরে, তড়্‌বড়্‌ হাত নেড়ে সোনার চুড়ি ঝনর্‌ঝন্‌ বাজিয়ে মুহূর্তে লাউয়ের কুচির স্তূপ তৈরি করে উঠে দাঁড়ালেন। সেই বড়দির কিনা আজ এমন দুরবস্থা, কেবল একটি বঁটি-দা বিহনে।

শেষ পর্যন্ত তাঁদের কোটা-পর্ব সত্যিই এক সময়ে সমাপন হল। বসে বসে দেখছি। রান্না হলে একজনেই খেয়ে ফেলতে পারে তরকারি এমন যে লাউ, তার আবার দু ভাগ হল। বড়ো বড়ো টুকরোর ভাগটা ডালে পড়বে,

অপেক্ষাকৃত ছোটো ছোটো টুকরোর ভাগটা দিয়ে ঘণ্ট হবে। মেজদি ফিস্ ফিস্ করেন, 'কতটুকু হয়ে যাবে রান্না হলে, কার মুখে দিবি দিদি?' বড়দি ভাবেন, ভেবে টিনের ট্রাঙ্কটা খোলেন। ভাজা মুগের ডাল ছিল সঙ্গে মুঠি দুয়েক ন্যাকড়ার খুঁটে বাঁধা, সেগুলি এনে ঝেড়ে দিলেন লাউয়ে, ফুটলে ফুলে বাড়বে কিছুটা। মেজদিদি মাথা নাড়েন, 'এতেও হবে না রে দিদি, আর কিছু দে।' বড়দি আবার খোলেন ট্রাঙ্কটা। হরিদ্বারে কিশমিশ কেনা হয়েছিল এক পোয়া, খেতে খেতে চলবার জন্যে। ধুয়ে শুকিয়ে আনবার কথা; যেদিন ধোয়া হল, সেদিনই বৃষ্টি নামল, পরের দিনই রওনা হই। রোদের মুখ আর দেখে নি— ভিজে কিশমিশ ফেঁপে মোড়কের কাগজ গলিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ট্রাঙ্কময়। বড়দি পথ পেয়ে যান, কুড়িয়ে বাড়িয়ে সবগুলি এনে ঢেলে দেন হাঁড়িতে। বললেন, 'ঘণ্টে খাটবে ভালো।'

মাড়োয়ারি দম্পতি চটিতে ওঠে নি, বটগাছ-তলায়ই নুড়ির উনুনে রান্না চাপিয়েছে তারা। গিন্নিটি হাতছানি দিয়ে ডাকল নিরুকে। বোঁচকার ভিতর চটের থলি, তার ভিতরে ন্যাকড়ার পুঁটলি, হাত ঢুকিয়ে ছাতুর মতো পদার্থ খানিকটা বের করে জিজ্ঞেস করল, 'খাবে একটু?' নিরু বললে, 'কী ওগুলি? কেমন করে খায়?' সে হাঁ করে সেই শুকনো গুঁড়ো কিছুটা নিজের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'এমনি করে খায়।'

ঘরের ঘি, ঘরের আটা; ঘিয়ে আটা ভেজে চিনি মাখিয়ে তৈরি করে নিয়ে এসেছে আসবার সময়। পনেরো সের আটা, বারো সের চিনি আর পাঁচ সের ঘি খরচ হয়েছে এতে, খিদে পেলে এক-এক বাটি খাবে, গোটা মাস চলে যাবে দুজনের।

তাদেরই একটা কাঁসার বাটি ভরে একবাটি দিল। খেতে বেশ লাগল।

নিরু বললে, 'ভাজা বরফির মতোও অনেকগুলি কী যেন এনেছে সঙ্গে।' দেখেছি কাল রাত্তিরে, ছাতোলি-চটিতে আধো-অন্ধকারে স্বামী স্ত্রী মুখোমুখি বসে বরফিগুলি হাতে নিয়ে ভেঙে ভেঙে মুখে ফেলে ধীরে সুস্থে চিবিয়ে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে খেল। খেয়ে এক-এক ঘটি জল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

নিরু জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলি কী?'

'ওগুলি ডালের বরফি, দেখবে খেয়ে?'

নোন্তা নোন্তা, মিষ্টি মিষ্টি, মন্দ লাগল না তাও। স্বামীই বসে বসে উনুনে

জ্বাল দিচ্ছিল। হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। স্ত্রীটি বললে, 'অনেকদিন 'চাউল' খাই নি, খেতে ইচ্ছে গেল, ফুরসতও মিলল। স্বামী একপোয়া 'চাউল' কিনে আনল ; আর 'শাক' বানাব এই বরফি দিয়ে।' বলে, ভাতের হাঁড়ি নামতে, একটু লঙ্কা দিয়ে আর-একটা হাঁড়িতে জল ফুটিয়ে বরফিগুলি টুকরো টুকরো ভেঙে ফেলে দিল ফুটন্ত জলে। অনেকটা ধোঁকার ডালনার মতো হবে বোধ হয় খেতে। নিরু বললে, 'কত সহজ পন্থা এদের। আর আমাদের রান্না-খাওয়াই একটা ঝকমারি বিশেষ।' বড়দি প্রতি কথায়ই উপদেশ দেন, তীর্থপর্যটনে এসে সুখবাহুল্যের প্রতি উদাসীন না হতে পারলে তীর্থভ্রমণের প্রকৃত ফল থেকে বঞ্চিত হতে হয়। নিরু বলে, 'হুঁ, তা তিনি বলে থাকেন অবিশ্যি, কিন্তু কিসে আমাদের শরীর মজবুত থাকবে তার জন্য তাঁরই তো উৎকণ্ঠা দেখি বেশি।'

জলপার রান্না হয়ে এল প্রায়। তাড়া দিল, এবারে স্নানটা তাড়াতাড়ি সেরে নিলে গরম ভাত পাতে দিতে পারে সে।

নিরু বললে, 'মন্দাকিনী এত কাছে, তাতেই চলো ; মেলাই উঁচু উঁচু পাথর আছে— বেশ আড়ালও হবে।' চটিওয়ালার কিশোরী মেয়েটি পথ দেখিয়ে আগে আগে চলে। বলে, ঐ উপরে বস্তির স্কুলে পড়ত সে, ইংরেজি অক্ষরও জানে কিছু কিছু। বাবা ছাড়িয়ে নিয়ে এল।

'কেন ? বিয়ে দেবে বলে ?'

'মালুম হচ্ছে তাই।'

চোখের সামনে দেখছি, এই তো মন্দাকিনী, এই তো তার সবুজ স্বচ্ছ জল, এই তো তার পাড়ের কালো পাথরগুলি। কিন্তু এতক্ষণ ধরে চলছি, এগচ্ছি কই ? পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি— ঐ দূরে ফেলে-আসা চটি ; সামনে দেখি— ঐ নীচে আকাঙ্ক্ষিত শীতল স্পর্শ। নামব, উঠব, আবার অতখানি হেঁটে দুপুর-রোদ্দুরে চটিতে ফিরব ? পারব না ভিজে কাপড়ের বোঝা নিয়ে। ফিরে এলাম।

বড়দি বললেন, 'এক-কাপড়ে স্নান করো, খেতে খেতে না যদি শুকোয় তবে ভিজে কাপড় বইবে কে ?' পথের ধারে নলের মুখে পিঠ ভিজিয়ে বসে ময়লা শাড়িতে সাবান ঘষতে লাগলাম। যাত্রীরা সামনের গাছতলার বেদীতে বসে জিরোতে থাকল, তামাক খেতে লাগল, কেউ কেউ শুয়ে পড়ল পুঁটলি মাথায়

দিয়ে ; তৃষ্ণার্ত যারা, এগিয়ে এল জল খেতে। কাঁধ কাত করে জায়গা ছেড়ে দিই, তারা আঁজলা পেতে জল খেয়ে চলে যায়, আবার কলের নীচে মাথা পেতে চুল ভেজাই।

হৈচৈ পড়ে যায়! পথে ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঘোড়া, কুলি, দাসী, ঝি, ঠাকুর, চাকর— মস্ত প্রসেশন। কর্তা-গিন্নির ডাণ্ডি বইছে আট-আট পাহাড়ি জোয়ান, বলে, 'রাজা মহারাজ আর রানীমা যাতেঁ হ্যায়।' এঁরাই রুদ্রপ্রয়াগের তাঁরা। এঁদের কথাই শুনেছিলাম হরিদ্বারে, জ্ঞান মহারাজ বলেছিলেন, 'অমুক জায়গার অমুকরা যাচ্ছে শুনছি, পথে দেখা হবে আপনাদের। তাঁদের তো জাঁকজমকে যাওয়া, আপনারা আগুপিছু যাবেন। নয়তো পূজা-দর্শনাদিতে ব্যাঘাত ঘটবে। তাঁরা বড়োলোক, মন্দিরের পাণ্ডা-পূজারী তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে, পূজা আরতি দেখতে তাঁদের জন্য জায়গা করে দেবে অন্য যাত্রীদের হটিয়ে। গেছি, দেখেছি তো অনেক। তাই জানি ব্যাপার কিছু কিছু।'

এক এক করে দলের সকলেই পার হল। নলের নীচে বসে বসেই দেখলাম। সব-শেষে এলেন এক বলিষ্ঠ ব্রহ্মচারী, সাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা, মায় মাথা পর্যন্ত। সাধুরা গাত্তা বাঁধেন হরেক রকমের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজনের গাত্তা বাঁধা দেখছিলাম একদিন, দেখে শশী মহারাজ বললেন, 'শিখতে চান? কত রকমের আছে! এক রকমের আছে চাদরটা মাথার উপর দিয়ে কানের পাশ ঘুরিয়ে, ঘাড় কাঁধ জড়িয়ে এনে এমন করে বুকে বাঁধা হয় যে একটু হাওয়া ঢুকতে পায় না কানে গলায় গায়ে।' শীতের দেশ, বস্ত্রখণ্ড সম্বল শুধু, নিজেকে রক্ষা করতে নানা কৌশলের সাহায্য নিতে হয় তাঁদের। সেই বিশেষ গাত্তাই হয়তো বেঁধেছেন ইনি। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে পথের ক্লান্তিতে। হাতে কাঠের কালো কমণ্ডলু। রয়ে সয়ে সম-গতিতে পা ফেলছেন; চটির কাছে এসে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়েছেন। নিরু তাঁকে ডেকে আলাপ জুড়ল, 'আজই আসছেন রুদ্রপ্রয়াগ থেকে? সে যে অনেকখানি পথ। খুব কষ্ট হল, না?'

ব্রহ্মচারী কয়েকবারই এসেছেন এ পথে। আলাপী চটিওয়ালার কুশল শুধিয়ে উত্তর দেন, 'কষ্ট আর কী? আমি ইচ্ছে করলে আজ গুপ্তকাশী পর্যন্ত চলে যেতে পারি।' শুনে বিস্ময় মানি।

ইনি এসেছেন এই বিরাট দলের মুরব্বী হয়ে, এঁরই নির্দেশমত পথ এগোয়

বাহকের দল মনিব-মনিবানীকে কাঁধে নিয়ে ; ঠাকুর দাসী কাপড় কাচে, রান্না চাপায় বাঁধা সময় হাতে পেয়ে।

ভিজে শাড়ি পাথরের গায়ে টান করে মেলে দিই। রোদের তাপে, পাথরের তাতে শুকিয়ে যাবে এখনি। পরিতোষ করে ভাত খাই, ডাল, ঘণ্ট, ঝিঙে-সেদ্ধ দিয়ে। শশী-মহারাজের দেওয়া আচারের শিশি থেকে দুটো লঙ্কা বের করে নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাগ বসাই সবাই। পরম তৃপ্তির ভোজন। এর পর বিশ্রাম প্রয়োজন। নিরু শুয়ে শুয়েই ঘাড় উঁচু করে কথা বলে চলে চলতি পথিকের সঙ্গে। কেউ যাচ্ছে, কেউ ফিরছে। ক্লান্ত দেহে যেন খুশি ডগমগ করে সবার। রুক্ষ যাত্রীর রুক্ষ চুলে দাড়িতে যোগী-যোগী সাজ, বগলাদিদি কোঁচড়ে করে চাল আলু নিয়ে যান তার কাছে— সন্ন্যাসী-ভোজন করাবেন। তিনি বললেন, 'রাঁধব কী করে ? কাঠ কই ?' জলপার পরিত্যক্ত পোড়া কাঠগুলি নিয়ে ঠেলে দেন বগলাদিদি মাড়োয়ারিদের তপ্ত উনুনে।

বড়দি বললেন, 'যাবার আগে প্রণাম করে যাব না একবার অগস্ত্য-মুনিকে ?'

ডঙ্কা-শিঙার তূর্যনিনাদ, দর্শকের ভিড়। হোমাগ্নি জ্বলছে উঠনের মাঝখানে।

চামেলি-ঝোপের নীচে হাতের লাঠি রাখতে গিয়ে দুটো শুকনো ফুল কুড়িয়ে পাই— গন্ধ নেই, উবে গেছে। কোনো কোনো ফুলের কিন্তু বেশ সৌগন্ধ থাকে শুকিয়ে যাবার পরও। কুঁড়ি ? কুঁড়িও নেই গাছে একটি। পালা চুকেছে এবারের। চকিতে মনে ভাসল— সেই আগেকার দিনে, বিকেলে বেড়াতে বের হব— চামেলিবিতানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সরু সরু সাদা লম্বা কুঁড়ি এক গোছা তুলে খোঁপায় রেখে দিতাম রোজ ; রেখে ভুলে থাকতাম। সাঁঝের কুঁড়ি ফুটে থাকত চুলের ভিতরে। পরদিন স্নানের আগে খোঁপা খুলে চুল ঝাড়া দিতাম, বাসি চামেলি ছড়িয়ে পড়ত মেঝেতে, চুলের ভাঁজে ভাঁজে আকুল-করা সৌরভ মাখিয়ে রেখে।

অগস্ত্যমুনিকে দেখলাম এবার শৃঙ্গার-বেশে। স্বল্প আয়োজন, সামান্য রঙিন বস্ত্র, মরচে-পড়া পুরোনো জরির অলংকার। কেবল সেই দুটি ফুল, সূর্যমুখী, তার একটি রেখেছে মাথায়, একটি বুকে। হলুদ রঙের পাপড়ির গোল সারিটি বুকের উপর দেখাচ্ছে যেন ভোরের আলোয় ধোওয়া স্বর্ণপুষ্পটি। ঐ এক সূর্যমুখীতেই শৃঙ্গার সুসম্পূর্ণ।

বলতে বলতে চলেছেন বড়দি : ভক্তরা বলেন, শিবধামে বিষ্ণুধামে ব্রহ্মধামে যেতে হলে সেইরকম উপযোগী পথের সম্বল সঙ্গে না নিলে সব শ্রমই ব্যর্থ। সম্বল কী, না, দৃঢ়বিশ্বাস, ভগবানে অনুরাগ, ঋষি মুনি শাস্ত্রে নিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম, ভোগত্যাগ, বৈরাগ্যগ্রহণ, প্রসন্নচিত্তে কষ্টবরণ, এবং হৃদয়ে নিরন্তর শ্রীগুরু স্মরণ; এই সম্বল আঁচলে বেঁধে তবে এই পথ চলতে হয়।

উত্তরাখণ্ড মুনি-ঋষির তপস্যাক্ষেত্র। হাজার হাজার বছর ধরে সুকঠিন তপস্যায় নিরত মুনি-ঋষিগণ মহাবৈরাগ্যময় জীবনে সৃষ্টির শুরু হতে আজ অবধি এখানে সাধনা করে আসছেন। এই মহাতপস্যাভূমি অনুভবের রাজ্য, অনুভূতিলভ্য। অন্তরে জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে তবে অনুভব করতে হয়।

দল হতে পিছিয়ে পড়েছি অনেকটা। ক'টা বাজল কে জানে? ইচ্ছে করেই ঘড়ি রাখি নি সঙ্গে। আকাশ দেখে চলি, আকাশ দেখে থামি। সূর্য পাহাড়ের গায়ে হেলে পড়েছে। দেশ হলে এতক্ষণে অন্ধকারে ঢেকে যেত চারি দিক। পাহাড়ে দিনের আলো অনেকক্ষণ আটকে থাকে, বিদায়-পালা যেন সারা হয় না সহজে। স্নিগ্ধ আলোর করুণ হাসিটিতে কী অপরূপ মাধুরী মাখানো।

এক প্রবীণ পাহাড়ি পথিক চলেছেন সঙ্গে সঙ্গে, নিরুর সঙ্গে গল্প করতে করতে। কম্বলের কোটপ্যাণ্ট পরনে। কম্বলেরই সাজ সবার এদেশীদের। অবস্থাবিশেষে মিহি-মোটার তারতম্য যা। মেয়েরা পরে পুরো হাতার জামা— কারো কারো কোমর পর্যন্ত ব্লাউজের মতো, কারো নেমে গেছে হাঁটুর নীচ অবধি ছোটো মেয়ের ঝোলা ফ্রকের মতো।

ব্লাউজের উপরে বড়ো একটা কালো কম্বল কোমরে জড়িয়ে দু দিক পিঠের বুকের দু পাশ হতে টেনে ডান কাঁধের উপরে তুলে এনে একটা রুপোর কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে আটকে রাখে; গরিবদের কাঁটাটা কেবলমাত্র কাঁটাই থাকে। গৃহস্থের বউ-গিন্নিদের কাঁটার রিং থেকে ঝোলে চন্দ্রহারের মতো একগোছা সরু রুপোর চেন। কাঁধ হতে বুক ছাপিয়ে ঝুলে-পড়া সাদা চেনগুলি কালো কম্বলের উপর হেলে দোলে, বড়ো সুন্দর দেখতে লাগে। তার উপরে মুখজোড়া নথ নাকে, কলসী মাথায় ঝরনার ধারে এসে যখন দাঁড়ায়, কাঁচা সোনার বর্ণ চ্যাপটা মুখে লাল আগুনের আভা নিয়ে, মনে হয় যেন সেই কোন্ কালের

পর্বত-সম্রাট হিমালয়-দুহিতার নিত্যসহচরীরা ছড়িয়ে পড়ে আছে আজও এ-পাহাড়ে ও-পাহাড়ে।

প্রবীণ পথিক গিয়েছিলেন উলটোপাহাড়ে জামাইএর ঘরে। অনেকদিন দেখেন নি মেয়েকে, নাতি একটি, নাতনিও হয়েছে দু মাস হল। ভালোই আছে সব, খুশি মনে ফিরছেন আজ ছয় দিন পরে। বললেন, 'কেদারবদরী যাচ্ছ, না দেবপুরীতে যাচ্ছ। স্বর্গ আর দেবপুরীতে কোনো তফাত নেই জেনো। আমি আগে কতবার গেছি; এখন বয়স হয়ে গেছে, আর তেমন যেতে পারি না। তবু যাত্রী দেখলেই আমার মন কেমন করে ওঠে, মনে হয় কেদার-বদরীতে যখন গিয়েছিলাম, যেন স্বর্গেই গিয়েছিলাম আমি, দেবতার কোপে আবার মর্তে নেমে এসেছি। এখন দিন গুনছি, কবে সময় আসবে, চোখ বুজব। এবার যে যাব আর ফিরে আসব না, অন্ততঃ এ রকম হয়ে যেন আর ফিরে আসতে না হয়— এত কাছে থেকেও দূরে সরে আছি। এ যেন জাতিস্মর হয়ে বেঁচে থাকা আর পুরোনো কথা ভেবে কষ্ট পাওয়া।'

মোড় ঘুরতেই সঙ্গী ভদ্রলোক বিদায় নিলেন, বললেন, 'এই পাহাড় বেয়ে খানিকটা উঠে ও-পাশে নামব, সেখানে আমাদের বসতি। চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ঐ শোনো, গ্রাম-বসতির একটা কলরব শুনতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ, ঐ তো। ও কেবল ঝরনা নয়, লোকজন গোরু ভেড়া সব মিলিয়ে একটা বিশেষ সাড়া। কান পাতো ভালো করে, তফাত বুঝবে। আগে তো তোমরা কেদার-নাথ যাবে? এক কাজ কোরো, কেদারনাথ খুব ঠাণ্ডা, স্নান করতে পারবে না; মার্জন করে মাথায় যখন গঙ্গা স্পর্শ করবে, আমার নামেও একবার গঙ্গা মাথায় ছুঁইয়ো। আর বদরীনাথে গরম জলের কুণ্ড আছে, খুব আরাম পাবে স্নান ক'রে, সেখানে বদরীনারায়ণের কাছে আমার নামে একটা ডুব দিয়ো— কেমন? আচ্ছা, তবে চলি। মঙ্গল হোক তোমাদের, যাত্রা শুভ হোক।' বলেই মুহূর্তমধ্যে পিছন ফিরে চার-পাঁচ হাত উপরে উঠে গেলেন তিনি। নিরু কী ভাবছিল, ত্রস্তে ব্যস্তে দু পা এগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'গঙ্গা যে স্পর্শ করব, কুণ্ডে যে ডুব দেব, নাম বললেন না তো আপনার? কী নামে দেব?'

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু হাসলেন, বললেন, 'বোলো, এক মুসাফিরের নামে ডুব দিলাম।'

সৌরীর চটিতে এসে পড়ি। রুদ্রপ্রয়াগে থাকতে একটা ইস্তাহার পেয়েছিলাম, হাতে হাতে বিলিয়ে গেল যাত্রীদের এ দেশেরই একজন। তাতে লেখা—'সৌড়ীমে মন্দাকিনী গঙ্গাকে মধ্যমে যো ১৫০ ফুট গোলাকার ঔর ভূগর্ভমে ভী জো দৃষ্টি হুই হৈ, জিসকী গহরাই কা কুছ পতা নহী হৈঁ, ঔর ইস লিঙ্গকে লিয়ে য়ঁহাকী জনতা স্থানীয় জনতামে অনেক কিম্বদন্তীয়া প্রচলিত হৈঁ। শিলাকে উপরি ভাগমে কিসী মহাত্মা কী জীবিত সমাধিকে ভী স্পষ্ট চিহ্ন অভিতক হৈঁ' ইত্যাদি ইত্যাদি। যার মানে এই সৌরীর মন্দাকিনীতে নাকি স্বয়ম্ভূ শিব মাথা তুলেছেন, যার ঘের সাড়ে তিনশো ফুট, উচ্চতা দেড়শো ফুট। ইনি বহু আগেও এখানে ছিলেন। পরে নীচে তলিয়ে থাকেন। এখন আবার দেখা দিয়েছেন, এক সাধু মহাত্মা এঁর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। সে এক বিস্তারিত কাহিনী।

মন্দাকিনীর মাঝখানে সত্যিই এক বিরাট কালো পাথর, অনেকটা শিবলিঙ্গের গড়ন। গায়ে লম্বালম্বি একটা ফাটল, উপরের দিকটায় কয়েকটা শুকনো ঘাসের গুচ্ছ— গজিয়েছিল হয়তো এই বর্ষায়, ঘাসের আর আয়ু কয়দিনের? সেই ফাটলের ফাঁকে পুঁতে-রাখা কঞ্চিতে-আঁটা লাল শালুর ফ্যাকাশে পতাকা বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করে পাথরটার। দেখতে দেখতে নামি। নিরু বলে, 'স্বয়ম্ভূ শিবের তো অভাব দেখছি না এ পথে এসে অবধি— দিগ্‌বিদিকে ছড়ানো। হঠাৎ বেছে বেছে এইটেরই মাথায় পতাকা ওড়াতে গেল কেন?'

আমগাছের ছায়ায় ঢাকা ঢালু পথের পাশে একটি নির্জন আশ্রম; দু-তিনখানা চালাঘর, মন্দির, সামনে দুটো সাইনবোর্ডে উত্তরাখণ্ডের মানচিত্র গাঁথা। মানচিত্রের নীচে বসেছিলেন এক সাধু, কাছাকাছি যেতেই উঠে পথ আটকে এক নিশ্বাসে কথা শুরু করলেন। ইনি নিজেই সেই মহাত্মা যিনি উদ্ধার করেছেন ঐ লুপ্ত শিবকে এই কলিযুগে। বাসনা, এখানে তিনি শিবের বড়ো মন্দির করবেন— ধর্মশালা হবে, গোশালা হবে, রান্নাঘর হবে, যাত্রীদের যেতে আসতে কত সুবিধে হবে— থাকতে পাবে, খেতে পাবে। আর এই আমের বাগান, ঐ মন্দাকিনী। জিবে তালুতে শব্দ করে বললেন, 'গরমি কালে কিত্‌নী আচ্ছা ঠাণ্ডা থাকবে।' সুতরাং দান চাই। চলতে চলতেই শুনি, সাধু আগে আগে পিছু হটেন। দু হাতে আগলে রেখেছেন পথ, পাশ কাটাবার উপায় নেই। রেহাই পেতে দানের থলেতে একটা টাকা ফেলে দেন দাদা।

ত্বরিত সাধু চাঁদার খাতায় দাতার নাম ধাম বশ মান লিখে মন্দিরের সামনে ঝোলানো লোহার ঘণ্টার দড়ি ধরে জোরে এক টান মেরে ঠংঠং ঘণ্টা বাজিয়ে মহাদেবকে জাগিয়ে হাঁকতে থাকলেন—'এ শুনো মহাদেবজী অমুক, ধনবান্, জ্ঞানবান্, ভক্তিমান্, সদাশয় সজ্জন ব্যক্তি তোমার মন্দিরের জন্য যাত্রীদের ধর্মশালা গোশালা রান্নাবাড়ির জন্য কেদারনাথ যাবার পথে একটাকা দান দিল। তুমি শুনে রাখো, তার মনস্কামনা পূর্ণ করো, তোমাকে আরো দান দেবে, তোমার বড়ো মন্দির হবে, কত লোক আসবে, তোমার পুজো দেবে, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, বই ছাপাব, সব দানীদের নাম থাকবে তাতে।

খানিক পথ এগিয়ে এসে বড়দি বললেন, 'কাকে কতটুকু চিনি আমরা? কে জানে, এই সাধু হয়তো কিছু পেয়ে থাকবেন এখানে। তাই তাঁর ইষ্টের মন্দির গড়বার এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা। নয় তো ওঁর নিজের কী স্বার্থ এতে?'

নিরু বললে, 'যাই হোক, জায়গাটি কিন্তু বড়ো সুন্দর। এতখানি পথ এলাম, এমনি ঘরোয়া মাটির স্পর্শ পাই নি।'

গোটাকয়েক আমগাছে ঢাকা খানিকটা সমতলভূমি। ছায়াশীতল কালো মাটির পা ছুঁয়ে মন্দাকিনী বয়ে চলেছে, ঠিক যেন বাংলা দেশেরই একটুকরো জমি।

উতরাই শেষ করে চড়াইতে পা ফেলতে গিয়ে মুখ তুলেছি, মুখ-বরাবর মন্দাকিনীর দু ধারের গগনভেদী দু শ্রেণী কালো পর্বতের মাঝখান দিয়ে দেখা দিল একসারি উজ্জ্বল শুভ্র তুষারশিখর নীল আকাশের বুক ঠেলে। গম্ভীর প্রশান্ত সে শুভ্রতার জ্যোতির্ময় ছটা; যেন তিলক কেটেছেন পঞ্চানন তাঁর পঞ্চললাটে; যেন সদাশিব বসে আছেন সমাধিমগ্ন। সহস্র ধারা নামছে জটাজূট বেয়ে, সেই ধারা প্রাণ সঞ্চার করে চলেছে কঠিন পাষাণের বুক চিরে।

নিরু বললে, 'ঐখানে যদি যেতে পারতাম, অন্ততঃ তার কাছাকাছি স্থানে! অমন জায়গায় যাবার জন্যই যে এ পথের সৃষ্টি। আহা, কেদারনাথ যদি থাকতেন ওখানে!'

হৈহৈ করে উঠল পাহাড়ি ঘোড়সওয়ার একদল, 'এ মাঈ, সরে দাঁড়াও, পাহাড় ঘেঁষে দাঁড়াও, হুঁশিয়ার হয়ে হাঁটো।' ঘাবড়ে গিয়ে থতমত খাই। ঘোড়া খেপল নাকি? ভয়ে ভয়ে পাহাড়ে গা এলিয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সন্ত্রাসে

ধুঁকি। লাগাম ধরে চাবুক হাতে খুটখুট ঠক্‌ঠক্‌ নেমে আসছিল তারা ঘোড়াগুলি নিয়ে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে সাবধান করে দিলে— পাহাড়ে হাঁটবার সময় সর্বদা যে দিকে পাহাড় সে দিক ঘেঁষে হাঁটবে, খদের দিকে হেঁটো না। ঘোড়া ভেড়া মোষ, নানা পশু চলে, জন্তু-জানোয়ারের মর্জি, কী জানি কখন ওরা বিগড়ে যায়, কি তুমি ভয় পাও, তো সোজা খদে গিয়ে পড়বে। বেঁচে আর উঠে আসতে হবে না। দেখছ তো তাকিয়ে কী ব্যাপার?'

মন বাহাদুররা অনেক পিছনে ছিল, এরই মধ্যে এসে আমাদের সঙ্গ ধরল, ভারী বোঝা পিঠে নিয়ে ভারী তালে পা ফেলে। দৌড়ঝাঁপ নেই, তাড়াহুড়ো নেই, ধীর মন্থর একটানা নিশ্চিত গতি, তাই সহজেই এগিয়ে-আসা আমাদের পিছিয়ে দিয়ে চলে যায়, ইচ্ছেমত বসে, জিরোয়, মনের সুখে তামাক ধরায়, গল্প করে, হাসে।

মন বাহাদুর স্ফূর্তিবাজ হাসিখুশি ছেলে, যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে মাল বওয়াই তার ব্যাবসা। যাত্রী নেড়েচেড়ে পাকা হয়ে গেছে। কখন তাদের একলা ছেড়ে দিতে হয়, কোন্ পথে সঙ্গে সঙ্গে চলে সাহস যোগাতে হয়, সব সে জানে। মন বাহাদুর বললে, 'কেয়া মাঈজী, ইত্‌নী জল্‌দি থক গয়ী? ঐ তো কেদার-নাথ, ঐ তার বরফ। চলো চলো, এবার দেখতে দেখতে দেখবে একদিন গিয়ে পৌঁছে গেছ সেখানে। এখন হতে প্রায়ই এই বরফের চূড়া পথ চলতে চলতে দেখতে পাবে। তবে এখান থেকে এই দৃশ্য যত সুন্দর দেখা যায়, এমনটি আর কোথাও নয়।'

'ঐ তবে কেদারনাথ? বাঃ!' নিরু লাফিয়ে ওঠে। 'আর ভাবনা কী। হোক-না আরো কয়েক দিনের পথ, চোখের সামনে যদি দেখতে পাই, দেখা নিয়েই ভুলে থাকবে মন।'

জোড়হাত কপালে ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে চলেছেন বড়দি। নিমাই ছুটেছেন নীলাচলে, জগন্নাথ-দর্শনের আশায়; দিনের পর দিন গ্রাম পথ নগর রাজধানী পেরিয়ে, পাগলের মতো দু হাত সামনে বাড়িয়ে 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' করতে করতে। শিষ্য কজন ছিলেন সঙ্গে, দৌড়ে তাল রাখতে পারেন না, পিছিয়ে পড়লেন। নিমাই চলেছেন আগে আগে। নীলাচলে এসে দূর হতে দেখতে পেলেন মন্দিরের চূড়া। দেখে কী খুশি! চূড়াটি কী, না মন্দিরের সাক্ষী।

মন্দির কী, না কৃষ্ণ আছেন তাতে। আনন্দে বিহ্বল নিমাই দেখেন সেই চূড়ার উপরে বালক বনমালী দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আহ্বান করছেন নিমাইকে :

অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠাম।
দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥

বড়দি বললেন, 'তেমনি এই বরফের শিখরই কেদারনাথের সাক্ষী। এখান থেকেই প্রণাম জানাতে জানাতে যাই, এটুকু ছাড়া আর তো কিছু দেবার ক্ষমতা নেই।'

অল্পবয়সী দুটি পাহাড়ি বউ উপরের পাহাড়ে ঘাস কাটছিল, তড়বড় করে নেমে এল, 'এ মাঈ, দে তাগা সূঁই'। হাত পেতে দাঁড়াল, যেন জানে পাবেই। তাগা সুঁই দিই, এবার কপালের সিঁদুর দেখিয়ে তাও চায়, বলে, 'বড়ী আচ্ছা।'

হাসিখুশি বউ দুটি; কথা কয়, যেন ঢেউয়ের ছলছলানি। ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলে হেসে কল্‌কল্‌ সঙ্গে চলে। বড়োটি বলে, 'আমার স্বামী বুড়ো, ঘরে আরো তিনটে সতীন আছে। বুড়ো আমাকে খুব মারে। নিয়ে যাবে আমাকে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের দেশে?' বলেই খল্‌খল্‌ হাসে। বেজার মুখে অন্যটি সায় দেয়, বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর বড়ো কষ্ট, ওকে নিয়ে যাও', বলে সেও আবার তেমনি করেই হেসে ওঠে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় নিরু। এদের কোন্‌ কথাটি হাসির, কোন্‌টা দুঃখের বুঝে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে সেও হেসে ওঠে। দু পা চলি তো তারা সামনে ঝুঁকে চলা থামিয়ে হাত নেড়ে কী কথা যে বোঝাতে চায়—শুনে বোঝবার চেষ্টা করতে-না-করতে তাদের হাসির তোড়ে ভেসে যাই। এমন হাসিকেও নাকি আঘাত হানতে পারে কেউ কখনো! চন্দ্রাপুরীর পুলের কাছে এসে তাদের খেয়াল হয়, চার দিকে তাকিয়ে জানায়, 'ওরে বাবা, অন্ধকার হয়ে এল, ঘাসের বোঝা পড়ে আছে সেই পাহাড়ের মাথায়, কখন বাড়ি ফিরব? আবার বুড়া আছে ঘরে,' বলে দে ছুট্‌ ঊর্ধ্বশ্বাসে ভারী কম্বল দু হাতে তুলে পা দুটোকে আল্‌গা করে। যেন দুটি পাহাড়ি ঝরনা মিলিয়ে গেল পাথরের অন্তরালে।

ছোট্ট পুলটা পেরিয়ে আসি চন্দ্রাপুরীতে। ছোট্ট চন্দ্রভাগা এসে পড়েছে এখানে মন্দাকিনীতে, ঠিক তারই পাড়ে চটি। চটিতে ঢুকতেই শিবদুর্গার মন্দির। শিশু-রাত্রির কোমল অন্ধকারে কালো মন্দিরের চূড়া, ঘরের চাল,

সাদা সরু পথ, কাঁটা গাছের ঝোপ যেন এক নিঝুম মায়া সৃষ্টি করে। মনে হল মন্দিরের পাশ দিয়ে ঐ যে পথটি চলে গেছে পাথরটাকে ঘিরে ঘন বনের দিকে, ঐ পথে এই আবছা আলোতে একাকী চলতে চলতে গিয়ে মিশে যাই পথটিরই মতো গহন বনে দিক্‌হারা হয়ে।

পাগল মন, নিষেধ শোনে না। পায়ে পায়ে পা বাড়ায় কেবলই। সরু পথ হাতছানি দেয়। মনে ভয় জাগে— পাশে সঙ্গী নেই। অসহায়ের মতো চার দিক তাকাতে তাকাতে পিছু হটি। এক বুড়ো লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসে, বলে, 'ঘটিতে টাটকা দুধ আছে, দু আনা পোয়া। চটির দোকানে নেবে দশ পয়সা করে। নেবে আমার দুধ ?'

চন্দ্রাপুরী ভালো চটি, সামনের দিকে বড়ো বড়ো দরজা দেওয়া পাকাপোক্ত ঢাকা বারান্দা, সেখানেই ঢালা বিছানা হয়েছে দাদার, বড়দির, মেজদির, আমার, কালাদিদির, ব্রজরমণের, মাড়োয়ারি দম্পতির, জল্‌পার, ছটুর আর সব-শেষে মন বাহাদুরের। মন বাহাদুর কম্বল জড়িয়ে বিছানায় পা ঢেকে বসে ভজন গাইছে, 'জয় জগদীশ হরে।' যেদিন সুবিধে পায় সন্ধেতে গায়, নইলে দেখেছি, যত রাতই হোক, নিস্তব্ধ রাত্তিরে সারাদিনের ক্লান্ত শরীরে কম্বলের নীচে কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমে অচেতন যখন সবাই, একা বসে সে দুলে দুলে গাইছে 'জয় জগদীশ হরে'। না গেয়ে ঘুমবে না কোনোদিন।

রান্না চাপানো হয়েছে, খেতে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি। সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে রেখে কী ভাবছিল নিরু; বললে, 'এই যে সারাদিন আজ এলাম, তরঙ্গমালার মতো অনন্ত শীর্ষের দৃশ্য— কত রকমারি রঙের খেলা— সূর্যকান্ত নীলকান্ত বৈদূর্যমণির ছড়াছড়ি। বিশ্বসৌন্দর্য পিপাসু দুই নয়ন দিয়ে পান করতে করতে এলাম। পিপাসা কি মিটল ? তবে ? তবে এসেছি কী পেতে ?'

শশী মহারাজ বলেন, তীর্থভ্রমণ সংসারী লোকের পক্ষে আর কিছুই নয়— চালুনি দিয়ে ছেঁকে মাঝে মাঝে নিজেকে পরিষ্কার করা। এটা দরকার। না করলে আবর্জনা জমে। জীবন পরিষ্কার রাখা চাই।

মাড়োয়ারি মহিলাটি এসে কেড্‌স্ জোড়া সামনে রেখে বোঝাতে বসল নিরুকে, 'হয় এর দাম নাও, নয় এই রইল জুতো— ফেরত নাও।'

খালি পায়ে পাথুরে পথে চলতে বড়ো কষ্ট পেয়েছে বেচারা গত দু'দিন।

মন্দির কী, না কৃষ্ণ আছেন তাতে। আনন্দে বিহ্বল নিমাই দেখেন সেই চূড়ার উপরে বালক বনমালী দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আহ্বান করছেন নিমাইকে :

অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠাম।
দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥

বড়দি বললেন, 'তেমনি এই বরফের শিখরই কেদারনাথের সাক্ষী। এখান থেকেই প্রণাম জানাতে জানাতে যাই, এটুকু ছাড়া আর তো কিছু দেবার ক্ষমতা নেই।'

অল্পবয়সী দুটি পাহাড়ি বউ উপরের পাহাড়ে ঘাস কাটছিল, তড়বড় করে নেমে এল, 'এ মাঈ, দে তাগা সুই'। হাত পেতে দাঁড়াল, যেন জানে পাবেই। তাগা সুঁই দিই, এবার কপালের সিঁদুর দেখিয়ে তাও চায়, বলে, 'বড়ী আচ্ছা।'

হাসিখুশি বউ দুটি ; কথা কয়, যেন ঢেউয়ের ছলছলানি। ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলে হেসে কল্‌কল্‌ সঙ্গে চলে। বড়োটি বলে, 'আমার স্বামী বুড়ো, ঘরে আরো তিনটে সতীন আছে। বুড়ো আমাকে খুব মারে। নিয়ে যাবে আমাকে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের দেশে?' বলেই খল্‌খল্‌ হাসে। বেজার মুখে অন্যটি সায় দেয়, বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর বড়ো কষ্ট, ওকে নিয়ে যাও', বলে সেও আবার তেমনি করেই হেসে ওঠে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় নিরু। এদের কোন্‌ কথাটি হাসির, কোন্‌টা দুঃখের বুঝে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে সেও হেসে ওঠে। দু পা চলি তো তারা সামনে ঝুঁকে চলা থামিয়ে হাত নেড়ে কী কথা যে বোঝাতে চায়—শুনে বোঝবার চেষ্টা করতে-না-করতে তাদের হাসির তোড়ে ভেসে যাই। এমন হাসিকেও নাকি আঘাত হানতে পারে কেউ কখনো! চন্দ্রাপুরীর পুলের কাছে এসে তাদের খেয়াল হয়, চার দিকে তাকিয়ে জানায়, 'ওরে বাবা, অন্ধকার হয়ে এল, ঘাসের বোঝা পড়ে আছে সেই পাহাড়ের মাথায়, কখন বাড়ি ফিরব? আবার বুড়া আছে ঘরে,' বলে দে ছুট্‌ ঊর্ধ্বশ্বাসে ভারী কম্বল দু হাতে তুলে পা দুটোকে আল্‌গা করে। যেন দুটি পাহাড়ি ঝরনা মিলিয়ে গেল পাথরের অন্তরালে।

ছোট্ট পুলটা পেরিয়ে আসি চন্দ্রাপুরীতে। ছোট্ট চন্দ্রভাগা এসে পড়েছে এখানে মন্দাকিনীতে, ঠিক তারই পাড়ে চটি। চটিতে ঢুকতেই শিবদুর্গার মন্দির। শিশু-রাত্রির কোমল অন্ধকারে কালো মন্দিরের চূড়া, ঘরের চাল,

সাদা সরু পথ, কাঁটা গাছের ঝোপ যেন এক নিঝুম মায়া সৃষ্টি করে। মনে হল মন্দিরের পাশ দিয়ে ঐ যে পথটি চলে গেছে পাথরটাকে ঘিরে ঘন বনের দিকে, ঐ পথে এই আবছা আলোতে একাকী চলতে চলতে গিয়ে মিশে যাই পথটিরই মতো গহন বনে দিক্‌হারা হয়ে।

পাগল মন, নিষেধ শোনে না। পায়ে পায়ে পা বাড়ায় কেবলই। সরু পথ হাতছানি দেয়। মনে ভয় জাগে— পাশে সঙ্গী নেই। অসহায়ের মতো চার দিক তাকাতে তাকাতে পিছু হটি। এক বুড়ো লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসে, বলে, 'ঘটিতে টাটকা দুধ আছে, দু আনা পোয়া। চটির দোকানে নেবে দশ পয়সা করে। নেবে আমার দুধ?'

চন্দ্রাপুরী ভালো চটি, সামনের দিকে বড়ো বড়ো দরজা দেওয়া পাকাপোক্ত ঢাকা বারান্দা, সেখানেই ঢালা বিছানা হয়েছে দাদার, বড়দির, মেজদির, আমার, কালাদিদির, ব্রজরমণের, মাড়োয়ারি দম্পতির, জল্‌পার, ছটুর আর সবশেষে মন বাহাদুরের। মন বাহাদুর কম্বল জড়িয়ে বিছানায় পা ঢেকে বসে ভজন গাইছে, 'জয় জগদীশ হরে।' যেদিন সুবিধে পায় সন্ধেতে গায়, নইলে দেখেছি, যত রাতই হোক, নিস্তব্ধ রাত্তিরে সারাদিনের ক্লান্ত শরীরে কম্বলের নীচে কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমে অচেতন যখন সবাই, একা বসে সে দুলে দুলে গাইছে 'জয় জগদীশ হরে'। না গেয়ে ঘুমবে না কোনোদিন।

রান্না চাপানো হয়েছে, খেতে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি। সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে রেখে কী ভাবছিল নিরু; বললে, 'এই যে সারাদিন আজ এলাম, তরঙ্গমালার মতো অনন্ত শীর্ষের দৃশ্য— কত রকমারি রঙের খেলা— সূর্যকান্ত নীলকান্ত বৈদুর্যমণির ছড়াছড়ি। বিশ্বসৌন্দর্য পিপাসু দুই নয়ন দিয়ে পান করতে করতে এলাম। পিপাসা কি মিটল? তবে? তবে এসেছি কী পেতে?'

শশী মহারাজ বলেন, তীর্থভ্রমণ সংসারী লোকের পক্ষে আর কিছুই নয়— চালুনি দিয়ে ছেঁকে মাঝে মাঝে নিজেকে পরিষ্কার করা। এটা দরকার। না করলে আবর্জনা জমে। জীবন পরিষ্কার রাখা চাই।

মাড়োয়ারি মহিলাটি এসে কেড্‌স্ জোড়া সামনে রেখে বোঝাতে বসল নিরুকে, 'হয় এর দাম নাও, নয় এই রইল জুতো— ফেরত নাও।'

খালি পায়ে পাথুরে পথে চলতে বড়ো কষ্ট পেয়েছে বেচারা গত দু'দিন।

আজ না পেয়ে বলেছিল, 'তোমাদের মতো একজোড়া কাপড়ের জুতো আমাকে কিনে দিতে পার কোথাও থেকে ?'

সঙ্গে বাড়তি জুতো আছে আমাদের সকলেরই। নিরু ভেবেছিল, রাতে যে চটিতে গিয়ে থামব, বিছানা তো খুলতেই হবে—হোল্ড-অলের খোপ থেকে বের করে দেব একজোড়া তাকে। চন্দ্রাপুরীতে এসে দেখে বাতি-ঝলমলে মনোহারী দোকান চটির পাশেই। কেদারনাথ যেতে এইটিই শেষ দোকান। যাত্রীদের পথের প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায় এখানে ; কম্বল, আলোয়ান, ছাতা, লাঠি, মোজা, জুতো, দেবতার ভোগসামগ্রী, সব। কঠিন পথের কঠিন দেবতা— ক্ষীর-নবনীর আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। চানার ডাল, মিছরির দানা, বাদাম, মনক্কা, শুকনো নারকেলের কুচি— এই-সবের কিছুটা হলেই ভোগ হয়ে যায়।

অন্য যা কিছু বুঝি, কিন্তু চানার ডাল ভোগে লাগে এ যেন কেমন কথা।

দোকানী বললে, 'বহুদূরের যাত্রী, অতি উর্ধ্বের দেবতা ; ভোগ দিয়ে প্রসাদ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় আত্মীয়কুটুম্বদের জন্য। কতদিনের পথ কিছু ঠিক নেই ; ঝড় আছে, জল আছে, আপদ-বিপদ, বেমারী-উমারী আছে ; সব নষ্ট হয়ে যায় যদি বা, চানার ডাল নষ্ট হবে না। সবাই যখন হাত পাতবে এসে, "প্রসাদ দাও, প্রসাদ দাও," তখন এই চানার ডাল দেবে সবার হাতে হাতে। তারা ঐ মুখে ফেলে ভগবানের প্রসাদ পাবে।'

ভোগসামগ্রী কিনলেন বড়দি ; কর্পূর, ধূপও কিনলেন পূজার জন্য। কিনলেন একশিশি এসেন্স শিবকে স্নান করাতে। শর্করা লাগে পঞ্চামৃতে, তাও নেওয়া হল। শেষ বাজার, ভেবে ভেবে— মানে, যা দেখছেন সেটাই দরকারি মনে হওয়াতে— কিনে ফেলছেন। সেইসঙ্গে নিরু কিনে ফেলল কেড্‌স্ জোড়াটা ; বললে, 'নূতন যখন পাচ্ছি, আমাদের পায়ে দেওয়া জিনিসটা আর দিতে যাই কেন ? হলই বা শুধু এক-আধদিনের ব্যবহারে লাগা।'

এই কয়দিনেই বেশ একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে নিরুর। কেউ কারো ভাষা বোঝে না, যদিও হাবে ভাবে যা বলে মানে বুঝতে কিন্তু তাদের দেরি হয় না একটুও। প্রসন্ন-হাসি-ভরা মুখ মহিলাটির, ঝরঝরে দেহ, টিকলি সমেত মুখখানা নেড়ে নেড়ে কথা বলে যখন— আধো দেখা, আধো না-দেখার ভঙ্গিটিতে প্রৌঢ়ত্বের আড়ালেও বেশ একটা বউ-বউ ভাব, ভারি ভালো

লাগে দেখতে। একই সঙ্গে তারা পা ফেলে চলে, কচিৎ-কখনো নিরু পিছিয়ে পড়লে সে নিজের মাথার বোঝা নামিয়ে পথের ধারে অপেক্ষা করে—কাছে এলে দরদ ঢেলে ওড়নার আঁচল দিয়ে নিরুর কপালের ঘাম মুছিয়ে দেয়, না বলার মধ্যে সেই সহজ সরল মায়ায় তারা বাঁধা পড়ে যায়।

তাই, যত্ন করে জুতো জোড়াটি কিনে চুপি চুপি রেখে দিয়ে এসেছিল নিরু মাড়োয়ারি মহিলাটির বিছানার পাশে। সে রুটি সেঁকছিল উনুনের ধারে, রুটি সেঁকা শেষ হলে ঘাগরাতে হাত মুছে ট্যাক থেকে পয়সার থলি বের করে জুতো আর দাম দু হাতে দুটো নিয়ে এসেছে নিরুর কাছে বোঝাপড়া করতে। বিনামূল্যে নেবে না কিছু তীর্থের পথে বেরিয়ে। বড়দি ইশারা করলেন। দামটা নিরু হিসাব করে নিয়ে রাখতে মহিলাটি নিশ্চিন্ত মনে উঠে গেল। বড়দি বললেন, 'দাম নিয়ে ভালো করলে। কেন মিছে অল্পের জন্য অন্যকে ঋণী করে রাখবে।'

চটির নীচেই চন্দ্রভাগা, ঝরনার মতো উছলে উছলে এসে মিশেছে সে মন্দাকিনীতে। ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুতে গিয়ে বসে পড়ল নিরু জলের মাঝের কালো পাথরটার উপরে। ও পারের পাহাড়ের মাথায় সরু এক ফালি হলুদ-লেপা চাঁদ— শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি বুঝি আজ।

জ্ঞান মহারাজ বলে দিয়েছিলেন, 'পথে সুবিধে পেলেই গরম চা দুধ খেয়ে নেবেন। তার জন্য দু-চার মিনিট দেরি যদি হয় তো ইতস্ততঃ করবেন না। গরম দুধ পেটে পড়লে শরীরে যে শক্তি পাবেন তাতে সব পুষিয়ে গিয়েও লাভ থাকবে। নয় তো গা এলিয়ে আসবে, দু পা গিয়েই মনে হবে শুয়ে পড়ি রাস্তার ধারে। পথে চলতেও দেখবেন সবাই পরামর্শ দেবে, বলবে, "কম কম খানা, ধীর ধীর চল্না।" একবার আমরা আশ্রমেরই জন-কয়েক গুরুভাই চলেছি কেদারবদরী, তাদের ইচ্ছা তিনদিনের পথ একদিনেই চলে। আমি যত বলি ওতে ফল হবে না কিছু, তারা কি শোনে তা? প্রথম দিন তো কাটল। দ্বিতীয় দিন চলেছি— রোদ উঠে গেছে মাথার উপরে, গলা কাঠ। একটা চায়ের দোকান দেখে বসে পড়লাম। বললাম, এক গ্লাস করে চা আর দুটো করে প্যাঁড়া খেয়ে নেওয়া যাক আগে। তারা চলা থামাবে না, কথাও শুনবে

না। বললে, খেতে হয় তুমি খাও, আমরা চললাম। ব'লে, সত্যিই তারা এগিয়ে গেল। কী আর করি। আমি একলাই বসে আয়াস করে পুরো এক গ্লাস চা, টাটকা প্যাঁড়া খেয়ে জিরিয়ে আস্তে ধীরে চলা শুরু করলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি, একটা গাছের নীচে বড়ো একটা পাথরের উপরে চার মূর্তি সটান পড়ে। নাড়া দিয়ে বলি, কী হে, থামলে কেন? চলো, এখনও অনেকখানি পথ বাকি। তারা বললে, উঃ! অনেক হেঁটেছি, আজ আর পারব না। বলি, কতখানি পথ এসেছ মনে হয় সেই চায়ের দোকান থেকে? চোখ না খুলে কাতরাতে কাতরাতেই তারা বললে, তা মাইল পাঁচ-ছয় হবে। বললাম, শুনবে তবে কতখানি এসেছ? মাত্র দু ফার্লং।'

সকালে গরম দুধ জ্বাল দিচ্ছে দোকানীর স্ত্রী, নির্জন পথে, জীর্ণ কুটিরে। ভোরের সর্বপ্রথম কাজ, গৃহকর্তা দুইয়ে দিয়েছে দুধ পোষা মোষের, গিন্নি আগুন জ্বেলে লোহার কড়াই চাপিয়েছে উনুনে, গ্লাসগুলি মেজে ঘষে রেখেছে সামনে, ঠাণ্ডা পিতল গরম হবে আগুনের তাতে। এবার যাত্রী এসে পৌঁছবে এক দুই করে। ভোর না হতে পথ চলতে শুরু করে তারা। প্রভাতের যাত্রী খালি মুখে পার হয়ে গেলে দুধের হাঁড়ি আগলে থাকা সারাদিনের ঝামেলা, তাই রাত না পোহাতেই, গৃহস্থালি শুরু হয় এদের। নূতন দিনের অচেনা যাত্রী এসে থামে এখানে নব-অরুণের নবীন তেজে ঈষৎ-ক্লিষ্ট পা দুখানাতে ভর দিয়ে। সামনের কাঠের বেঞ্চিতে ঠাসাঠাসি করে বসল কেউ কেউ; কেউ বসলাম পাথরে পা ঝুলিয়ে। বারান্দার পাশে একটিমাত্র খুপরি ঘর, ভিতরে একটা খাট, মা বাবা উঠে এসেছে বাইরে, দুই ছেলে শুয়ে আছে কম্বল জড়িয়ে। মেয়েটিও ছিল শুয়ে খানিক আগে পর্যন্ত— এখন উঠে কপাটের কাঠ ধরে নিজেকে আড়ালে রেখে কৌতূহলী মুখখানা বের করে দেখছে আমাদের। কত যাত্রীই তো দেখে, তবু যাত্রী দেখে আশ মেটে না। লোকালয় হতে নিভৃতে দুরূহ পাহাড়ের প্রাণী এরা, এইটুকুই যা বৈচিত্র্য এদের জীবনে বাইরের জগতের স্পর্শে। তাও বছরের ছটা মাস মাত্র।

চার দিনের বেগনি রঙের মোষের বাচ্ছাটা মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল, উঠে দাঁড়াতে মেয়েটি গিয়ে শুকনো পাতা মর্‌মর্‌ মাড়িয়ে জাপটে নিয়ে বসল তাকে। দোকানীকে শুধোল নিরু, 'শুকনো পাতা রেখেছ কেন ওখানে অত? আগুন ধরাতে?' সে বললে, 'তা নয়, এই পাতা খুব গরম, বাচ্ছা বাছুর, শীতে

কষ্ট পাবে, তাই পাতার উপর রেখে দিই ওকে, আরামে থাকবে। খুব শীতের সময় আমরাও এই পাতার বিছানায় শুই।'

জাম-জামরুল গাছের মতো গাছ— মোটা গুঁড়ি, খসখসে পাতা; মন বাহাদুর বললে, এগুলিই 'ওস্ত' গাছের পাতা। পথে আসতেও এক জায়গায় দেখেছিলাম বটে, পাতা-সমেত ডাল ভেঙে নিচ্ছে লোকে। ভেবেছিলাম ছাগল-ভেড়াকে খাওয়াবে বোধ হয়, যেমন খাওয়ায় আমাদের দেশে কুল-অশ্বত্থের পাতা।

নিরু বললে, 'গরম দুধ সত্যি চাঙ্গা করে দেহকে। একটু আগে গলার স্বর নেমে গিয়েছিল। এই পথে চলতে চলতে একেই তো কথা বলা দায়, তবুও উচ্ছ্বাসের চোটে বড়দির সঙ্গে তত্ত্বকথা জুড়লাম। মুহূর্তে দম ফুরিয়ে এল মনে হতেই উদাস কণ্ঠে গান ধরলাম, "তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময়"— শেষ আর করতে পারলাম না; 'স্বামী'টুকু ডাক দিয়ে, মনের সান্ত্বনা মনেই গুমরে রইল। আর দেখো, এই পাঁচ কি সাত মিনিট হয়েছে বসে বসে দুধ খাচ্ছি—কোথায় গেল ক্লান্তি, কোথায় ক্লেশ! যেন বীর হনুমানের সাগর ডিঙোবার পূর্বাবস্থা।'

বড়দি হাসেন, বলেন, 'কতক্ষণ মেয়াদ?'

দু মাইল অন্তর চটি, চায়ের দোকান। নিরু বললে, 'তার আর কি ভাবনা? দু আনা করে পয়সা ফেললে চা দুধ সমান দর এক-এক গেলাস।'

ভীরিতে লোহার পুল পেরিয়ে এ পারে এলাম; মন্দাকিনীকে এবার ডাইনে রাখলাম। নীচে মন্দাকিনীর মাঝখানে পাথরের চড়া, চড়ায় দু-চার ঘর লোকের বাস। কাশফুলের মতো থোকা থোকা ঘাসফুল চড়াময়। বাংলা দেশের শরৎকালের একটুকরো শোভা। একজন পাহাড়ি একটা ঘোড়াকে বকতে বকতে উঁচুনিচু পাথরে পা ফেলিয়ে নদী পার করিয়ে চড়াতে নিয়ে তুলল। এটাই বোধ হয় ওর বাড়ি, ভাড়া খেটেছে ক'দিন, এখন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবে। ভাবি, বন্যা নামলে করবে কী? চড়া না হয় ডুববে না, কিন্তু আসাযাওয়া? ব্যবস্থা বোধ হয় আছে কোনো, নয় তো ঘর বাঁধে কোন্ ভরসায় মানুষে?

ওপারে এতক্ষণ বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এসে এপারে পড়তেই মুখের উপরে কড়া রোদ লেগে ঘামে নেয়ে একাকার সবাই। কুণ্ডচটিতে এলাম যখন,

বেলা তখন এগারোটা। দুপুরে এখানেই থাকব সেই কথাই ঠিক ছিল আগে হতে।

ফন্‌ফনে কুমড়োলতা ছেয়ে আছে চটির পিছনে ঢালু জমিটা জুড়ে। তারই পাশ দিয়ে পথ মন্দাকিনীতে যেতে। এ চটিতে ঝরনার জলের নল নেই, মন্দাকিনীই সম্বল। জলের জন্য নামতে গিয়ে কুমড়োর ডগা দেখে চেঁচিয়ে ওঠে নিরু। যেন যুগযুগান্তর পার হয়ে গেছে খায় নি এমন স্বোয়াদি জিনিস, যেন জিব দাঁত অসাড় হয়ে আছে, যেন গলা শুকনো মাঠ। বললে, 'বড়দি গো, কতক্ষণে ঐ রসালো ডগা চিবিয়ে চিবিয়ে খাব— আঃ!'

বড়দি বললেন, 'কার-না-কার কত কষ্টের গাছ, দেবে কেন লতা ছিঁড়তে? ফলফুলের আশা করে তো তারা?'

'কিন্তু এ যে কুমড়োর জঙ্গল। দুটো ডগা ছিঁড়লে কী আর হবে?'

'তবে খোঁজ করো আগে মালিকের, সে যদি রাজি থাকে তো পয়সা দিয়ে কিনে নাও'— হুকুম মেলে বড়দির।

চটিওয়ালাই মালিক জমি, গাছের। বললে, 'শাক খাবে তো? যত ইচ্ছা পাতা ছিঁড়ে নাও। পয়সা? পয়সা লাগবে না, খেতে শখ গেছে, অমনিই খাও।'

বড়দি বেছে বেছে পাতা ছেঁড়েন, নিরু কাটে লতা। এমন পুষ্ট লতা আমাদের ওদিকে হয় না বড়ো।

রান্নার আনুষঙ্গিক মসলাপাতি কিছুই নেই হাতের কাছে। কোনোমতে লতাপাতাগুলি কুঁচিয়ে নুন-ঘিয়ের ছিটে দিয়ে ভাপিয়ে দিলেন বড়দি। জোলো জোলো কুমড়ো-শাক সেদ্ধ, তাই বা কী অমৃত লাগল মুখে, আহারের রুচি বদলে দিল যেন। নিরু বললে, 'জানো বড়দি, অথচ এই কুমড়োশাকই রান্না কত নটখটির। বিনোদিনী পিসি রাঁধতেন দেখেছি— শাক কুঁচিয়ে নুনের জলে ভিজিয়ে রাখো রে, পরে নিংড়ে নিয়ে এই করো রে, সেই করো রে, ডাল-বাটা নারকেল-বাটা দাও রে, ঢিমে আগুনে সইয়ে সইয়ে ভাজো রে—সে কত কিছু। ইচ্ছে ক'রে এ রান্না হাতে নিই নি কখনো। তবে হ্যাঁ, মরিচ-ঝোল— সোজাসুজি রান্না— তেলে কালোজিরা কাঁচালঙ্কা ফোড়ন খালি। কিন্তু কালোজিরা এখানে মিললে তো? পেলাম না দেখি কোনো চটিতেই।'

দুপুরে খাবার পর খানিক বিশ্রামের পালা। বড়দির হাতের আঙুল দুটো

ফুলে লাল হয়ে জ্বলছে। কুমড়োশাক তুলতে গিয়ে— জানতেন না— বন-বিছুটির পাতায় আঙুলটা ছোঁওয়া লেগেছে কি লাগেনি, চিড়বিড়িয়ে উঠেছে। সেই অবধি আঙুল ছুটো যত ঘষছেন তত জ্বলছে, যত জ্বলছে তত ঘষছেন।

বনতুলসীর মতো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ, সেই রকমেরই পাতা। এই বনবিছুটি সম্বন্ধেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন জ্ঞান মহারাজ বারে বারে। বলেছিলেন, সর্বনাশা বিছুটি, খুব সাবধানে থাকবেন। পাহাড়ের যেখানে-সেখানেই ঝোপ, লাগলে সহজে রক্ষা নেই।

নিরু বললে, 'অথচ মজা দেখো, কোন্ জিনিসের কী গুণ! এমন যে মারাত্মক বিছুটিবন, আজই আসবার পথে ঝোপের ভিতর ঘুরতে ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেই পাহাড়িবউকে, "এগুলি কেটে ফেল না কেন তোমরা ?" সে বললে, "এ থেকে যে ওষুধ হয়! পাহাড়ি আদমি আমরা, কথায় কথায় পেটে ঠাণ্ডা লাগে, এই বিছুটিশাক সেদ্ধ করে রস খাই ; তখন-তখনি ভালো হয়ে যাই। এর ডাল থেকে দড়ি তৈরি হয় পাটের মতো।" বললাম, "কাটো কী করে ? গায়ে হাতে লাগলে তো মরণদশা।" সে কম্বলে-মোড়া কোমর ঘুরিয়ে, লম্বা হাতার জামায় ঢাকা কনুইয়ের ধাক্কায় বিছুটির ঝোপ সরিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে হেসে দেখালে—"এই, এমনি ক'রে"।'

প্রায় প্রতি চটিরই পথের পাশে বট বা অশ্বত্থ গাছ, পাথর দিয়ে গুঁড়ি বাঁধানো, যাত্রীদের বিশ্রাম করতে সুবিধে। এখানেও আছে তেমনি একটি। সেই চওড়া উঁচু বাঁধানো বেদীতে আশ্রয় নিয়েছে মাড়োয়ারি-দম্পতি। একটা চাদর আর চালুনি নিয়ে এল নিরু সেখানে। বান্ধবী বলেছিল তাকে, 'তোমরা তো চটিতে আছ, চাইলেই পাবে, চটিওয়ালার কাছ থেকে চালুনিটা চেয়ে দেবে ? আমাদের ভাজা আটাগুলি শালপাতার ঠোঙায় মুড়ে বস্তায় ভরে এনেছিলাম, এতদিনে পাতাগুলি শুকিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আটার মধ্যে মিশে গেছে, খেতে অসুবিধে হয়। আজ অবসর আছে, চেলে নেব।'

চালুনিটা তাকে দিয়ে চাদরটা বিছিয়ে নিরু শুয়ে পড়ল আমার পাশে, মাড়োয়ারি-গিন্নি আটা ছাঁকতে লাগলেন ঘাগরা ছড়িয়ে বসে দু পায়ের মাঝখানে আটার বস্তা টেনে নিয়ে।

চোখের উপরে সরু কাঠির বোঁটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হালকা পাতাগুলি দুলছে

হাওয়ায় অশ্বত্থের ডালে। দেখি আর ভাবি, কী করছি? এই যে দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে, দুলে দুলে কেবল ভাসছি। আর কাজ? কাজের হিসাব মেলে না কিছু। পথ? ধুয়ে মুছে যায় সারা পথ, দেখি শুধু একটুখানি বর্তমান।

ছবিলাল মন বাহাদুরের ভগ্নীপতি, আমাদের আর-একজন কুলি। কখন এসে সেও শুয়েছিল পাশে গামছায় মাথা রেখে। বললে, 'মাঈ, আমার মালুম হচ্ছে তুমি খুব ভালো ডাক্তারও।'

নিরু বললে, 'বুঝলে কিসে?'

সে বললে, 'দেখে মনে হল। সাপ, সব সাপেই বিষ আছে। তাই, যে লিখতে জানে সে ডাক্তার না হয়েই যায় না। এই যে তুমি লিখেছ, কী সুন্দর লেখা! তুমি নিশ্চয়ই ডাক্তার। আমার বাপও ডাক্তার ছিল। সাপের ওষুধ, ঘায়ের ওষুধ জানতেন। সব রকম ঘা সারিয়ে দিতে পারতেন, অমন কেউ পারত না। আর সাপের ওষুধে তো বাপের কাছে কেউ লাগত না। কত সাপে-কাটা লোক তিনি ভালো করেছেন। একবার, আমার মনে আছে, আমি তখন ছোটো, একটা জেলেকে সাপে কামড়েছে, রাত্তিরে মাছ ধরছিল নদীতে, দিয়েছে পায়ে বিষাক্ত সাপে কামড়ে। বিষে তখন লোকটা ঢলে পড়েছে, দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে এসেছে কোনো রকমে বাপের কাছে। আমাদের নিয়ম আছে "সাপে কামড়েছে" বলতে নেই। বললে তখনি মরে যাবে। বলতে হয়, এমন কিছু কামড়েছে যাতে আর বাঁচবে না। তা হলেই সবাই বুঝে নেয়। তা সেই লোকটাও এসে বাপকে ঐ রকমই বলল যে, আর বাঁচবে না। বাপ তো দেখেই বুঝল কি ব্যাপার। তাড়াতাড়ি ওষুধপত্র দিলে। ভোরবেলা লোকটা ভালো হয়ে নিজে নিজেই হেঁটে ঘরে ফিরে গেল। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ছিল বাপ, এ কি যা-তা ওষুধ? ভগবান-দত্ত ওষুধ, ভগবানের দয়া ছিল বাপের উপরে, বড়ো সাচ্চা লোক ছিল সে। জানো, কী করে বাপ সাপের ওষুধ পেয়েছিল? একদিন বাপ ক্ষেত-খামারি করে গাছের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে দেখে, গরুড় পাখি সাপ খেয়ে সেই পাহাড়ের উপর এসে বসল। এখন, সাপ খেয়েছে, সাপের বিষও খেয়েছে, বিষমারী ওষুধ খেতে হয়। গরুড় পাখি পাহাড়ের গায়ে একরকমের কাঁটাগাছে ছোটো ছোটো ফল হয়েছে তাই কতকগুলি খেয়ে নিল, খেয়ে উঠে গেল। বাপ আড়াল হতে দেখল তা। দেখে সেই

ফল তুলে নিয়ে নীচে নেমে এল। সেই ওষুধই দিত সবাইকে আর সবাই ভালো হয়ে যেত। বাপ ছাড়া সে ফল অন্য কেউ চিনত না।'

নিরু বললে, 'তুমি চিনে রাখলে না কেন বাপের কাছ থেকে?'

সে বললে, 'আমি তখন ছোটো ছিলাম। হঠাৎ বাপ মরে গেল। সবই নসিব। নইলে, দেখো-না, তার ছেলে হয়ে আমি কিছুই হলাম না, কেবল মোট বইলাম। আমার বাপ নাড়ী দেখে যেমন রোগ বলে দিতে পারত, কপাল দেখে তেমনি জীবনও বলে দিতে পারত।'

মাড়োয়ারি সঙ্গী লোকটিও শুয়ে শুয়ে শুনছিল কাহিনী এক পাশ হতে এতক্ষণ। এবার সে উঠে সামনে এসে জোড়াসন হয়ে বসল, ছবিলালের ডান হাতটা টেনে নিয়ে কোলের উপরে রাখল; তারপর গম্ভীর মুখে ছবিলালের পাঞ্জা টান করে আঙুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে সরিয়ে বুড়ো আঙুল ধরে নাড়া দিয়ে বললে, 'এই যো নাড়ী হ্যায় না, ইস বন্ধ হোনে সে আদমি মর যায়।' তর্জনী টেনে বললে, 'এই যো নাড়ী হ্যায়, এতে রোগ ধরা যায়, মধ্যমাও তাই। অনামিকা টেনে বললে, 'এতে ধর্ম বোঝা যায়।' আর কনিষ্ঠা নেড়ে বললে, 'আউর ইসমে ভূত প্রেত সব কিছু ধরা পড়ে।' বলে, হারমোনিয়মে সা রে গা মা বাজাবার মতো ছবিলালের কনুই হতে কবজি পর্যন্ত আঙুল টিপে টিপে নাড়ি ধরে নেমে আসে। ছবিলালের মুখটা এমনিতেই একটু দুষ্টু দুষ্টু, সেই মুখে সে দুষ্টু হাসি হেসে বুঝদারের মতো মাথা নাড়ে, 'হাঁ হাঁ, হোগা হোগা, ইস্ হোনে সক্‌তা।'

হুড়্ মুড়্ করে উপরের পথ থেকে একটা ডাণ্ডি এসে থামল গাছতলায়, লাল পশমিনায় ঢাকা কনে বউ বসা তাতে। গাছের ছায়ায় ডাণ্ডি রেখে বিশ্রাম নিতে বসল বাহকেরা। নতুন বউ চিরকালই আগ্রহের বস্তু। নিরু উঠে গিয়ে ঘোমটা তুলে ধরে। বাচ্ছা বউ, চ্যাপটা মুখে মুখ-জোড়া নথ। পরনে চকচকে গোলাপি আলপাকার শাড়ি, বউ পিটির পিটির চোখ খোলে আর বোজে।

বউ চলেছে, বর কোথায় এর? বিয়ের পরে জোড়ায় আসা, জোড়ায় যাওয়া— এই তো নিয়ম সব দেশে। ফিটফাট এক বয়স্ক ভদ্রলোক চলেছে সঙ্গে— এই কি তবে বর? ঠোঁট বাঁকায় নিরু, বাচ্ছা বউয়ের অতবড়ো বর, ভাবতে তার কেমন লাগে। ডাণ্ডিওয়ালাদের জিজ্ঞেস করে, 'ও কে? বর?'

তারা বললে, 'না, ও বরের বড়ো ভাই, বর আছে বাড়িতে। নথ পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বউ তাদের ঘরে।'

নথই তা হলে বরের প্রতিনিধি? তাই এত বড়ো বড়ো নথ দেখি এদের নাকে।

বউ গেল। এল সেই পিছনে ফেলে চলে আসা বিরাট বাঙালি-দলের জৌলুস। এক-এক করে তারা এসে থামতে লাগল চটিতে।

নিরু বললে, 'বেশ কিন্তু, একবার এঁদের ফেলে আমরা এগচ্ছি, আরবার আমাদের ফেলে এঁরা এগচ্ছেন। অগস্ত্যমুনি থেকে যেদিন আসি, তুমি পিছিয়ে ছিলে অনেকখানি, পথে এঁদের সঙ্গে ফের দেখা আমার। এক দোতলা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, গিন্নিমা ভিজে শাড়ি মেলে দিচ্ছিলেন রেলিঙে ঝুলিয়ে। পথ হতেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "খাওয়া-দাওয়া হল আপনাদের?" বেলা তখন গড়িয়ে আসছে। তিনি বললেন, "না ভাই, সবে স্নান করতে যাচ্ছি— বাসি কাপড়টা এই ধোওয়া হল। বড়ো ঝক্কি, এত বেশি লোক দলে— হাতের কাজ আর ফুরোয় না কারো। ব্যস্ত হতে হতেই দিন কাবার হয়। এই তো রান্না চাপল।"' গিন্নিমার ডাণ্ডি থামতে নিরু এগিয়ে গেল। বললে, 'আজ খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছেন তো?'

'খেলে কি ভাই আজ আর এগতে পারতাম? খাবার আগেই যতখানি যাবার যাই, তার পর সেদিনের মতো থামি। ঐ একবেলা রান্নাবান্না করে খেতে খেতেই সন্ধে। সারা দিন পর পেট ভরে খেয়ে গড়ানো ছাড়া আর উপায় থাকে না আমাদের।'

ছোটো গিন্নিমা— গিন্নিমার বিধবা ছোটো জা— ফরসা বয়স্কা ভদ্রমহিলা, উপযুক্ত পুত্র পুত্রবধূ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। পুত্রই দলের হিসাবপত্র দানদক্ষিণার খরচ, ঘোড়া-কুলির বিধিব্যবস্থা করেন, হাবেভাবে বুঝি। তিনি বললেন, 'ব্রহ্মচারীর কথামতো এত বাদামভাজা, পেস্তাভাজা, কাজুবাদাম, কিশমিশ, বাক্সবোঝাই এসেছে— কে খায়? যেমনকার তেমন পড়ে আছে।'

গিন্নিমা বললেন, 'যাই ভাই যাই, ঐ ব্রহ্মচারী এসে পৌঁচেছেন— আবার গিয়ে ডাণ্ডিতে বসি। এখানে থামা হবে না, আজ নাকি গুপ্তকাশী পর্যন্ত যাব। বাড়ি ফিরে যাবার আবার তাড়া আছে আমাদের, সময় কম, কোনো-রকমে দর্শন সেরে ফিরতে পারলেই হয়। ডাণ্ডিওয়ালারা ভাই, যা হুড়মুড়্

ক'রে নিয়ে চলে, ভয়ে কাঁপি এক-এক সময়ে। এই পথে তিনবার এসে ফিরে গেছি, দর্শন ঘটে নি। একবার ছেলেটির অসুখ করল, একবার পথ ধসে গেল, একবার নিজেই কাবু হয়ে পড়লাম।' বড়দির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন ভাই, এবার যেন দর্শন ঘটে।'

ছল্‌ছল্‌ চোখে বড়দি বললেন, 'আহা, তিন-তিনবার ফিরে গেছেন, এবার তাঁর দয়া হবেই।'

কালো রঙের ঢল্‌ঢলে গিন্নিমাটি, বেশ সহজ সরল। তারা চলে যেতে নিরু বললে, 'তা চলে গেলেন ভালোই, কিন্তু তাঁদের বাক্সবন্দী বাদাম, পেস্তা যদি কিছু রেখে যেতেন খেয়াল ক'রে তো আরো ভালো হত।'

বেশিক্ষণ আর বসে থাকা হয় না, গুপ্তকাশী গিয়ে পৌঁছতে হবে আমাদেরও সন্ধের আগে। পথ বেশি নয়, দু-আড়াই মাইল, কিন্তু গোটাটাই চড়াই। এই প্রথম খাড়া চড়াই। জ্ঞান মহারাজ বলেছিলেন, 'নীচের কুণ্ড চটিতে খাবেন দাবেন, ভালো করে বিশ্রাম নেবেন, তার পর ধীরে ধীরে এই দু মাইল পথ উঠবেন।' পরে নিরুর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ঐ দিনই বোঝা যাবে কার কেমন ক্ষমতা।'

কেদারনাথের পাণ্ডা মহাদেব প্রসাদ খবর পেয়ে এসে বসে আছেন এখানে সারা দিন। গুপ্তকাশীর এই প্রথম দুরূহ পথটুকু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবেন, কথায় গল্পে ভুলিয়ে রাখবেন পথশ্রান্ত যজমানের মন। বললেন, 'আর কী, এবার চলা যাক। বলো "জয় কঠিন কেদার কী"।'

অর্জুন সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন, 'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌।' তখন ভগবান জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগ, পথানুযায়ী নানা ভাবে উপদেশ দিয়ে সব-শেষে বললেন—'মামেকং শরণং ব্রজ।' এই শরণাগতিই গীতার সার উপদেশ। যেখানে প্রতি মুহূর্তে প্রাণসংশয়, সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই ভগবান তাঁর ভক্ত অর্জুনকে শরণাগতির উপদেশ দিলেন, আর অর্জুনও সর্বসংশয়ছিন্ন হয়ে জয়ী হতে পারলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ন্যায় জীবন-যুদ্ধেও শরণাগত হয়ে যুদ্ধ করতে হয়। 'সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ।' বিস্মৃতি আসতে পারে, তা অভ্যাস দ্বারা ক্রমশই হ্রাস পায়। দুর্বলতা মানুষেই সম্ভব। তাঁতে কোনো দুর্বলতা নেই বলেই মানুষ তাঁর শরণ

নেয়। মানুষের নিকট আশা করলেই মন দুর্বল হতে বাধ্য ; দুঃখ এসে ঘিরে ধরে তাকে, তাঁর উপর নির্ভরই মনকে সবল সুন্দর রাখে। আমরা ভাবি আমরা স্বাধীন, কিন্তু মনের ছলচাতুরীতে আমাদের জেলের কয়েদীর মতো সংসারে খাটিয়ে নিচ্ছে ; যদি মন ছলনা না করত তবে জেনেশুনে দুঃখজনক কাজে নিযুক্ত হত না মানুষ। তাই মনকে মন দ্বারা সর্বদা পাহারা দিতে হয়। 'বায়ু না নীয়তে মেঘঃ তেনৈব অপসারিতঃ।' এই মনই বন্ধন আনে, আবার এই মনই তা অপসারণ করে।

বড়দি বললেন, 'আরো কতভাবে কত উপদেশ দেন শশী মহারাজ, বলেন— বৈরাগ্য, সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া নয়। ভগবানে অনুরাগ হলেই সংসারে বৈরাগ্য আসে। স্বভাবতঃ আমাদের সংসারে অনুরাগ, ভগবানে বিরাগ ; সেই মোড়টা ফিরিয়ে দিতে হবে। 'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্'— নিজেদেরই চেষ্টা করে তা করতে হয়। নিজের খিদে নিজে খেয়ে নিবৃত্তি করতে হয়।

শশী মহারাজ বলেন, 'অনেক তীর্থ দর্শন করলেন, এবার মনেতে তীর্থ স্থাপন করুন। সৎপ্রসঙ্গ দুর্লভ, সকলের ভাগ্যে হয় না। তার চেয়েও দুর্লভ মনেতে সৎপ্রসঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করা।'—

সব গুলিয়ে যায়, খেয়াল হয় চড়াইতে পা দিয়ে ফেলেছি। পার্থসারথি কখন রথ সমেত অন্তর্ধান করেছেন কুরুক্ষেত্র থেকে টেরও পেলাম না। নিরু বললে, 'রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—

আপনাতে আপনি থাকো মন,
যেয়ো নাকো কারো ঘরে,
যা চাবি তা পাবি বসে—
খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।

এই অন্তঃপুরে খোঁজার সহায়ক বলেই তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা ; উৎসাহ দিয়েছিলেন শশী মহারাজ। কিন্তু হায় রে! আর, ঘরে বসে থাকার সহজ পন্থাটি কেন জোর করে ধরিয়ে দিলেন না তখন— এ পথে বের হবার আগে ?'

সব-কিছুরই প্রথমটাতেই আধিক্য বেশি, জানি তা, 'তবু মনে হয় আর যত চড়াই আছে এমনটা বুঝি কোনোটা নয়। এত কষ্ট বুঝি কিছুতে নেই।

আঁকাবাঁকা পথ উঠে গেছে উপরে, উঁচু তালে পায়ের পাতা ফেলতে তুলতে দম বন্ধ হয়ে আসে, সমান সোজা দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ফেলবার জন্য হাঁসফাঁস করে নিরু আগে তাকায়, পিছে তাকায়— কোথাও কোনো আশ্বাস নেই, লাঠি ভর দিয়ে কাত হয়েই থামে খানিক।

তর্‌তর্‌ করে নেমে আসে পাহাড়ি মেয়ে স্বচ্ছ জলের মতো, দড়ি দিয়ে বাঁধা পিঠের কালো প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কটা দু হাতে আগলে। মজা পায় সে নিরুকে দেখে। নামে আর থামে, থামে আর নামে, যেন রিমিকি-ঝিমিকি তাল বাজে তার পায়ে। পিঠের বোঝা যেন ফুলের গোছা। থমকে দাঁড়ায়, ফিরে ফিরে তাকায়, শেষে নাচতে নাচতে নেমেই যায়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাড় গুঁজে নিরু এক পায়ে ভর রেখে আর পা তুলে পথে ফেলে, সে পায়ে ভর দিয়ে আবার এ পা তোলে। বড়দিরা উঠে গেছেন চোখের আড়াল হয়ে অনেকক্ষণ, হঠাৎ মাথার উপর ডাক শোনে তাঁর, মুখ তুলে দেখে, হাসছেন সবাই দল বেঁধে তার দিকে তাকিয়ে। বড়দি বললেন, 'এ দিক দিয়ে আসতে পার কি না দেখো তো, শর্ট্‌ কাট্‌ হবে।'

ঝোপঝাড় আঁকড়ে পায়ে-চলা সরু পথ আছে বটে একটা। দাদা বাধা দিয়ে ওঠেন, 'না না থাক্‌, দরকার নেই, ঐ ঘোরা পথেই উঠে আসুক, নয় তো শেষে হিতে বিপরীত হবে।'

এক টুকরো সমতল ভুঁই নিয়ে একটা বটগাছের বাঁধানো গুঁড়ি, পথশ্রান্ত যাত্রীরা বসেছে ঘিরে, কোনোমতে নিজেকে নিয়ে সেখানে ছেড়ে দেয় নিরু ধপাস্‌ করে মাটিতে। এই দেহ নিজের ব'লে আর মমতা জাগল না একটুও।

মেয়ে-পুরুষের ভিড়, গাড়োয়ালিই সবাই এরা। বরফ পড়ে আসছে, মন্দির ঢাকবার আগে এ বছরের মতো একবার কেদারনাথের দর্শন সেরে আসতে চলেছে, দল বেঁধে এসেছে সবাই কাছাকাছি বস্তি হতে, দু-পাঁচ দিনের মেয়াদে। পাহাড়ের প্রাণী, পাহাড়ি পথে এদের আর চলার কষ্ট কী ? একদিনে আমাদের পাঁচদিনের পথ কাবার করে ফেলে। এদের মেয়েদের অনেকেরই পরনে মিলের শাড়ি ; একটা শাড়ি, যেমন মেয়েরা ঘুরিয়ে, কোঁচা ঝুলিয়ে পরে, তেমনি পরেছে ; আর-একটা শাড়ির গোটাটাই পাকিয়ে পাকিয়ে কোমরে জড়িয়েছে। পেট কোমর এমনি করে আঁটসাঁট বাঁধা থাকলে পাহাড়ের পথ চ'লে আরাম লাগে কিন্তু ; দেখেছি করে। গায়ে তাদের মোটা কাপড়ের

জ্যাকেট, মাথায় লাল গোলাপি সবুজ পশমিনা উলটে পালটে, মাথার উপর জড়ো করা।

একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে মিটিমিটি হাসছিল নিরুর দিকে তাকিয়ে। ভাষা জানে না, ঐ হাসিটুকু দিয়েই আত্মীয়তা জমাতে চায় সে। মিষ্টি হাসিখানি, লাবণ্য ফুটে ওঠে মুখময়। চলেছে মাকে নিয়ে কেদারনাথে, সঙ্গে আট-ন বছরের মেয়ে একটি তার। মা মেয়ে নাতনী, প্রৌঢ়া যুবতী কিশোরী— পর-পর এক ছাপ তিন মুখে, দেখেই ধরা যায় কার কে। যুবতীটি সরতে সরতে এবার এসে গা ঘেঁষে বসল নিরুর ; বুঝে নিয়েছে, ভালো লাগার অদৃশ্য জালে জড়িয়ে পড়ছে দুজনে। অনাত্মীয় বিদেশী ভাব কেটে গেল মুহূর্তে।

স্বাস্থ্যবতী যুবতী, নিটোল হাতের মুখের গড়ন। গলায় হাঁসুলি, হাতে মোটা বালা, কানে এক ঝাঁক বড়ো বড়ো নথের মতো কাঁচা সোনার রিং কানের লতি ঘিরে পর পর অনেকগুলি ফুটোয় গাঁথা— ভারের চাপে সামনের দিকে হুমড়ে পড়েছে কান, কানের সবটা ঢেকে। নিরু হাতের আঙুলে গহনার ভার ওজন করে দেখে, আর দুজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। তাদের হাসি দেখে অন্যরাও এসে কানের কাপড় সরিয়ে গয়না দেখায়। একই রকম রিঙের গোছায় সবার কানেরই ঐ অবস্থা। তারা নিজ নিজ মাথা নেড়ে, কানের গয়না নাড়ায়, আর একসঙ্গে সবাই মিলে খিল্‌খিলিয়ে হাসে। যেন লাল শোলার পাখি নাচিয়ে খেলা দিচ্ছে মা কাকী, রাঙাখুকিকে।

সবুজ ভেলভেটের জামা গায়ে একটি তরুণী উঠে এল নীচে থেকে। এক জোড়া প্রৌঢ় প্রৌঢ়া বসে ছিল দু বছরের মেয়েকে নিয়ে, তরুণী তাদের কাছে গিয়ে প্রৌঢ়াকে প্রণাম করে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে পিঠে বসিয়ে নাচাতে লাগল সামনে দাঁড়িয়ে। রং এদের সকলেরই সুন্দর— কারো দুধে-আলতা, কারো কনকচাঁপা। সেই চাঁপার বর্ণের জেল্লা ফুটেছে তরুণীর নবযৌবন-ভরা অঙ্গ ঘিরে। দীর্ঘাঙ্গী কৃশাঙ্গী হাস্যলাস্যময়ী পাহাড়ি তরুণীটি যেন ঘন বনের কালো ছায়ার ফাঁকে ঢুকে পড়া আলোর ঝলক এক অঞ্জলি।

প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞেস করে নিরু, 'এটি তোমার কে ? নাতনী ?'

প্রৌঢ়া মাথা নাড়ে।

'তবে কী ? মেয়ে ? বউ ? ভাইয়ের বেটি ? বোনঝি ?'

'না, না, আমার সৌৎ।'

সোঁৎ কী ? ঝিলিক মারে মনে, তবে কি সতীন ? নিরু বললে, 'যাঃ, তা কি হয় ? দুই সতীনে এত তফাত ?' প্রৌঢ় এবার মুখ খোলে, ডান হাতের তর্জনী মধ্যমায় দুই আঙুলে ওদের দুজনকে দেখিয়ে নিজের বুকে ঠেকায়, অর্থাৎ এই দুইজনই তার।

'মানে! তোমার দুই বউ ?' বিস্ময়ে মাথা ঝেঁকে শুধোয় নিরু। প্রৌঢ়ও মাথা ঝাঁকে, 'হাঁ, হাঁ, ঠিক।'

বিশ্রাম হয়েছে— সকলে উঠে দাঁড়ায়। নিরুর নূতন সখী তার গাঁট্টাগোঁট্টা ধাড়ী মেয়েটাকে পিঠে বেঁধে নেয়। প্রৌঢ়ও ওঠে স্ত্রীদের নিয়ে। লম্বা-চওড়া পুরুষ— পাহাড়িদের মধ্যে এমন শরীর দেখা যায় না বেশি। এক কালে সুপুরুষ ছিল। এখনো মুখে কেমন একটা স্নেহপ্রবণ হাসিমাখা পুরুষালি বৈশিষ্ট্য। তাকাতে তাকাতে নজরে পড়ল, তার বুকের কাছে কোটের উপরে একটি পদক আটা— সুভাষ বসুর মুখ।

মুহূর্তে যেন সে কাছে সরে এল অতি নিকট-আত্মীয়ের মতো। একটি ছোট্ট ছবির মাধ্যমে সব দূরত্ব ঘুচে গেল। অপরিচিত দলে ঢুকে মিলিয়ে দিল নিরু নিজেকে। পরম নির্ভরে চলতে লাগল তার পাশে পাশে। প্রৌঢ় হিন্দি জানেন। সুভাষ বসু যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে মণিপুর আক্রমণ করেন, ইনি ছিলেন সেকেণ্ড গাড়োয়াল ব্যাটালিয়ন রেজিমেণ্টে। সেই সময়ে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়, পায়ে আঘাত লাগে, হাসপাতালে আসেন, হাসপাতাল হতে বাড়ি। বহুদিন পর পা ভালো হয়, যুদ্ধও শেষ হয়ে যায়। দেশের লোক কতক ফিরে এল, কতক এল না। প্রৌঢ় বললেন, 'তাদের কাছে জিজ্ঞেস করি সুভাষবাবুর কথা— সঠিক কেউ কিছু বলতে পারে না। আজও এক-এক সময়ে ভাবি, কত সুখের সময় ছিল তখন। স্বপ্ন মনে হয়। দেবতার সঙ্গসুখ —সে কি বেশিদিন ভাগ্যে ঘটে ? তাই দেবতা গেলেন তাঁর স্থানে, আমরা ফিরে এলাম আমাদের জায়গায়।' তপ্ত নিশ্বাস পড়ে তার বুক হতে।

নিরু বললে, 'এখন কী করেন আপনি ?'

'এখন ক্ষেত-খামার করি। আগেকার কাজে ডেকেছিল যোগ দিতে। আর যাই নি ; বলি, পা'টা জখম আছে আজো।'

এক স্ত্রী নিয়েই সংসার ছিল এতকাল, দু বছর আগে আর-এক স্ত্রী ঘরে এনেছেন। বললেন, 'পুত্রের জন্য আমাদের মধ্যে সাত বউ পর্যন্ত করে লোকে।

এতে দোষের কিছু নেই। রেওয়াজ। আমার ছেলে নেই, অনেকদিন পরে মেয়ে হল, সে ঐ বড়ো বউর ঘরেই। তারও বয়স হয়ে যাচ্ছে, ছেলে হবার সম্ভাবনা কম, তাই জোয়ান বয়স দেখে বউ আনলাম সকলের পরামর্শে। ছেলে একটি তো চাই বংশ রাখতে। ঐ চন্দ্রাপুরীতেই ছোটো বউর মায়ের ঘর, সেখানেই থাকে বেশির ভাগ, মায়ের ছোটো মেয়ে সে। কেদারনাথে যাচ্ছি, তাই নিয়ে এলাম, যে, চলো দর্শন করে আসবে বাবাকে।'

নিরু বললে, 'ঝগড়া হয় না দু-বউয়ে?'

'দুজনেই যদি ঝগড়াটে হয় তবে-না ঝগড়া বাধে? একজন সহ্য করলে ঝগড়া হবে কার সঙ্গে? আমার দুই বউই ভালো। এখন পর্যন্ত তো বেশ মিল আছে, পরেও এমনি থাকবে বলে মনে হয়।'

'কর্ত্রী কে ঘরে?'

'বড়ো বউই কর্ত্রী। ছোটোকে মেনে চলতে হবে বৈকি? সংসার তো বড়োরই?'

'তবে, ছোটোটি একটু বেশি আদুরে হয় স্বামীর, না?'

ভদ্রলোক মুচকে মুচকে হাসেন। বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো একটু হবেই। ছেলেমানুষ, কচি বয়েস, সতীনের ঘর করতে আসে, বেশি আদর না পেলে মন ভরবে কী করে?'

ভিড় ঠেলে পাণ্ডা এসে সামনে দাঁড়ায়, বলে, 'এই স্থানই হল "দেবদর্শনী"। পথের এই মোড়টার কাছে এসে দাঁড়াও, দূরে ঐ যে বাঁ দিক হতে এক দুই তিন চার পাঁচের বরফের চূড়াটা—ঐটেই হল কেদারনাথের চূড়া, দর্শন করো।'

পথের ধারে ঘাস-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে থোকা থোকা থানকুনি পাতা। শীতের দেশ, ঠাণ্ডা লেগে যায় একটুতেই। প্রৌঢ়ের শিশুকন্যাটিরও চোখ উঠেছে। বটতলায় বসে বিশ্রাম করবার সময় দেখে বড়দি বলেছিলেন তাকে যে, থানকুনি পাতার রস ফোঁটা ফোঁটা চোখে দিয়ে দিয়ো, দু-চার দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবে। অব্যর্থ ওষুধ। কিন্তু থানকুনি পাতাটা আর কিছুতেই চেনাতে পারা গেল না। এবারে পথের ধারে দেখতে পেয়ে বড়দি তুলে নিয়ে ওদের চিনিয়ে দিলেন। বললেন, 'এই হল থানকুনি পাতা, এরই রস দিয়ো চোখ উঠলে।'

সন্তান-শোকাতুরা বৃদ্ধ পিতামাতা বসে ছিলেন পথের পাশে। একটু চলেন, একটু বসেন, এই করে এসেছেন এতদূর। আরো যাবেন কতখানি পথ। বলেন, 'উপযুক্ত ছেলে, ভরা সংসার, কোথায় আমাদের ছুটি নেবার কথা এখন, তা নয়— স্ত্রীপুত্র পরিবার সব আমাদের ঘাড়ে ফেলে সে-ই চলে গেল অসময়ে। চিরকালের এমন বুঝদার ছেলে, সে শেষটায় এত অবুঝ হল কী করে?' তাঁরা আবার লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'যাই, যাঁর বিচারে এমনটা ঘটল তাঁরই দরবারে নালিশটা জানিয়ে আসি একবার।'

বড়দি গিয়ে হাত ধরেন বৃদ্ধার। মনে পড়ে শশী মহারাজের কথাগুলি, বলেছিলেন একদিন বড়দিকে—শরীরে আঘাত লাগলে যেমন বেদনা অবশ্যম্ভাবী, প্রিয়জন-বিয়োগেও তেমনি। ব্যথা মানুষের পেতেই হবে, তার হাত থেকে নিস্তার নেই। কেবল কাঠ, পাথর, মৃত, মূর্ছিত ও সমাধিস্থের তা অনুভব হয় না। তাই শাস্ত্রে আছে—

সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতিকারপূর্বকম্ চিন্তাবিলাপরহিতং,
তাং তিতিক্ষস্ব ভারত।

সহ্য করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। তবে সংসারে ঘাতপ্রতিঘাত স্বজন-বিয়োগ "উত্তম শিক্ষক"। এ জগতে অনিত্যত্ববোধের সহায়ক। এইজন্য অনেক সাধক শ্মশান-বাস করে, এই-সমস্ত দুঃখবিপদকে সাধনার অঙ্গ মনে করে। এই-সবের জন্য সদা নিজেকে প্রস্তুত রাখার জন্যই বলা হয়, "জীব, সাজ সমরে।"— এই সংসার-সমরে কারো রেহাই নেই। "জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখানুদর্শনম্"— এই বিচার অভ্যাস করা ছাড়া উপায় নাই। "জাতস্যহি ধ্রুব মৃত্যু।"

গুপ্তকাশীতে এসে পড়ি, পাণ্ডা আমাদের রাস্তার ধারের এক তিনতলা চটিতে নিয়ে তোলেন। রাস্তার সমান লেবেলে তিন তলাটা, নীচের দু তলা পথের গা বেয়ে নীচে নামা, পাহাড়ি দেশে পাহাড়ের গা ঘেঁষে যেমন বাড়ি হয় তেমনি। কাঠের দেয়াল, কাঠের মেঝে, বেশ বাড়ি-বাড়ি ভাব। মনটা খুশি হয়ে ওঠে।

বড়দি বললেন, 'বেলা পড়ো-পড়ো— জিনিসপত্র এমনিই রেখে চলো আগে মন্দির ঘুরে আসি।'

মন্দিরের আঙিনায় লোকের ভিড়, এক নাগা সাধু এসেছেন আজ তিনদিন

হল কেদারনাথ থেকে। সেখানেই থাকেন, মাঝে মাঝে কী খেয়াল হয়, এক-দুই দিনের জন্য নেমে আসেন। আবার খেয়ালখুশিমত উধাও হয়ে যান। এখানকার লোকদের গা-সওয়া ব্যাপার, এ নিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা নেই, কৌতূহলও নেই। কতই দেখে আসছে লোকে জন্মাবধি, কত রকমের। আসেন যখন, থাকেন যখন— যে যতটুকু পারে সেবায় লাগে, এই পর্যন্ত। মন্দিরের চার দিকে বারান্দা-ঘেরা ঘর, তারই একটা ঘরে ধুনি জ্বলছে। এক প্রৌঢ়া বললেন, 'এইখানে সাধুবাবা থাকেন রাত্রে, ক্ষীর ছানা লোকে এনে দেয় খেতে— সাধুবাবা বিলিয়ে দেন সবাইকে নিজে একটুখানি মুখে দিয়ে।'

কালো কুচ্‌কুচে শরীর সাধুবাবার। বয়স বেশি না, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। সুঠাম গঠন, স্মিতহাসিমুখে বসে আছেন জোড়াসনে। বিনয়নম্র ভাব। সেই বাঙালি পরিবারের গিন্নিমারা স্নান সেরে পুজো দিয়ে ক্ষীরের সন্দেশ সাধুর মুখে তুলে দিচ্ছেন সবাই একটু একটু করে। হাসিমুখে সাধু সবার হাত থেকেই তা গ্রহণ করে উঠে কুণ্ডের জলে হাতমুখ ধুয়ে চলে গেলেন তাঁর ঘরের ভিতরে।

নিরু বললে, 'কেদারনাথের ঐ বরফে খালি গায়ে এমনিতরো দিগম্বর অবস্থায় কী করে থাকেন এঁরা?' বড়দি বললেন, 'এ হল দৈহিক তপ। এও এক-রকমের সাধনা, শরীরের উপর দিয়ে সব সহ্য করিয়ে নেবার ক্ষমতা অর্জন করেন এঁরা আগে, স্থূলশরীরের প্রাধান্য দাবিয়ে রাখতে।'

চটিতে ফিরে এলাম। পাহাড়ি বেলা গিয়েও যায় না। ধীর পদে এসে দাঁড়ালাম পিছনের রেলিং-ঘেরা কাঠের বারান্দায়। সম্মুখে দিগন্ত-ছাওয়া রংবেরঙের পাহাড়ের শ্রেণী যেন অলস ঘুমে জড়িয়ে আসছে কী সুখের আবেশে; বিশ্বজোড়া এ এক সুগম্ভীর স্তব্ধতা। কেবল বিরাম নেই মন্দাকিনীর প্রাণের আকুলতার; সে ছুটেছে, ছুটেই চলেছে— দিন নেই রাত নেই, শ্রান্তি ক্লান্তি কিছু নেই। সেই কোথায় কোন্ নীচে দিয়ে চলেছে সে গা ঢেকে, দেখি নে চোখে, কেবল কানে শুনি তার চঞ্চল নূপুরের ধ্বনি।

অদেখা আকাশের গা ফুঁড়ে পশ্চিম সীমান্ত থেকে এক আলোকরেখা পাহাড়ের মাথায় পা রেখে রেখে এসে লাগল সুদূরের কেদারনাথের বরফের গায়ে, সে আলো ছুঁয়ে বেড়াল যত শুভ্র শিখর এক এক করে। দেখতে দেখতে নীল আকাশের বুকে মেঘলোকের উপরে স্বর্গরাজ্যের স্বর্ণপুরীতে ছেয়ে গেল

স্নিগ্ধ সৌধকিরীটিনী যত। দিগন্তের শেষ আরতির ছলে কুবের যেন সব ঐশ্বর্য ঢেলে দিল মা ভগবতীর কৈলাসের সংসারে।

নিস্তব্ধ মুহূর্ত, নিবিড় তন্ময়তা। নিরু বললে, 'কেবল একটি ভাবনা মনে, বিদায়কালে দিনমণি লুটিয়ে লুটিয়ে যে প্রণাম করে গেল এমনি করে— এ কাকে করল? কার পায়ে মাথা রেখে শেষ প্রণামে প্রাণের আকুতি জানিয়ে গেল?'

কতক্ষণ কাটল কী জানি, মেঘে মেঘে ঢেকে গেল আলো— ঢেকে গেল ঐশ্বর্য, ঢাকল মনের চলার পথ। পর্দা পড়ল চোখের সামনে। মুখ ঘুরিয়ে দেখি নিরু সেইভাবেই পাশে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে, 'এই আলোর স্পর্শটুকু কবে পাব, যে আলো ছুঁতে-না-ছুঁতে সোনা হয়ে উঠবে সব। পাপ-পুণ্য বুঝি না, ধর্মাধর্ম জানি না, শুদ্ধ-অশুদ্ধ জ্ঞান আমার নেই, কেবল বুঝি সৌন্দর্য। আর এও বুঝি যে এ সৌন্দর্যের তুলনা নেই ত্রিজগতে। তাই তো রাধা বলেছিলেন— সই আমি কি এমনি রূপসী ছিলাম আগে? তাঁর অঙ্গস্পর্শে রূপসী হয়ে গেলাম—

সখি, বঁধুয়া পরশমণি—

সে অঙ্গ-পরশে এ অঙ্গ আমার সোনার বরনখানি।'

নিরু ভেবেছিল আজ রাত্রে বাইরে শোবে, বলেওছিল বড়দিকে, 'রেলিং-ঘেরা কাঠের বারান্দার ঐ কোণটায় শোব আমি আজ। শুয়ে শুয়ে বাইরের জগৎ দেখব রাত-ভ'র।' শুনে বকুনি দিয়েছিলেন বড়দি।

দাদা বলেছিলেন, 'থাক্-না, মিছে "না" বলতে যাও কেন? রাত্রিবেলা আপনা হতেই টের পাবে বাইরে শোবার মজাটা কী।'

তাই তো, শীত শীত করছে যে বেশ— বর্ষাও নামল। ঘরের ভিতরে কাঠ জ্বালিয়ে যে উনুনটায় খিচুড়ি রান্না করছে জল্‌পা, নিরু আলোয়ান মুড়ি দিয়ে সবাইকে ঠেলেঠুলে তার পাশে আগুনে-তাতা গরম জায়গাটা দখল করে নিয়ে বসে বসে ঝিমোতে লাগল।

বড়দি বললেন, 'গল্প শোনো: মহাপ্রস্থানে চলেছেন পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে। শিবদর্শনের বাসনা। সর্বাগ্রে এলেন কাশী। কলহপ্রিয় নারদ সুযোগ

দেখে ছুটলেন শিবের কাছে। বললেন "পঞ্চপাণ্ডব কুরুক্ষেত্রে অসংখ্য প্রাণী হত্যা করে পাপের ভাগী হয়েছে— তাঁদের দেখা দেবে তুমি এত সহজেই? শিগ্‌গির পালাও এখান থেকে।"

'ভাঙে ভোঁ সদাশিব "তাই তো" "তাই তো" বলে কাশী হতে পালালেন উত্তরকাশীতে। পাণ্ডবরা ধাওয়া করলেন সেখানে। সেখান হতে শিব গেলেন গুপ্তকাশীতে। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবরাও এসে উপস্থিত। শিব আবার ছুটলেন হন্তদন্ত হয়ে— এলেন কেদারনাথে। পিছু পিছু পাণ্ডবরাও এলেন ছুটতে ছুটতে। এবার তাঁরা শিবকে ধরে ফেলেন প্রায়। শিব কী করেন, কী করেন— তাড়াতাড়ি মহিষের দেহ ধরে বনের জন্তুর সঙ্গে বনে মিশে যান। পাণ্ডবরা দেখলেন, "আরে, এই দেখলাম শিবকে একটু দূর হতে— এরই মধ্যে গেলেন কোথায় তিনি?"

'এতখানি পথ পিছু পিছু ধাওয়া করে হয়রান হয়ে গেছেন— গোঁয়ার ভীম উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। ভাইদের বললেন, "এই আমি দাঁড়ালাম, তোমরা ও দিক থেকে বন তাড়া করে নিয়ে এসো। দেখি এবার কী করে পালান শিব।"

'ব'লে ভীম দু পাহাড়ে দু পা রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ দিকে চার পাণ্ডব বন তাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন। দ্বিতীয় আর পথ নেই। জন্তু জানোয়াররা ভীমের পায়ের তলা দিয়ে হুড় মুড় করে পালাতে লাগল। কিন্তু শিব তো আর তা পারেন না। ভীমের পায়ের তলা দিয়ে তিনি যান কী করে? পাণ্ডবের তাড়া খেয়ে সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ালেন। কী করবেন ভাবছেন। ভীম মহিষরূপী শিবকে ইতস্তত করতে দেখেই চিনে ফেললেন— হাতে ছিল গদা, দুম্ করে বসিয়ে দিলেন শিবের কোমরে এক ঘা। বললেন, "এবারে তুমি পালাও কী করে দেখি একবার।" কোমর ভেঙে পড়ে রইলেন শিব কেদারনাথে সেই হতে।'

বড়দি বললেন, 'দেখ নি পথে আসতে, সকলেই একটা করে ঘিয়ের টিন ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। কেদারনাথে কোমর-ভাঙা শিবের অঙ্গে ঘি মালিশ করতে হয়— এই-ই রেওয়াজ। ভীমের গদা তো সোজা কথা নয়।'

নিরু বললে, 'আর গুপ্তকাশীতে কী হয়েছিল?'

'গুপ্তকাশীতে শিব গুপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তো এখানে গুপ্তদান করার রীতি সকলের।'

দোকান হতে প্রত্যেকের নামে নারকেল কেনা হয়েছে। এ নারকেল বাংলাদেশের নারকেলের মতো নয়। শুকনো নারকেল ছাড়িয়ে ঠুকে উপরের শক্ত খোলটা ভেঙে ফেলে। ভিতরের শাঁস গোটাই থাকে। সেই নারকেলের গায়ে ছুরি দিয়ে ছোটো বড়ো ফুটো তৈরি করা— দোকানিই সব ঠিকঠাক করে রেখে দেয়— যাত্রীরা যে যার পছন্দমত কিনে নেয়। নিয়ে সেই ফুটোয় গোপনে 'দান' ভরে রাখে। পাণ্ডা বললেন বড়দিকে, 'যা মর্জি হয় স্বর্ণরত্ন দাও। যত উৎকৃষ্ট দেবে ততই তোমার লাভ।' বড়দি পিছন ফিরে নারকেলগুলিতে এক-একটা আধুলি পুরে দিলেন। নারকেল হাতে সবাই মিলে মন্দিরে গেলাম।

মন্দিরের সামনে বাঁধানো কুণ্ড। দু দিকে জল— একটা গোমুখ, একটা হস্তিমুখ। পাণ্ডা বললেন, 'হাতে করে নিয়ে খেয়ে দেখো— দুটোর স্বাদ আলাদা। গোমুখের জল গঙ্গার আর ঐরাবত-মুখের জল যমুনার।'

সংকল্প-স্নান সেরে— পাণ্ডা হাত বাড়িয়েই ছিলেন— 'গুপ্তদান' করে মন্দিরে অঞ্জলি দিয়ে চটিতে ফিরে এলাম। আজ সকাল হতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছে। বিকেলের দিকে রওনা হবার কথা, কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে পাণ্ডা বারণ করলেন। বললেন, 'তাড়া কিসের ? থাকো, আরাম করো আজ, কাল ভোরে আবার চলবে।'

একটা বেলা হাতে পেলাম, মনে হচ্ছে না জানি কত সময় পাওয়া গেল। কী করি, কী করি। নিরু ঝোলাঝুলি খুলে কাগজপত্র বের করল— কী কত-সব একরাশ উপুড় হয়ে লিখল। বারান্দায় ঝুঁকে বসে পাহাড়ি বাড়ি স্কেচ করল। চুল আঁচড়াল, সিঁথি কাটল; টিপ পরল; শেষে বড়দির দেওয়া শাঁখা শাড়ি বের করে কপালে ছোঁয়াল; বললে, 'এই সাজে সাজব আজ আমি।'

হরিদ্বারে থাকতে বড়দি একদিন কুমারী-পূজার সাজসরঞ্জাম কিনছিলেন— কালো চাটাই পাড়, কাঁচা-হলুদ বর্ণের ফিন্‌ফিনে শাড়িখানা। দেখে নিরুই পছন্দ করে দিয়েছিল বড়দিকে; বলেছিল, 'এই শাড়িখানাই নাও বড়দি— বড়ো সুন্দর মানাবে কুমারীকে।' বড়দি দুখানাই কিনেছিলেন তখন। দেবপ্রয়াগে এসে একখানায় কুমারী-পূজা করে আর-একখানা একজোড়া শাঁখা সমেত নিরুর হাতে দিয়ে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে বলেছিলেন তিনি, 'এই হল আমার সধবা-পূজা।'

নিরু এমনিতে মোটা খদ্দর পরে— সে বহু বছর ধরে। আজ অতি যত্নে নতুন শাঁখা হাতে গলিয়ে হলদে শাড়িতে সাজল শখ করে। সেজে পাতলা প্লাস্টিকের বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। মুহূর্তে মিতালি পাতাল কালো পাথরের দেশে হলদে শাড়ির আবরণটুকু দিয়ে। দূর হতে দেখছি, এক টুকরো হলদে রং ঘুরছে পথের এ মাথা ও মাথা— যেন হলুদ প্রজাপতিটি উড়ে বেড়াচ্ছে পাথরের ফাটলে গজানো ঘাসফুলের মধু খেয়ে খেয়ে।

গাড়োয়ালি যাত্রীরা চলেছে বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা মাথায় দিয়ে— ছেলেমেয়ে পিঠে বেঁধে। চেনা মুখ দেখে মুখে তাদের হাসি ফোটে।

হিন্দি সবাই বলতে জানে না। যেতে যেতে চোখ দিয়ে ইশারা করে বলে, 'চলো, চলো'; হাতের আঙুল নেড়ে ডাকে পথের সাথী হতে। ঘাড় নেড়ে জানায় নিরু— আজ যাব না, আজ থাকলাম এখানেই।

তারা চলে যায়— পথ খালি হয়। দোকানিরা চুল্লির ধারে বসে মৃদুস্বরে গল্প জমায়। পাণ্ডারা গিয়ে যোগ দেয় সেখানে। নিরু ফিরে আসে, সঙ্গে এক রুক্ষদর্শন পুরুষ। একে দেখেছি কুণ্ডচটিতে। আমাদের চটির সামনের চটিটায় বসেছিল সারাক্ষণ কট্‌কট্‌ করে তাকিয়ে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গোঁফদাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষ, গোল গোল চোখ, কেমন ভয়াবহ চাহনি।

নিরু বললে, 'লোক দেখে চেনা বড়ো কঠিন। একে দেখে আমরা তখন কত কী কল্পনা করেছি— বলেছি নিশ্চয়ই মন্দ স্বভাবের হবে— মনে কুভাব— আমি নিজেই বলেছি "দেখছ না ওর চাউনি। এমন যার দৃষ্টি সে খারাপ না হয়েই যায় না।" আসলে আমরাই ভুল করি। লোকটি খারাপ নয় মোটেই। একটু বোধ হয় মাথার গোলমাল, তাই অমন ওর ভাব মুখচোখের।'

লোকটির শখ হয়েছে, নিরুকে দিয়ে তার নিজের একখানা ছবি আঁকাবে। পথে দেখেছে নিরুকে কি-সব আঁকতে। সেই থেকে তাকে তাকে ফিরছে, এতখানি পথ এগিয়ে এসেছে। নিরু তাকে মেঝেতে বসিয়ে কাগজ-পেনসিল নিয়ে সামনে বসল।

লোকটির নাম ঈশ্বরীদত্ত শুক্ল। কেদারনাথে পাণ্ডা ছিল। আগে কেদারনাথে মন্দিরের ভিতরে নাকি হাঁটু অবধি জল থাকত। পরে ভগবানের দয়ায় আপনা-আপনি একটা নালা হয়ে যায়। সেই বরফের রাজ্যে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের মন্ত্র পড়াতে গিয়ে বয়সকালে ডান পা জখম হয়ে যায়। সেই অবধি সে

বসতে গেলে দু হাঁটু সমান ভাবে থাকে না। আগে থেকেই ঈশ্বরীদত্ত নিরুকে হুঁশিয়ার করে দিল, 'হাঁটু আঁকবার সময়ে যেন বাঁকা হাঁটুটা বুঝতে দিয়ো না, সমান করে এঁকো।'

নীচে থেকে 'ফগ' উঠে ছেয়ে ফেলল সমস্ত গুপ্তকাশী। অতি কাছের জিনিসও অদৃশ্য হয়ে গেল। বড়দি বললেন, 'এ আর এমন কি, কাছের থেকেও কাছে যে আত্মা আমাদের, তারই প্রত্যক্ষ অনুভব মিলল না এ জীবনে, —এ তো দূরের কথা। দু হাতে ঠেলতে ঠেলতে পথ কেটে চলে যাব। সন্ধ্যে হয়-হয়, চল আরতি দেখে আসি মন্দিরে।'

ঈশ্বরীদত্তও চলল সঙ্গে। ফগে-ঢাকা আলোতে পেনসিলে-আঁকা স্কেচখানা বারে বারে মেলে ধরছে আর দুঃখ করছে, 'একটু রং যদি দিয়ে দিতে তো বাঁধিয়ে ঘরে রেখে দিতাম।'

নিরুর আফসোস হয়, বলে, 'আহা রে— প্রত্যেকবারই রং-তুলি সঙ্গে আনি, এবারেই কি হল ফেলে রেখে এলাম। ভাবলাম যে ক্লান্ত থাকব, রং-তুলি ধরবারও শক্তি থাকবে না, মিছে বোঝা বয়ে মরা।'

ঈশ্বরীদত্ত বললে, 'অন্ততঃ কাপড়টাও যদি একটু লাল করে দিতে পারতে।'

পথে আসতে এক টুকরো লাল পাথর পেয়েছিল নিরু। পাহাড়ের গায়ে ঘষে বলেছিল, দিব্যি গেরী রং হয় এর থেকে। নিরু বললে, 'আচ্ছা আচ্ছা, তা হতে পারে। মন্দির থেকে ফিরে লাগিয়ে দেব লাল রং কাপড়ে।'

মন্দিরে শিবের শৃঙ্গার— শিবেরই মতো। ফুল নেই ত্রিসীমানায় একটি। গাঁদা-পাতা আর চন্দ্রমল্লিকার পাতার মতো কতকগুলি ঝিরঝিরে পাতা গায়ে ছড়ানো ; একটা রুপোর টোপর বোধ হয় কোনো ভক্ত গড়িয়ে দিয়েছে, সেই টোপর মাথায় দিয়ে পাতার সজ্জা গায়ে জড়িয়ে কালো পাথরের স্বয়ম্ভু শিব— এতেই মহাখুশি। এক প্রদীপ, তিন প্রদীপ, পঞ্চ প্রদীপে আরতি হল তাঁর, স্তব-স্তোত্রে ভরে উঠল অভ্যন্তর। কর্পূরের সৌরভে আমোদিত হল অন্তর। নাগা সাধু এসে দাঁড়িয়েছিলেন একপাশে সুবোধ শিশুর মতো ভঙ্গিতে। বড়দি একফাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে, 'বাবা, যাচ্ছি তো, গিয়ে পৌঁছতে পারব তো ঠিক ? শক্তিতে কুলোবে তো ?'

অভয়মুদ্রায় নিশ্চিন্ত করে আঙুলের ইঙ্গিতে জানালেন সাধু, 'নাম জপতে জপতে চলে যাও, চিন্তা নেই কোনো। আর এই মন, মন একমুখী রেখো।'

আশ্বাস পেয়ে বড়দির উৎসাহ উথলে ওঠে। পথে আসতে আসতে মেজদিকে বলেন, 'জানো কিরণ, স্বামী বিরজানন্দও বলতেন মনকে বশে আনাই আসল কথা। তা না করতে পারলে কিছুই কিছু নয়। কথায় বলে—

গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।

'এক' হচ্ছে মন। মনকে জয় করতে পারলে জগৎকে জয় করা যায়। সেই-জন্যই যা-কিছু সাধনভজনের দরকার।'

মেজদি বললেন, 'তা তো বুঝি। কিন্তু গুরু কৃপা না করলে কিছু কি সম্ভব ?

বড়দি বললেন, 'কৃপা করে গুরু কতটুকু তোমায় এগিয়ে দিতে পারেন ? তিনি তোমায় পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, ভুল সংশয় দূর করে দিতে পারেন, বিপথে গেলে সাবধান করে দিতে পারেন, পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, এমনকি, খানিকটা দূর হাত ধরে নিয়ে যেতেও পারেন , কিন্তু হাঁটতে হবে তোমাকেই। তিনি তোমাকে ঘাড়ে করে নিয়ে পৌঁছে দেবেন না।'

হঠাৎ নিরু কেমন রুখে ওঠে এসব কথা শুনে। বললে, 'ছাই জানো তুমি বড়দি। সেবার কেন্দুলি গেলাম— হঠাৎই যাওয়া। দিদি বললেন, "নাম শুনি এত কেন্দুলির, কখনো যাইনি— এবার যদি এসে পড়েছি ঠিক সময়ে তবে চল মেলা দেখিয়ে আনবে আমায়।" গাড়ি নেই, যানবাহনের ব্যবস্থা নেই— গোরুর গাড়িতে সারারাতের ঝামেলা, দৈবাৎ একটা ট্রাক পেয়ে গেলাম। ক্যানেল কাটা হচ্ছিল, এস. ডি. ও. ঘুরে ঘুরে বেড়ান তাতে, চারদিক পরিদর্শন করে ; তাই সই, সেই ট্রাকেই উঠে বসলাম সবাই হুড় মুড় করে। পৌষসংক্রান্তির যোগ— জয়দেবের সাধনাস্থল, বাউলদের পুণ্যতীর্থ।— এত বাউলের সমাবেশ হয় না আর কোথাও এমন ভাবে একসময়ে। অজয়ের তীরে পুরোনো বটগাছের ঝুড়ি নেমেছে অগুনতি, মাটিতে ; সেই এক-একটা ঝুড়ি ঘিরে এক-এক বাউলের দল মেতেছে নাচে গানে একতারা হাতে নিয়ে। নদীর পাড় ধরে পড়েছে হোগলা-চাটাইর বেড়া দিয়ে ঘেরা এক-এক বাউলের আখড়া। সারাদিন

ঘুরে ঘুরে দেখছি তাদের মেলা— কোথাও বা বলছি খানিক, গানের পরে গান শুনে যাচ্ছি দেহতত্ত্ব, অমরতত্ত্বের— "এ সংসার আজব কারখানা"। অন্যান্য বারে গেছি, তাঁবু ফেলেছি, মেলা হতে হাঁড়িকুড়ি কিনে খিচুড়ি রান্না করেছি— থাকা-খাওয়ার ভাবনা ছিল না কোনো, তিন দিন থেকে তিনরাত্ত জেগে বাউলগান শুনে দু চোখ লাল করে ঢুলতে ঢুলতে বাড়ি ফিরেছি। এক বছর পরে আবার পৌষসংক্রান্তিতে ছুটেছি মেলায়। এবার এলাম চলে একটামাত্র কম্বল গায়ে জড়িয়ে। ভেবেছি যদি জমে যাই থেকে যাব— নয় তো ফিরে আসব রাতারাতিই। মেলার একপাশের একটা গাছতলায় আমরা আশ্রয় নিলাম— এক বৃদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রৌঢ়া সধবা কন্যার সাহায্যে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি নামাচ্ছেন আর অনাহূত রবাহূত সবাইকে বসিয়ে নারায়ণসেবা করাচ্ছেন। সেখানেই শালপাতা পেতে বসে গেলাম। পাশেই ভেলকিবাজি খেলা দেখাচ্ছে এক জাদুকর— জোয়ান ছেলে উধাও করে দেবে বেতের ঝুড়ির নীচ হতে। ডোরাকাটা শার্ট গায়ে মনোহর বাবা এসে দেখে গেলেন খানিক। ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি মেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি। কোথাও থাকেন না বেশিক্ষণ। এবারে এসে কয়েকবারই ওঁর কথা কানে এসেছিল, বলছিল বাউলরা— "মনোহর বাবা তখন ছোটো ছেলে, ক্ষ্যাপা বাবা আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, সেই হতে কৃপা পেয়ে গেলেন। বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ, যা বলেন মিথ্যে হবার নয়।" ভিড়ের মধ্যে এইরকম দু-চার বার শোনবার পর হতেই তাঁর উপর চোখ রেখেছি। যেতে আসতে তাঁর আখড়ার সামনে দাঁড়িয়েছি। মস্ত আখড়া পড়েছে সেখানে, গোছা গোছা সোনার চুড়ি পরা গিন্নিরা কুটনো কুটছেন দেখেছি সকালে। অনেক ভক্ত নিয়ে এসেছেন কলকাতার বিশিষ্ট ধনীসমাজ থেকে। আড়ম্বর দেখেই হয়তো ঘেঁষিনি কাছে ততটা, দূর হতে কৌতূহল বাড়িয়ে চলেছি। সন্ধ্যের সময় ওঁদের আখড়ার পাশ দিয়ে আসতে গিয়ে দেখি— প্যাণ্ডেলের নীচে নামগান হচ্ছিল— সব থামিয়ে গেরুয়া শাড়ি পরা একটি যুবতী মেয়ে কর্কশস্বরে গালাগালি দিয়ে চলেছে বাঙালি ছেলেদের— "সব দেশে সব ছেলেরাই মায়ের সম্মান মেয়ের সম্মান রাখতে জানে, জানে না কেবল বাঙালি ছেলেরা। তাদের চোখের সামনে তাদের মা-বোনের উপর অত্যাচার হয়— ভীতু কাপুরুষের দল মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, কাঁদবে তবু এগিয়ে যাবে না, বীরের মতো

মরবার সাহস নেই তাদের”— ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশ বোঝা যাচ্ছে মেয়েটি আপন বশে নেই। একটি বলিষ্ঠ যুবক— হয়তো তার খারাপ লাগছে মেয়েটির এইরকম টলটলে ভঙ্গি, জড়ানো কথার সুরে ; দু-হাতে আগলে করুণ মুখে বলছে থেকে থেকে— “হল তো বলা, এবার ভিতরে চল মা।”

'“ভিতরে কেন যাব— দাঁড়াও আমি আরো বলব— তুমি সরো— সরে যাও”— তার হাতের ধাক্কায় শরীরের ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়ে ছেলেটি।

'এই মেয়েটি নাকি এ আখড়ার “মা”। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো দেখতাম, দিদি তাড়া দিলেন— “কি দেখছ! চল, ওদিকে কীর্তন শুরু হয়ে গেল বুঝি বা।”

'কীর্তন শেষ হল, রাত তখন দুটো। বটগাছের চারদিকে ঘুরে এলাম একবার— নীরব সব, কেবল ক্লান্ত বাউলরা দু হাঁটুতে মাথা গুঁজে টুং টুং একতারা বাজিয়ে নামের তান ধরে রেখেছে সুরে। রাতভোর নাম গাইবে এই সংকল্প মনে। এই রাতটুকু আমাদের তো কাটাতে হবে কোনোমতে। দিনের আশ্রয় সেই গাছতলাটিতে গেলাম। দেখি, তিল ধারণের স্থান নেই— পা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েছে যাত্রীরা। এতবড় মেলাতে একটু কি জায়গা মিলবে না শুতে? ঘুমে এবার চোখ জড়িয়ে আসছে— বহুকষ্টে কুটিরে বাবার আঙিনায় হাত কয়েক ভূমি পাওয়া গেল। যাবার মুখে মনোহর বাবার আখড়ার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম— ইচ্ছে ছিল সেই “মা”কে একবার দেখে যাই— কি অবস্থায় আছে। তাঁবুর নীচে প্যাণ্ডেলের নীচে সকলেই প্রায় শুয়ে পড়েছে— মনোহর বাবা ঘুরে ঘুরে দেখছেন সবার স্থান সুবিধেমত মিলল কি না। নিরিবিলি দেখে একটু এগিয়ে গেলাম, মনোহর বাবাকে কুশলপ্রশ্ন করলাম, খাওয়া দাওয়া হয়েছে কিনা, সংসারী যখন ছিলেন তখনকার কে কে তাঁর আত্মীয় আছে, এত লোকজনের বিধিব্যবস্থা এও তো খরচ-সাপেক্ষ— ইত্যাদি যত সাধারণ মামুলি কথা। বেশ লাগছিল। এমন সময়ে “মা” টলতে টলতে এসে উপস্থিত। পিছনে এক প্রৌঢ় গিন্নি, মাকে খেতে যাবার জন্য সাধাসাধি করছেন। “আমি এখনি খাবো কি! দাঁড়াও, সকলের খাওয়া হয়েছে কিনা দেখে নিই, তোমরা খাওগে-না যাও। এই তো আমার মা— তুমি খেয়েছ— খাওয়া হয়েছে” বলে খপ করে এসে আমার হাত ধরলে।

'বললাম, “হ্যাঁ খেয়েছি।”

'"খেয়েছ? কি রকম মা তুমি? মেয়ে খেল কি না খেল খোঁজ নিলে না— তুমি খেয়ে নিলে?" ঠোঁট ফুলে ওঠে তার। মজা লাগল। বললাম, "আমরা আধুনিক মা কিনা, একটু নির্মম। খিদে পেলে আগেই খেয়ে নিই।"

'সে অভিমানে ফেটে পড়ে। "না, আমি খাব না।" প্রৌঢ়া টানাটানি করেন, তাঁরা কয়জন মাত্র বাকী আছেন, মাকে না খাওয়ালে তাঁরা খেতে পারেন না। বেশ কৌতুক জাগল। বললাম, "আচ্ছা, আমি আবার খাব, চল। একসঙ্গে বসে খাইগে যাই।"

'"মা" আহ্লাদী বালিকার মতো আমার হাত ধরে তাঁবুর ভিতরে ঢুকল। মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে ঢাকাঢুকি দেওয়া এই তাঁবু। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারই একপাশে মায়ের খাবার ঢাকা দেওয়া, বাবার প্রসাদীথালা, জলের গ্লাস সমেত। আমার জন্য খাবার এল রান্নাঘর থেকে, অতি যত্নে শালপাতায় সাজানো। তখনো ফুলকপি তেমন ওঠেনি বাজারে— মটরশুঁটি দিয়ে ফুলকপির ডালনা, ফুলকো লুচি, সন্দেশ, ছোলার ডাল, বেগুন-ভাজা। দুপুরে খেয়েছি কলাই ডালের খিচুড়ি, রাত্রে খেয়েছি হালুইকরের দোকানে বসে তেলেভাজা সিঙারা-কচুরি। আয়োজন দেখে ইচ্ছে হচ্ছে পাতাসমেত লুচি কপির তরকারি একসঙ্গে মুখে পুরি। কিন্তু লজ্জা এমন জিনিস— একবার ঐ যে বলেছি "খাওয়া হয়েছে"— ভাবছি এখন কি করে আবার উৎসাহ করে খাই।

'মাকে বলি, "তুমি খাও, খেতে শুরু কর।"

'মা ছাড়ে না, বলে, "না, তুমি খাও তোমাকে খাইয়ে তবে আমি খাব।"

'কি করি, যেন অত্যন্ত অনিচ্ছায় লুচি একটু ভেঙে মুখে দিই, কপি তুলে দাঁতে কাটি। মা নিজের হাতে আমার হাত ধুইয়ে দিল। এবার সে থালা টেনে নিয়ে আপন খর্পরে কিছুটা নরম ভাত ঝোল তুলে নিয়ে মুখে কিছু দিল কি না-দিল, জল খেয়ে খাওয়া শেষ করল। প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা এবার নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে খেতে গেলেন। তাঁবুর বাইরে এলাম মুখ ধুতে, মাও এল।

'অজয়ের পাড়, গভীর রাত— সরু রুপালি জলরেখা পেরিয়ে ওপারে বালির চর। ক্ষীণ চাঁদ অস্ত যাচ্ছে দিগন্তে। সেই আবছা আলোয় সহসা বড়ো ভালো লেগে গেল মেয়েটিকে। উত্তুরে হাওয়ায় উড়ছে তার কালো কোঁকড়া চুলগুলি

উজ্জ্বল শ্যামল মুখখানি ঘিরে। আবেশমাখা চোখের সে বিহ্বল দৃষ্টি সরল নির্ভরে ভরা।

'তাড়াতাড়ি গায়ের গরম আলোয়ানখানা খুলে আধখানা দিয়ে তার গা জড়িয়ে কাছে টেনে নিলাম। বললাম, "এবার বল তো তোমার নিজের কথা। কে তুমি, কি ছিলে— কেনই বা এলে এই পরিবেশে।"

'সে মুখখানি তুলে চোখে চোখ রেখে বললে, "আমার কথা ? আমি ধনীঘরের মেয়ে, ধনীঘরের বউ— ভাসুর শ্বশুর স্বামী শাশুড়ি নিয়ে আমার পূর্ণ সংসার। সুখে থাকবারই কথা ; কিন্তু সুখ পেলাম না মনে। কিই বা তখন আমার বয়েস— উনিশ বছর হবে। কান্নাকাটি করে তাঁদের পায়ে ধরলাম — আমায় ছেড়ে দাও তোমরা, মুক্তি দাও। তাঁরা বুঝলেন। গুরুর কৃপা হল, তাঁর আশ্রয়ে চলে এলাম। ছেলেমানুষ ছিলাম, তাঁরা না আসতে দিলে কি আসতে পারতাম ? কি ক্ষমতা ছিল আমার ?"

'"গত বছর হরিদ্বারে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে এলাম। দেখছ-না চুল ঘাড় অবধি, সব কেটে ফেলেছিলাম, এক বছরে এতটা বেড়েছে। সোনাদানা সব খুলে ফেললাম, কি হবে আর ওসবে। এক ছেলে, মানল না কিছুতেই— এই দুগাছা বালা পরিয়ে দিল জোর করে ; তাই আছে। সংসার ছেড়ে এসেছি, এখানেও আমার বিরাট সংসার— কত ছেলেমেয়ে দেখ। তাদের সব ভাবনা ভাবতে হয় আমাকে। কি খাবে, কি পরবে— সব।"

'বলি, "আনন্দে আছ এতে ?"

'"আনন্দ ? আনন্দে বিভোর হয়ে আছি আমি। এ আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই কোনো।" দুচোখ বুজে আসে তার। অবাক হই এমন নিশ্চিত নিঃসংশয় হল সে কেমন করে। দু কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করি, "সাধনভজন কি কর তুমি ?"

'সে যেন চমকে উঠল শুনে। বললে, "কি বললে তুমি ? সাধনভজন ? আমি যদি জানি যে এই নদীটা আমি পার হব— নৌকোটা মজবুত, কোনো ফুটো নেই তাতে, মাঝি সুদক্ষ, তবে কেন ভাবতে যাব নিজেকে নিয়ে ? পূর্ণ নির্ভরে ছেড়ে দেব মাঝির হাতে আপনাকে। না না, কোনো সাধনভজন জপতপ ধ্যানধারণা কিছু করিনে আমি।"'

চটির বহু নীচে ঝরনা। মন বাহাদুরের ভাইকে আট আনা বকশিস দিয়ে

ময়লা কাপড়গুলি সাবান ঘষে ধুইয়ে আনা হয়েছিল সেই ঝরনা থেকে। বক্তি মেলে দিয়েছিলেন দেয়ালের গায়ে। না শুকোক, জলটা তো ঝরবে খানিকটা সারারাতে। পরের দিন না হয় পরের চটিতে গিয়ে রোদে মেলে দেবেন ভিজে কাপড়গুলি, দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাবে।

ঝিঙে বেগুন মিলেছিল আজ কয়েকটা। পিতৃহীন কিশোর বালক চটির বর্তমান মালিক, সেই-ই হাসতে হাসতে তুলে এনে দিয়েছিল নিজের বাগান থেকে। ছুটো ভুট্টাও এনেছিল সেই সঙ্গে; যাত্রীদের খুশি রাখতে। ঝিঙে বেগুনের তরকারি ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লাম সবাই। ভোর না হতে উঠতে হবে আবার।

ভিজে কাপড়ের ফোঁটা ফোঁটা জলে ভেজা সতরঞ্চিটা এ-পাশ ও-পাশ ফিরতে গায়ে লাগে। শিরশির ক'রে উঠছে সারা শরীর। বাইরেও বুঝি বৃষ্টি নামল জোরে এবার। বন্ধ দরজা ভেদ করে তারই শব্দ আসছে।

গভীর রাত।

নিরু নিঃশব্দে উঠে এল পাশে। হাত বুলিয়ে চোখমুখ দেখলে জেগে আছি কি না। বললে, 'জান, তারপর কতজনকে শুধিয়েছি কতবার; সবাই ঐ এক কথাই বলেন, "চেষ্টা তোমাকেই করতে হবে— হেঁটে তোমাকেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে হবে।" ভেবে কূল পাই না আর সেদিন ঐ ছোট মেয়েটা এমন জোরের কথা বলল কিসের জোরে?'

গুপ্তকাশীর পরে বুঙ্ মল্লা; চড়াই পথ। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চলেও হয়রান হয়ে পড়ি; বুঙ্ মল্লার চটিতে চায়ের প্রত্যাশায় পা ছড়িয়ে বসি। পেটে পায়ে গরম কাপড়ের পট্টি বাঁধা, পা মুড়ে কোমর এলিয়ে আরাম করে বসবার উপায় নেই মোটে। এর চেয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই সুবিধের বরং। তবে বসা মানে মনকে প্রবোধ দেওয়া যে, হাঁ, বিশ্রাম নিলাম বটে খানিক। দোকানীর পেতে-দেওয়া কালো কম্বলটায় তাই বসে পড়ি সবাই পা বাইরের দিকে মেলে। পিতলের গেলাস ভরা, আধাআধি মোষের দুধ মেশানো ঘন গরম চা খেয়ে আবার রওনা দিই। এবার পথ আরো চড়াই। বুঙ্ মল্লা নীচে পড়ে থাকে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে এবার দেখি তাদের বাড়িঘর

ঘরকন্নার কাজ। ধবক্ষেত ধানক্ষেতের সবুজে ঘেরা ছোট্টো ছোট্টো বাড়ির ছোট্টো ছোট্টো আঙিনা। মসলা পেষে, ধান ভানে কাঠের উদুখলে ঘরের বউ-ঝি। গোরু-মোষের জাব কাটে শক্ত হাতে কিশোর কুমার। বন থেকে কেটে আনা কাঁচা কাঠের বোঝা চালে তুলে রাখে বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা ; শুকোলে ঘরের কোনায় জমিয়ে রেখে দেবে শীতের জন্য। দেখতে দেখতে উঠি আর থেমে থেমে দেখি। তারাও কাজের ফাঁকে ফাঁকে থেমে দাঁড়ায়, মুখ তুলে দেখে, দেখে নথ দুলিয়ে আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মৈখণ্ডা চটিতে এসে পড়ি। পাণ্ডারা বোঝায়, এখানে মহিষমর্দিনীর মন্দির, দেবী এখানেই মহিষাসুর বধ করেছিলেন। সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করে মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে আজো। এখানকার মন্দিরগুলি সবই আকারে খুব ছোটো। মন্দির বলতে যে আকাশভেদী চূড়ার ছবি মনে আসে, এ তা নয়। ছোটো একখানা পাথরের ঘর— পাহাড়িদের ঘরের মতোই, কেবল মাথার উপরে একটা লাল শালুর পতাকা থাকে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে। হয়তো বা কারো ছাদটি সামান্য উঁচু বা গোল— একটু তারতম্য অন্য বাড়িঘরের থেকে, এই যা।

পাহাড়ের মাথায় খানিকটা সমতল জমি নিয়ে এই মন্দির, চটি, দোকান— সব মিলিয়ে মৈখণ্ডা। পাণ্ডা বললে, 'কাল বিশেষ তিথি, মার কাছে রুদ্রচণ্ডী পাঠ করব, হিসাব করে দক্ষিণা দিয়ে যাও তো তোমাদের জনে-জনের নামেও সংকল্প করব আমি।'

এখানকার চটিগুলি বেশ ভালো, শুকনো খটখটে পরিষ্কার। চারদিকের দৃশ্যও অতি সুন্দর। মৈখণ্ডা বেশ খানিকটা উঁচুতে কিনা, দূর ও নীচ দেখা যায় অনেকটা অবধি। নিরু বললে, 'থাকলে হত এখানে একরাত।'

একপাশে একটা মস্ত দোলনা। খুব উঁচু দুই খুঁটির মাথা থেকে লোহার শিকলে ঝোলা কাঠের পাটাতন।

নিরু বললে, 'এ আবার কি ?'

পাণ্ডা বললে, 'দেবী তো এখানে মহিষাসুর বধ করলেন ? অসুর মেরে দেবীর খুব আহ্লাদ হল। তখন এই দোলনাতে তিনি দোল খেলেন। তোমরাও দোল খাও, ওঠো। সব যাত্রীই এক-একবার দোল খেয়ে যায় এই দোলনায়, নিয়ম এখানকার।'

নিরু বললে, 'দরকার নেই বাপু। দেবী দোল খেয়েছিলেন, অসুর বধ করে আহ্লাদ হয়েছিল তাই। আমরা মরছি হেঁটে হেঁটে, পা গতরে ব্যথা ধরে গেছে। সিকি পথ পার হইনি এখনো। এ পাশে খদ, ও পাশে খদ; দোল খেতে গিয়ে একবার যদি ছিটকে পড়ি তবে হাড়ের কণাও খুঁজে পাবে না কেউ কোনোদিন। ও বড়দি, তীর্থস্থানের নিয়মভঙ্গ তো পাপ, তুমি এসো, দোল খাও সবার হয়ে— কোথায় গেলে?'

ততক্ষণে বড়দি গিয়ে পথে পড়েছেন। দুপুর গড়াবার আগে আগের চটিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। হাত নেড়ে তাড়া লাগালেন, 'পা চালিয়ে এসো শিগগির।'

নিরু বললে, 'মুখে যা-ই বলি, ভাবতে কিন্তু বেশ লাগে। এখানে এই হয়েছিল, ওখানে তাই, পাহাড়-জোড়া সবই যেন শিবপার্বতীর সংসার।'

বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে। ঢালু রাস্তা, পিছল পথ। পা টিপে টিপে সন্তর্পণে চলি, এঁটেল মাটিতে ঢিলে জুতো আটকে আটকে থাকে।

পাহাড়ি এক বুড়ি জল আনতে চলেছে ঝরনা থেকে। বললে, 'ছ-মাস বরফে ঢাকা থাকে সব। তিন মাস তো একেবারে জমাট বরফ। এখানেই থাকি, যাব কোথায় নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে।'

বলি, 'খাও কি তখন?'

'যব ধান তো ঘরে বারোমাসই থাকে— আর শাকসবজি সব শুকিয়ে শুকিয়ে জমিয়ে রাখি ছ-মাসের মতো। তাই খেয়েই কাটিয়ে দিই।'

'গোরু-মোষ কোথায় থাকে?'

'সেগুলি তখন আমাদের সঙ্গে ঘরেই থাকে। বাইরে কোথায় বের করব তাদের। নিজেরা বের হতে পারি না— তারাও তো প্রাণী? কী শীত।'

বৃদ্ধা পরনের কম্বল তুলে দেখালে, বললে, 'কম্বলের নীচেও মোটা গরম কাপড় পরি, পায়ে গরম জুতোমোজা পরি। কেবল এক-একবার বের হই। সামনেই তো দেখছ ধারা, এখান থেকে খাবার জল নিয়ে যাই। ছুটে আসি ছুটে যাই। মনে হচ্ছে জোর শীত পড়বে। এবার বৃষ্টিও অসময়ে হচ্ছে, ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অল্প অল্প রোদ, অল্প অল্প বৃষ্টি হলে ধান পাকত ভালো।'

বৃদ্ধা ঝরনার ধারে যায় কলসী ভরতে। আমরা এগিয়ে যাই তাকে পিছনে ফেলে।

পাকা ধানের সুগন্ধে ভরে উঠল মন। এ পথে আসতে এই চালই খেতে খেতে এসেছি। ভাত নয় যেন মুঠো মুঠো জুঁইফুলের কুঁড়ি থালা ভরা। যেমন শুভ্র তেমনই তার সৌরভ। সেই ধানই পাকছে, তারই সৌগন্ধে ছেয়ে আছে হিমেল হাওয়া। উপরে নীচে সামনে পিছনে চারদিকে সবুজ সোনালি ধানের শীষ। সুগন্ধি ফুলও পেলাম পথে কিছু।

নিরুর অভ্যেস, এঁকে বেঁকে লতাপাতা হাতড়ে পথ চলা। এটাতে হাত দেয়, ওটাতে ঝুঁকে পড়ে— ফল পাতা দাঁতে কামড়ে নাকে ঠেকিয়ে স্বাদ গন্ধ নেয়। গোলাপি রঙের পপিগোলাপে মিশ্রিত একটা নরম বাহারী ফুল দেখে তুলে নিয়ে নিরু শুঁকতে গেল, বড়দি ধমকে হাত থেকে ফুলটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, 'এ পথে কোনো ফুল শুঁকো না এমন করে।'

পাণ্ডা মহাদেবপ্রসাদ বললেন, 'হাঁ, হাঁ, বহুত হুঁশিয়ার— অমন কাজও কোরো না যেন। এসব পথে অনেক বিষাক্ত ফুলপাতা আছে, কোন্‌টা কি বোঝা দায়। কত সময়ে আমরা নাকে মুখে মোটা কাপড় জড়িয়ে তবে পথ চলি। নয় তো একটু গন্ধ নাকে গেছে কি অজ্ঞান হয়ে সেখানেই পড়ে থাকব। মরেও যেতে পারি তেমন তেমন কড়া গন্ধ হলে। তাই বলি, পাহাড়ি ফুলের সুগন্ধে বিশ্বাস রেখো না একেবারে।'

দাদা বললেন, 'আমিও পড়েছি, বালানন্দ ব্রহ্মচারী এক বইয়েতে লিখেছিলেন, এই পথে যাচ্ছিলেন তখন, এক শিষ্য ফুল শুঁকে পথেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন।'

সত্যিই হবে। মনে পড়ল সেবারে শিক্ষাভবনের ছাত্রছাত্রী নিয়ে স্বামীস্ত্রী এক্সকারশনে গেছি বিহারের ভীমবাঁধ জঙ্গলে। প্রতিবছরই এইরকম ভাবে যাই কোনো-না-কোনো জায়গায়। বনের ভিতরে তাঁবুতে থাকি, পালা করে সব কাজ নিজেরাই করি। ছাত্র-শিক্ষকে তফাত থাকে না দলে। আমার উপরে ছিল রান্নার ভার। সকালের জলখাবার করে নীলা-বাচ্চুর দল। একদিন সকালবেলা হাতমুখ ধুয়ে ঘোরাঘুরি করছি— জলখাবারের দেরি আছে তখনো, ঘুরতে ঘুরতে বনের গভীরে ঢুকে গেলাম। এ-গাছ সে-গাছ দেখে, এ-ডাল সে-ডাল হাতড়ে, এ-ফুল সে-ফুল শুঁকে বেড়াচ্ছি; দেখি, একটা লতায় বেশ বড়ো বড়ো পাতা, কাঁসার রেকাবির মতো। দেখে লোভ হল। ছিঁড়ে কয়েকটা হাতে নিলাম, ভাবলাম

সকালের জলখাবার আজ হালুয়া তৈরি হচ্ছে, আসবার সময়ে দেখে এসেছি, এই পাতায় হালুয়া নিয়ে খাওয়া যাবে। দূরে আমাদের ক্যাম্পে গামলা পিটিয়ে খাবার ঘণ্টা দিচ্ছে শুনতে পেয়েই ছুটে আসছি, দেরি হলে শাস্তি পাব ক্যাপটেনের কাছে। এক কাঠুরে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল। বললে, 'কর কি, কর কি, শিগগির ফেলে দাও ও পাতা। ও যে বিষপাতা, ওর কষ গায়ে লেগেছে কি গা পুড়ে ঘা হয়ে যাবে।'

তাড়াতাড়ি পাতাগুলি ফেলে দিলাম। আমার ভাগ্যি ভালো, বোধ হয় মায়া করে সাবধানে তুলতে গিয়েছিলাম বলেই কষ হাতে লাগেনি।

ক্যাম্পে এসে দেখি, হুলুস্থুল ব্যাপার। দলে নানা দেশের ছেলেমেয়ে। এক সিংহলী ছেলে লাঠি হাতে বনে বেড়াতে গিয়েছিল, ফিরে এসে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে অস্থির। ভয়ে বেচারার মুখ শুকিয়ে গেছে। বলে, 'বনের ভিতরে চলতে চলতে ঘন বনে ঢুকে গেছি, এমন সময়ে— বোধ হয় সাপেই থুথু ছিটিয়ে দিল, ডান চোখ থেকে গাল পর্যন্ত আমার পুড়ে গেছে।'

দেখি, সত্যিই তার গালে কপালে চোখের পাশে কালো কালো পোড়া দাগ, মনে হয় যেন কেউ গরম তেল ছিটিয়ে দিয়েছে। অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করা হল। সাপের বিষ নয়, বুঝলাম সে লাঠি দিয়ে গাছপাতায় বাড়ি মারতে মারতে চলেছিল, সেই রকম কোনো বিষপাতারই কষ হবে নিশ্চয়ই।

পিঠবোঝাই সবুজ ঘাস কেটে নিয়ে তরুণী চলেছে পথ দিয়ে। তাকে দেখে 'তাগা-সুই' বের করে দিতে গেলাম, সে মাথা নেড়ে বললে, 'চাই না।' এই প্রথম যে 'না' বললে। সূচ-সুতো এদের এত প্রয়োজনীয় যে থাকলেও নিয়ে সংগ্রহ করে রাখে। এই বনে পাহাড়ে দরকারের সময়ে চট করে সূচ-সুতো পাবে— সে উপায় এখানে নেই। তাই যাত্রীদের কাছ থেকে যে যতটা পারে নিয়ে জমায় ভবিষ্যতের ভাবনায়। জ্ঞানমহারাজ বলেছিলেন একদিন হাসতে হাসতে, 'দেখবেন, ওখানকার ছোটো ছেলেগুলির কারো মাথার টুপিটা খুলে, কাপড়ের টুপি তেলচিটচিটে কালো হয়ে আছে, তার ভিতরে চিকচিক করছে সারি সারি গাঁথা ছোটোবড়ো নানা আকারের সূচ। তবু তারা আপনার পিছু পিছু ছুটবে— "এ মাঈ, দে তাগা-সুই।" এ বড়ো রগড়।'

সরু নিচু পথ থেকে উঠে পাহাড় বেয়ে একটা রেলিংঘেরা কাঠের বারান্দা

দেওয়া পাথরের বাড়ির আঙিনায় গিয়ে উঠল সে। নিরু এতক্ষণ তাকেই দেখছিল, বললে, 'মনে হচ্ছে ও অবস্থাপন্ন ঘরের বউ, তাই নিল না তাগা-সুই।— কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘরের গিন্নিরাও তো তাগা-সুই চেয়ে নিয়েছে। দিতে দিতে এলাম কত, এতখানি পথ আসতে।'

'তবে বোধহয় আত্মাভিমানিনী। হাত পেতে নিতে পারলে না অন্যদের মতো।'

ঠিক দুপুরে এসে পৌঁছুলাম ফাটা-চটিতে। এ বেশ বড়ো চটি। দু পাশে বাড়ি, দোকান, ধর্মশালা, দু তলা বড়ো বড়ো বাড়ি। যেন গ্রাম্য শহরের ছোট্টো টুকরো একটা। গরম গরম পুরি ফুলুরি ভাজা হচ্ছে দোকানে, যাত্রীরা তাই কিনেই খেয়ে নিচ্ছে অনেকে। রাতের যাত্রী সকালে রওনা হয়ে গেছে, দুপুরের যাত্রী যাবে বিকেলে, বিকেলের যাত্রী এসে রাত কাটাবে এখানে। যাওয়া-আসার এই গতি চলেছে দিনভোর। থেকে থেকে যেন নড়েচড়ে ওঠে চটিগুলো, যাত্রীদের কলরবে ব্যস্ততায় চঞ্চল হয়ে ওঠে জায়গাটুকু ; তারা চলে যায়, আবার সব ঘরে ঘরে ঝাঁপ বন্ধ হয়, দোকানীরা বিশ্রাম নেয়, চটিওয়ালারা জটলা করে উনুনের ধারে জনকয়েকে মিলে— নয় তো তাস খেলে চটের থলি বিছিয়ে। নিস্তব্ধ হয় চলার পথের ব্যবসায়ী বসতিটুকু, দোকানী-বউর ঘরসংসার ; কম্বলে ঢাকা ছোটো শিশু কতটুকু আর রব জাগাতে পারে, শীতের দেশের এই ভারী হাওয়া ভেদ করে।

থাকব তো ঘণ্টা তিনেক, তবু দেখে দেখে দোতলার ভালো ঘরখানাই বেছে নিই আমরা। এখনো যাত্রীরা সবাই এসে পৌঁছোয়নি ; এলেই তো ঠেলাঠেলি লাগবে চটিতে, দোকানে, জলের কলের নীচে। তাড়াতাড়ি রান্নার জিনিসপত্র কিনে স্নান সেরে নিতে পথে নামলাম। হাত চালিয়ে যদি পরনের কাপড়টায় সাবান ঘষে মেলে দিতে পারি, হয়তো যাবার আগে শুকিয়ে যেতে পারে।

একতলার একটা ঘরে সেই বিরাট বাঙালিদলের অভিভাবক ব্রহ্মচারীকে দেখে ছুটে যায় নিরু, বলে, 'একি, আপনি একলা! আর সবাই কোথায়?'

ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর বিছানা বাঁধাচ্ছিলেন কুলিকে দিয়ে, বললেন, 'তারা সব এগিয়ে গেছে, আমি যাচ্ছি ধীরে সুস্থে। গিয়ে ধরে ফেলব পথে।'

সবার সঙ্গে যেচে যেচে কথা বলা নিরুর এক স্বভাব। বিরক্ত হই। বলি, 'কি লাভটা হল এ কথা শুধিয়ে?'

বললে, 'দল তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলছিলেন, হঠাৎ একলা পড়ে রইলেন— তাই কেমন মনে লাগল। মুখখানা একটু যেন মলিন দেখাল, তাই না?'

খানিক নীচে ঝরনা, কল ছেড়ে ঝরনার জলে গিয়ে নামলাম। মনের সুখে ঝরনার কালো পাথরে বসে হাত ধুলাম, গা ধুলাম, জামা কাপড়ে সাবান দিলাম, মগে করে তুলে ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢাললাম, স্নিগ্ধ দেহ মন নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে এলাম পথে।

প্রকাণ্ড এক পাইন গাছ পথের বাঁ ধারে। এমন আগে কখনো দেখিনি। একটা গুঁড়ি থেকে পাঁচটা সমান উঁচু ডাল— যেন পাঁচটা বিরাট পাইন গাছ। আসলে কিন্তু একটিই।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে বেলা তিনটা নাগাদ আবার রওনা দিলাম। এ পথটা কেবলই চড়াই উৎরাই। একবার উঠছি একবার নামছি। দু ধারে ঘন বন। ডালে ডালে ছাওয়া মাথার উপরকার আকাশটুকু। তলায় হিম-শীতল ছায়া-পথ। পথের দু ধারে অজস্র সাদা ছোটো ফুল, মাদার, বুনো-দোপাটি, আরো দু চার রকম— নাম জানি না তার। অগুনতি ডালিম-গাছ লেবু-গাছ। নাগকেশরের কচিপাতার মতো লাল লাল পাতা কতকগুলি গাছে—নিরু ছিঁড়ে নেয় একগোছা, শুঁকে বলে, 'নিশ্চয়ই এ দারচিনি গাছ — থাক্ থলিতে, আজ রাত্রে আলুর ঝোলে ফোড়ন দেব। নুন হলুদে গোলা আলুর ঝোল খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেল।'

রডোডেণ্ড্রনগুচ্ছ নেই এখন। শুনেছি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ফোটে, বনে পাহাড়ে আগুন ধরিয়ে। এখন কেবল সবুজ পাতায় ভরা গাছ পাহাড়ের পর পাহাড় জুড়ে। না জানি সে কেমন শোভা তার ফুলের দিনে।

বগলাদিদি এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ আমাদের দল ছেড়ে খানিক এগিয়ে দাদাকে গিয়ে ধরলেন। নিরুকেই তাঁর অপছন্দ বেশি, তাকে বাদ দিয়ে কোনো কথা দাদাকে বলবেন এই বোধ হয় তাঁর বাসনা। দেখে নিরুও ছুটল বগলাদিদির পিছু নিয়ে। অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম গাছপালার দিকে বগলাদিদি কেমন কড়া নজরে তাকাচ্ছিলেন। তিনি দাদাকে বললেন, 'হ্যাঁগো বাবু, এই যে শুনেছিনু কেদারবদরীর পথে যেতে রাশি রাশি ডালিম, আপেল,

নালপাতি। যাত্রীরা যেতে যেতে তোলে আর খায়— খায় আর চলে। সে-সব কই গা? আর সেই পাখি? তাই বা কই? ঐ যে যাত্রীদের ডেকে ডেকে বলে—"যাত্রী ধীরে-এ চল্, ধীরে-এ চল্; পড়বি তো মরবি, পড়বি তো মরবি।" কামারপুকুরে আশি হাজার টাকা খরচ করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে যে, সে বলেছে— "এই পাখির ডাক শুনতে একবার যাব বদরীনাথে।"'

অনেক নীচে একটা ছোট্টো বস্‌তি, বস্‌তির একটা ঘরে আগুন লেগেছে। দেখতে দেখতে সেই জমাট সাদা ধোঁয়া সবুজ ক্ষেতের স্বচ্ছতা ঢেকে আতঙ্ক জাগাল। কাক্‌রা আর ঝাজুরি তুলছিল দুটো লোক উপরের ক্ষেতে— বাজরার দানার মতো দানা, ভাতের মতো রেঁধে খায় নাকি এরা। হাতের কাজ থামিয়ে তারা চেয়ে রইল খানিক সেদিক পানে; যাওয়া-আসা সহজ নয়, যেতে যেতেই হয়তো সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসবে। আর গিয়ে করবেই বা কি? এ তো আমাদের দেশ নয়, ঘড়া ঘড়া জল তোলো, ঢালো, আগুন নেবাও। এখানে জল আনতে আনতেই গাঁ উজাড়। তার চেয়ে গেরস্থরা বাঁশ লাঠির বাড়ি মেরে আগুন আটকে রাখুক, যেটা পুড়ছে, পুড়তেই থাকুক। তাই বুদ্ধিমানের কাজ। আশ্চর্য, ছুটোছুটি নেই, ব্যস্ততা নেই! আমাদের দেশে এক গাঁয়ে আগুন লাগলে দশ গাঁয়ের লোক ছোটে সেখানে। মজা দেখতেই ছোটে সাত গাঁয়ের লোক।

পাহাড়ি দু জন আবার আগের মতন দানা কাটতে শুরু করে দিল। অশান্ত মন— সামনের দিকে পা ফেলতে ফেলতে বারে বারে ঘুরে ঘুরে কেবলই দেখে ধোঁয়াটা কতখানি কমল না-কমল।

সন্ধ্যের দিকে রামপুরচটিতে এলাম। এও বেশ বড়ো চটি। মজবুত ঘর-বাড়ি। কালীবাবার দোতলা ধর্মশালায় আশ্রয় নিলাম আমরা। বড়ো বড়ো ঢাকা বারান্দার মতো লম্বা লম্বা ঘর, তার মধ্যে আবার ছোটো ছোটো বন্ধ কুঠরি দু চারখানা। তারই একটাতে ঢুকলাম। বন্ধ ঘরে গরমে আজ আরাম করে ঘুমবো।

পরদিন ভোরে ঝম্‌ঝমাঝম্ বৃষ্টি। দেখে দাদা বললেন, 'আজ আর যাব না।'

শুনে আশ্বস্ত হই, ঘড়ি দেখি, ভোর তখন চারটে। আবার কম্বলের নীচে মুখ ঢুকিয়ে দিই। খানিক পরে শুনি দাদা বলছেন, 'না, যাব। বসে থেকে

কি লাভ? যা শুনছি এইরকম বৃষ্টি তো হরদমই হবে। বর্ষাতি আনা তো এইজন্যেই?'

বড়ো অনিচ্ছায় উঠতে হয় সকলের। বিছানা গুটিয়ে পথে বের হতে সাড়ে পাঁচটা বাজে আজ। চটির শেষ দোকান থেকে এক গোছা তামার বালা কিনলেন বড়দি। এখানে অনেকগুলি দোকানেই কর্মকাররা বসে বসে তামার বালা গড়ছে পিটিয়ে ঘষে—উঁচু উঁচু চৌকো নকশা তুলে। এই এখানকার লোকদের প্রধান ব্যাবসা। যাত্রীরা এখান থেকেই এ-বালা কেনে, কেদারে আসার নিদর্শন সঙ্গে রাখে। দোকানী বলে, 'এই বালার গায়ে যে নয়টা চৌকোনা নকশা দেখছ এ হচ্ছে "নবধাম"। কেদারনাথে গিয়ে এই বালা ছোঁয়াবে। পরে দেশে ফিরে আত্মীয়স্বজনকে দেবে একটা একটা করে বাবা কেদারনাথের বালা। এই বালা হাতে পরলে বাতের ব্যথা সারে, অবশ অঙ্গে জোর আসে, যে যা মানত ক'রে পরে, তাতেই সুফল পায়।'

কেদারনাথের দর্শন সেরে একদল বিহারী হিন্দুস্থানী ফিরে চলেছে। বড়ো হাসিখুশি তৃপ্তিভরা ভাব। এর আগেও আরো দল পেরিয়ে গেছে, সকলের মুখেই এইরকম ভাব দেখেছি। যেন একটা পরম পরিতৃপ্তি। দেখা হতেই 'জয় কঠিন কেদার কী' বলে হাসিমুখে সম্বোধন করে উঠেছে। আমরাও শিখেছি; উলটো দিক থেকে যাত্রী আসতে দেখলে আগে হতেই বলে উঠি—'জয় কঠিন কেদার কী।' তারাও সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে উত্তর দেয়। এ যেন একটা মজার খেলা।

বড়দি তাঁদের শুধোন, 'কেদার আর কত দূরে বাবা? গিয়ে কি পৌঁছুতে পারব হেঁটে?'

বুড়ী বললে, 'ভয় কি? তাড়াই বা কিসের? ভগবানের দেশে এসে গেছ, ধ্যান করতে করতে হাঁটতে থাকো। চটিতে চটিতে বিশ্রাম করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও।'

পাহাড়ি বুড়ো বললে, 'এখন কেন এলে মা! বর্ষা নামবে যখন-তখন। বাংলা থেকে এলে এই সময়ে! যাও, কেদার কৃপা করলে ভালোই দর্শন মিলবে। তিনি ডেকেছেন যখন, কোনো অসুবিধা হবে না।'

এঁদের কথাগুলি বড়ো মিষ্টি, ভাষায় কি এক সুন্দর মধুর টান। কাটাচটিতে এক বাড়িতে শশা দেখলাম। শশা তো নয়, যেন এক-একটা

চালকুমড়ো। দেখে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। শেষে বিশ্বাস যখন করলাম, তখন নিজেদের মধ্যেই বাজি ধরলাম— নিশ্চয়ই শশাটা পাকা, বুড়ো। লোকটি কি বুঝেছিল কি জানি, আমাদের রকমসকম দেখে শশাটা এনে হাতে তুলে দিল। বললাম, 'দাম কত ?' সে জিব কামড়ে বললে, 'দাম ? ছিঃ। বাবা কেদার গলায় রশি লাগিয়ে কেবল ভক্তদেরই টেনে আনেন এই পথে। সবাইকে নয়। অনেক ভাগ্যবলে এসেছ এখানে— তোমরা বাবার পেয়ারের লোক। তোমাদের কাছ হতে দাম নেব ? ও কথা বোলো না। অমনিই খাও শশাটা। মিষ্টি কচি শশা। ভক্তদের সেবা করতে পারলাম, এই আমার পুণ্যি।'

অভিভূত হয়ে গেলাম তার কথা শুনে।

কয়েকটি কিশোর নেমে এল ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শন করে। ছুটির দিনে লাফাতে লাফাতে দল বেঁধে যায় ছেলেগুলি ত্রিযুগীতে, এদের আর তাতে কষ্ট কি ? সব ক'টারই হাত আর ঠোঁটে কালো কালো ছোপ। বললে, গাছ থেকে কাঁচা আখরোট পেড়ে নুড়িতে ঠুকে ভেঙে খেতে খেতে গেছে, খেতে খেতে আসছে। তারই এই দাগ। মাথার টুপিতে সাদা ঘাসের মতো কি যেন সবার গোঁজা।

বলি, 'এ গুলি কি ?'

তারা বললে, 'দেবতার আশীর্বাদ।'

এখানে ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদের রেওয়াজ নেই। গম জলে ভিজিয়ে অঙ্কুর বের করে গোছা বেঁধে রাখে, তাই কয়েকগাছি করে আশীর্বাদী দেয় পূজারী সকলের হাতে।

পথ কেবলই চড়াই। উঠতে উঠতে শাকম্বরী দেবীর কাছে এসে পৌঁছই। পথের মাঝখানেই ছোট্টো মন্দির, তার ভিতরে কালো পাথরের ছোট্টো মাজাঘষা লেপাপোঁছা মূর্তি টুকরো টুকরো রঙিন কাপড়ে ঢাকা। পূজারী এখানকার স্থানমাহাত্ম্য পড়ে শোনালেন সংস্কৃতে, সুন্দর সুরেলা সুরে। পরে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, 'বড়ো পুণ্যস্থান এ-জায়গা। আগে এখানে দেবতাদের বাস ছিল, ঋষি-মুনিরা এসে তপস্যা করতেন। রক্তবীজের অত্যাচারে তাঁরা অস্থির হয়ে দেবীর শরণাপন্ন হলেন, দেবী শাকম্বরী এইখানেই রক্তবীজকে বধ করেছিলেন। আর ঐ শব্দ শুনতে পাচ্ছ ? নীচে সংগম; মন্দাকিনী আর বাসুকি এসে মিশেছে সেখানে। সেই সংগমে স্নান করতে

এসে দুর্বাসার কাপড় ভেসে গেল। দ্রৌপদীও এসেছিলেন জল ভরতে, দেখে আঁচল ছিঁড়ে দুর্বাসাকে দিলেন। আর-এক ফালি তিনি একবার কৃষ্ণকে দিয়েছিলেন; সুদর্শনচক্রে কৃষ্ণের হাত কেটে গিয়েছিল। সেই বরেই তো দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে চাইল কিছুতেই পারল না। যত টানে ততই দ্রৌপদী "নারী সে শাড়ি, শাড়ি সে নারী" হয়ে রইল। আর দুর্বাসাকে কাপড়খণ্ড দিয়েছিল বলে দুর্বাসা বর দিলেন, এখানে যে চীরখণ্ড দান করবে তার কখনো কাপড়ের অভাব ঘটবে না।' বলতে বলতে পূজারী সামনের কাঠের বাক্সটা খুলে ম্যাজিকের মতো একরাশ ফালি ফালি রঙিন কাপড়ের টুকরো সামনে ছড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'এই নাও, চার-চার আনা লাগবে— যার যত খণ্ড ইচ্ছা নিয়ে মায়ের গায়ে চাপাও।'

দরজির দোকানের ছাঁট-কাটা টুকরোর মতো টুকরোগুলি যাত্রীরা কাড়াকাড়ি করে পয়সা দিয়ে নিয়ে শাকম্বরীর গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে চীরখণ্ড দান করল। বড়দি মনে মনে কার কার নাম গুনে অনেকগুলি চীরখণ্ডই হাতে বেছে তুলে নিয়েছিলেন, নিরু বললে, 'রেশনের বাজার, চার আনায় যদি কাপড়ের অভাব ঘোচে, আর তা ছাড়া পূজারী এমন করে কাহিনী শোনালে তার দক্ষিণাও তো দিতে হয়— এক ঢিলে দুই পাখি মারো এই ফাঁকে বুদ্ধিমতীর মতো ঝটপট সবাই।'

চীরখণ্ড কম পড়ে গেল, পূজারী শাকম্বরীর গা থেকে ছোঁ মেরে কতকগুলি কাপড়ের টুকরো এনে হাতে হাতে আবার বিলিয়ে দিল।

বহু কষ্টে খাড়া চড়াই পেরিয়ে ত্রিযুগীনারায়ণে এসে পড়ি।

ত্রিযুগীনারায়ণ নারায়ণ-প্রতিষ্ঠিত মন্দির। নারায়ণকে সাক্ষী করে পর্বতদুহিতা পার্বতীর এখানে শিবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তিন যুগ পেরিয়ে গেছে, আজও নারায়ণ সাক্ষীস্বরূপে এখানে বিদ্যমান আছেন। বিবাহে যে হোম হয়েছিল সেই অগ্নি আজও সমানে জ্বলছে। অনির্বাণ অগ্নিশিখা। যাত্রীরা যারা আসে, অগ্নিতে কাঠ ফেলে দেয়। পূজারীদের উপর বরাদ্দ আছে জ্বালানি কাঠের বিশেষ ব্যবস্থার। এই পবিত্র অগ্নির নাম ধনঞ্জয় অগ্নি।

মন্দির-প্রাঙ্গণে ছোটো ছোটো কুণ্ড। এই শীতে কন্‌কনে জলে যে পারে স্নান করে, নয় তো ব্রহ্মকুণ্ডে সূর্যকুণ্ডে বিষ্ণুকুণ্ডে সরস্বতীকুণ্ডে মার্জন আচমন তর্পণ সেরে হরগৌরীর বিগ্রহে জল 'চড়ায়'— মানে তাঁদের স্নান করায়। গর্ভ-

মন্দির ও ব্রহ্মকুণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় হরপার্বতীর বিবাহের কুশণ্ডিকাযজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নির সামনে এলাম। সেই বিবাহে স্বয়ং ব্রহ্মা ছিলেন পুরোহিত।

বাঁধানো হোমকুণ্ডের একধারে সৌম্যমূর্তি এক ব্রাহ্মণ বসে আছেন, বললেন, 'আজ শুভতিথি, শুভ যোগ— যজ্ঞাহুতি দাও।'

কদম্ব-কাঠই দেবার নিয়ম এখানে। এক বোঝা কাঠ কিনে আগুনে ফেলা হল। কুশের আংটি অনামিকায় পরে, অঞ্জলিভরা যব তিল ঘি নিয়ে বারে বারে আহুতি দিলাম। পুরোহিত মন্ত্রস্বরে মন্ত্র পড়াতে লাগলেন, 'ওঁ অন্নময়ায় স্বাহা। ওঁ প্রাণময়ায় স্বাহা— মনোময়ায় স্বাহা— বিজ্ঞানময়ায় স্বাহা— আনন্দময়ায় স্বাহা, পরমাত্মনে স্বাহা—।'

প্রতিবারে সকলের আহুতি হোমকুণ্ডে পড়ে আর আগুন দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে। ঘি কর্পূর চন্দন ধূপের সুবাসভরা অগ্নির আলোয় আলোকিত মন্দিরপ্রাঙ্গণটিতে এক অপরূপ মাধুরী মায়া বিস্তার করে।

কুণ্ড প্রদক্ষিণ করে নিরু বললে, 'কখনও তো দিইনি আহুতি এর আগে, বেদমন্ত্রের কি গুণ জানি না— সমস্ত শরীর আমার কেমন জানি ঝিমঝিম করছে। এই আবেশটা থাকে স্থায়ী হয়ে, তো বেশ হয়। আপন পর, আলো বাতাস, ভূলোক দ্যুলোক— সবাইকে "স্বাহা" "স্বাহা" করতে করতেই শেষে বোধ হয় একদিন অনুভবে আসে— ইদং সর্বং খলু ব্রহ্ম, এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।'

আজ আর রান্নাবান্নার হাঙ্গামা নয়। দোকান থেকে পুরি তরকারি পেঁড়া কিনে খেয়ে নিলাম সবাই। তামার পাতে ছাপে তোলা ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির, মূর্তি বিক্রি হয় এখানে, কয়েক ডজন তা-ই নেওয়া হল। ছবিও মেলে, হাতে আঁকা ও ফটো দুই মিলিয়ে ছাপা। দু আনা চার আনা দাম। সে-সব সংগ্রহ করে ফের রওনা দিলাম।

ত্রিযুগীনারায়ণ কেদারনাথের পথ হতে সরে অনেকখানি উপরে। এখানে এসে আবার নেমে আগের পথ ধরে চলতে হয়। পাণ্ডা বললে, 'একটা পাকদণ্ডী অর্থাৎ শর্টকাট্ আছে— পায়ে-চলা সরু পথ, সেই পথ ধরেই নেমে যাও, সহজ হবে।' পথ দেখিয়ে দিয়ে পাণ্ডা বিদায় নিল। আমরা পর-পর এক-একজন করে নামতে লাগলাম। সরু পথ, পাশাপাশি দু জন চলবার উপায় নেই, তার উপরে জলে-কাদায় পিছল; দু পাশে ঘাস ফার্নের ঝোপ। লোকজন কেউ কোথায়ও নেই। কেন যে

এলাম এ-পথে। যত চলি পথের আর শেষ নেই। একবার চলতে শুরু করে পিছন ফেরা যায় না। মনে হয়, এই বুঝি ঠিক জায়গায় এসে পড়লাম। আবার তখনি বোঝা যায়, সেখান থেকে ফিরে গেলেও বুদ্ধিমানের কাজ হত। পিছন ফিরে তাকাতে গেলেই পিছনের তিনি তাড়া লাগান— থামছ কেন চলো, চলো। তিনিও তেমনি তাড়া খান, তাঁর পিছন থেকে। বেলা আছে, তবুও এই বনে ঢাকা পথে কেমন বেলা-পড়ো-পড়ো ভাব। বাক্ রুদ্ধ সকলের। মনের ভাবনা মনে চেপে প্রাণপণে পা চালাচ্ছি, অতি সাবধানে। আছাড় খেলে আরো বিপদ।

হঠাৎ একটা প্রবল গর্জনে চমকে উঠে নিরু থমকে দাঁড়ায়। পর পর আমরাও থামি। যেন প্রলয়ঝঞ্ঝা— পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ করে একটা বিরাট ভাঙচুর ঘটছে সামনে। খানিক কান পেতে থেকে নিরু আগ্রহে ছোটে— 'এ নিশ্চয়ই সেই বাসুকি-মন্দাকিনী। এসে গেছি তাহলে আসল পথের কাছাকাছি।'

খানিক এগিয়েই মজবুত একটা কাঠের পুল। মাথা তুলে উপর দিকে তাকায় নিরু, বলে, 'কত নীচে যে এসে গেছি কে জানে— একেবারে মাটি ছুঁয়ে মন্দাকিনীর বুক পার হচ্ছি। ঐ দেখ, ও পার আবার সোজা খাড়াই। আবার অতখানি উঠতে হবে।' গলার স্বর ভেঙে পড়ে তার।

উতরাই আর চড়াই, চড়াই আর উতরাই; পাহাড়ের এ বিড়ম্বনা বড়ো দুঃখের। প্রথম দিন গুপ্তকাশীতে উঠে নিরুর কী উৎসাহ, বলে, ৫০০০ হাজার ফিট উঠেছি, আর কয়েক হাজার দেখতে দেখতে উঠে যাব। পরে যখন থেকে থেকে ওঠে আর নামে, নামে আর ওঠে, হাল ছেড়ে দিল নিরু, বলে, 'থাক্ গে থাক্, ওঠানামার হিসাব নেওয়াই ভুল এ-পথে। চলতে চলতে একদিন গিয়ে পৌছুব— সেই আশাতেই থাকা ভালো সবচেয়ে।'

পুল পেরিয়ে ফের কেদারনাথের আসল পথে পড়ি। চড়াই চড়তে চড়তে উঠছি। নীচে পড়ে থাকছে সোনপ্রয়াগ— বাসুকি মন্দাকিনীর সংগমস্থল। তুমুল তাণ্ডব চলেছে সেখানে। দুই উন্মাদ স্রোতের সংঘর্ষণে চূর্ণবিচূর্ণ জলকণা-রাশি সাদা ধোঁয়ার মতো ছেয়ে ফেলেছে তল্লাটটা। নিরু বললে, 'গঙ্গা নাকি

মাতৃরূপিণী, তবে তার এই প্রচণ্ড প্রলয়-মূর্তি কেন? একে এখানে দেখলে কে বলবে যে, পরে এ-ই নির্জীব রুক্ষ বসুন্ধরাকে শ্যামল সুন্দর রূপে সাজিয়ে কল্যাণময়ী করে তুলেছে। এ যেন বন আর বাগান, ঘর আর আঙিনা, অন্তর আর বাহির। এক জায়গায় প্রবল দ্বন্দ্ব, উত্তাল তরঙ্গ, আকুল ভীতি; আর-এক জায়গায় স্থির কর্তব্য, নির্ভয় আশ্রয়, নিশ্চিত বিশ্বাস। সকলেরই আমাদের দুই-দুই মূর্তি। কারো কাছে কোনোটা বেশি প্রকট হয়, এই আর কি।'

বনে জঙ্গলে ঢাকা পথ পেরিয়ে ক্রমে ক্রমে খোলা আকাশের নীচে এসে মাথা পাতি। উজ্জ্বল সবুজ রঙের লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা এ পাহাড়, ও পাহাড়, সে পাহাড়। তার মাঝে বড়ো বড়ো ঘন সবুজ রডোডেণ্ড্রন বৃক্ষ, যেন যত্নে সাজানো বাগান সারা পাহাড়ের গা জুড়ে। না জানি কেমন হয় দেখতে ফুল ফোটার কালে।

এক পাহাড়ি তরুণী নীচের পাহাড় বেয়ে পথে উঠে এল। কোমরে কাস্তে গোঁজা। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল; তাকিয়ে, কচি ঘাসের শিকড় মুঠিতে চেপে চেপে তরতর করে পাহাড়ের গা বেয়ে তার মাথায় উঠে গেল। সেখানে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন কি খুঁজে দেখল দূরে চারদিকে। পরমুহূর্তে যেন নিজেকে ছেড়ে দিল পাহাড়ের গায়ে, হুড়মুড় করে পড়ে, আর পায়ের গোড়ালি দিয়ে ক্ষণেকের জন্য ঘাসের চাপড়ায় নিজেকে আটকে সামলায়, দু হাতে এদিক ওদিক দুটো-চারটে ঘাসের মাথা ধরতে গিয়ে পটপট ছিঁড়ে পথে নেমে এল, এসে কাস্তে দিয়ে হাত চাঁছল, পা চাঁছল, কম্বল চেঁছে কাঁটা, ঘাস, গোটা ফেলল; শেষে কাস্তেটা কোমরে গুঁজে ঘাস ধরে ধরে নীচের পাহাড়ে আবার নিজেকে ছেড়ে দিল।

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। নীচ থেকে এল, পাহাড়ের মাথায় উঠল, নামল, আবার নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথম তো ঐ খাড়া পাহাড়ে ওঠাই দুঃসাধ্য। এবড়োখেবড়ো পাহাড় হয়, তবু বুঝি। এ থেকে একবার গড়ালে আর রক্ষে নেই জ্যান্ত জীবের। যদি চলতি পথ থাকত তবে অন্তত পক্ষে একবেলা উঠতে একবেলা নামতে সময় লাগত আমাদের। আর সেই ঘাসে ঢাকা মসৃণ পাহাড়ে কি না মেয়েটি অবলীলায় লীলা দেখিয়ে গেল! হাঁ হয়ে গেছি সবাই।

নিরু বললে, 'এ পথে এসে অবধি নানান কাহিনী শুনে আসছি, এখানে

অমুক হত, ওখানে অমুক হয়েছিল, মৈথণ্ডায় দেবী মহিষাসুর বধ করে-ছিলেন, শাকম্বরীতে রক্তবীজের নিধন হল, কত কী। দেবস্থান দেবদেবীর ক্রিয়াকলাপে ভরা জায়গা। এ সব শুনে শুনে কল্পনার রাজ্য থেকে তাঁরা যেন নেমে আসেন তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে। মনে হয় এ আর অসম্ভব কি? এই তো দেখলে এখন চোখের সামনে, কী অদ্ভুত কৌশল— কী অদম্য শক্তি সাহস। পার্বতী তো এমনি পর্বতদুহিতাই ছিলেন? মহিষাকৃতি ভীষণদর্শন এক দানবকে তিনি বধ করেছিলেন এ আর এমন অবিশ্বাস্য কিসে বল? মানুষই তো শক্তি লাভ করে দেবতার ধাপে উঠে যান।'

বাঁ দিকে ছোট্টো একটা পাথরের গাঁথনির ঘরে মুণ্ডহীন লাল গনেশমূর্তি, তেল সিঁদুরে চপ্‌চপে গা।

নিরু বললে, 'গণেশ জানি জন্মেই মুণ্ড হারিয়েছিলেন শনির দৃষ্টিতে। লাল টুকটুকে ছেলে— সব দেবতারা দেখতে এলেন, শনি এলেন না। অভিমান হল পার্বতীর। তলব পাঠালেন শনিকে। শনি বললেন, "দেখব কি করে? আমার দৃষ্টি যে শনির দৃষ্টি— যেদিকে তাকাব উবে যাবে সব।" পার্বতী বললেন, "তা যায় যাবে, তবু তুমি এসো।" অভিমানের জেদ বড়ো মারাত্মক। শনি এলেন— ছেলের মুখ দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাথা উধাও। তখন পার্বতীর হুঁশ হয়— এ কী করেছি, কাকে ছেলের মুখ দেখতে ডেকেছি। কান্নাকাটি, হুলস্থূল ব্যাপার। কি করা যায়, কি উপায়? তখন শনি বললেন, "উত্তর দিকে মাথা দিয়ে যে শুয়ে আছে তার মাথা এনে কেটে লাগিয়ে দাও।" খোঁজ, খোঁজ। খুঁজে পাওয়া গেল এক শ্বেতহস্তীকে। তারই মাথা এনে বসিয়ে দিল গণেশের ঘাড়ে। শিশুকালে বিছানায় শুয়ে গল্প করতে করতে দিদিমা বারে বারে আমাদের মাথাগুলি টেনে টেনে ঠিক দিকে সরিয়ে দিতেন। বলতেন, "উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুতে নেই— উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুয়েছিল বলেই তো হাতি বেচারা মাথা হারাল।" কিন্তু এই কাটামুণ্ডু গণেশ আবার কিসের?'

বড়দি বললেন, 'আছে, এরও আর এক গল্প আছে। এ আসলে আসল গণেশ নয়। শিবপার্বতী ঘরে আছেন, দোরে মাটির গণেশ বানিয়ে পাহারায় রাখলেন। এদিকে আসল গণেশ কি কারণে ঢুকে পড়েছে ঘরে। পুত্রের সামনে লজ্জা পেলেন পার্বতী। পার্বতীর লজ্জাজনিত উষ্মা কোথায় আরোপ

করেন, গণেশকে বাঁচাতে হবে, তাই মাটির গণেশের উপর তা নিক্ষেপ করলেন। চোখ দিয়ে দেখছিল বলে সেই চক্ষু সমেত মাথাটাই তার নিপাত হয়ে গেল।'

কাটামুণ্ডু গণেশ পেরিয়ে পথের বাঁকে ডান দিকে ঢালু খদের গা বেয়ে পথ ছাপিয়ে উঠেছে একটা দোতলা বাড়ি। কাঠের বারান্দা কাঠের রেলিং— সবুজ রং দিয়ে লেপা। বেয়ে উঠেছে আঙুরলতা নীচের মাচান থেকে উপরে রেলিঙের গায়ে গায়ে।

নিরু আগ্রহে আক্ষেপ করে ওঠে, 'আহা— এমন বাড়িতে যদি থাকতে পেতাম আমি। কিছু না, কেবল ঐ ক্ষুদে জানালাটিতে মুখ রেখে বসে থাকতাম, আর দেখতাম—দিগন্তজোড়া পাহাড়ের তরঙ্গমালা, নীচে থেকে ধীরে ধীরে মেঘ উঠে এসে ঢেকে ফেলল সব, পাশ থেকে ঝিলিক হানল একটুকরো আলো, মেঘ চমকে ছুটল, আলো তাড়া লাগাল, ছুটোছুটি ছোঁয়াছুঁয়ি, কখনো এ হাসে, কখনো ও কাঁদে; নিঃশব্দে লীলা-কৌতুক চলে—বিশ্বজোড়া সুনীল আকাশের তলে। বসে বসে তাদের সঙ্গে ভাব জমাতাম, নিজেকে সে-খেলার সঙ্গী করে নিতে।'

এ যাবৎ কত জায়গা কত বাড়িঘর কোনা ঘুপসি দেখেই সে এ-কথা বলে উঠেছে। বলে, 'কি জানি— এক একটা জায়গায় এসে কেমন যেন মনে হয় এ আমার নিজভূমি, বড়ো আপনার মাটি, দেখে মায়া লাগে। আবার কোনোটার জন্য বাসনাও জেগে থাকে মনে।'

পথ আর ফুরোয় না। এ-পথের এক ফার্লং মনে হয় সমতলভূমির এক মাইলেরও বেশি। সন্ধ্যে হয়ে আসে। সূর্যের আলো সারাদিন বাদে শিখর ছুঁয়ে অস্ত যায়। পাহাড় কাটা পথ; কাটা পাথর জলে ভেজা কালো গা নিয়ে চকচক্ করছে মাথার উপরে, যেন ধসে পড়বে এখুনি। কালো ঝাপড়া গাছ-গুলি এলিয়ে এসেছে দু ধার হতে, লিকলিকে কালো ঘাসগুলি লম্বা লম্বা আঙুল মেলে যেন থাবা বাড়িয়েছে পথের পাশে। মনে হল যুগযুগান্ত ধরে ভীতিবিহ্বল অজানা আশঙ্কায় অন্ধকারে একাকী চলেছি এমনি— পায়ে পায়ে লাঠির ভর দিয়ে।

রাতের আঁধারে 'গৌরীকুণ্ডে' আসি। ঘরে ঘরে কেরোসিনের ডিবের টিমটিমে আলো, কাঠের ধোঁয়া, উনুনের আগুন, কালো কম্বলে মোড়া

পাহাড়িদের ভুতুড়ে নড়নচড়ন সরু ফালি পথটায়; তার উপর গা ঘেঁষে মন্দাকিনীর হুংকার, যেন সর্বনাশ ঘটল বলে এক্ষুনি— ভাসল বলে সব।

যাত্রীরা রান্না চাপিয়েছে কালো হাঁড়িতে, কালো মানুষের জটলা ঘেরা উনুনের উপরে। দোকানীরা সওদা বেচছে গোল গম্বুজের মতো ছায়া ছড়িয়ে। এই পাহাড়ি পথে এই শেষ লোকের বাসবসতি বারো মাসের জন্য। এর পরে যা আছে তা কেবল ছয় মাসের। যাত্রীদের আনাগোনা শেষ হতে হতে এরাও ব্যাবসা গুটিয়ে নেমে আসে। বরফে ঢাকে দেশ, বাসের অযোগ্য হয় স্থান। গৌরীকুণ্ডের বাসিন্দাই বেশির ভাগ তারা। বরফ গলতে আরম্ভ করলে আবার গিয়ে ডেরা বাঁধে, মোষ ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে উপরে তোলে।

খোলা বারান্দা দেখে এক দোতলায় আশ্রয় নিলাম রাত্রিবাসের জন্য।

এখানকার বাড়িগুলির পাথরের গাঁথনি, মেঝেটা মাটি লেপা। ছাদও পাথরের; স্লেটের মতো চৌকো চৌকো পাতলা পাথর পর পর টালির মতো সাজানো। রামপুর চটিতে টিনের চাল ছিল দেখেছি।

গায়ে বড়ো ব্যথা।

দারুণ শীত। সঙ্গের কম্বলে আর মানে না এখন। পাণ্ডা কয়েকখানা লেপ এনে দিল। শুতে গিয়ে দেখি বাঁ দিকে কেমন যেন গড়িয়ে যাচ্ছি। বোধ হয় ঢালু এদিকটা। অন্ধকারে হাতড়ে হাতের বর্ষাতিগুলি পেলাম— তাই টেনে এনে পিঠের নীচে গুঁজে দিলাম।

মাথার দিকটায় খোলা আকাশ। একবার ঘাড় উঁচু করে তাকালাম। নবমীর চাঁদ উঠেছে ওপারে কালো পাহাড়ের মাথায়। সামনের ঘরের চালে দু সারি সাজানো পাথর, তারই উপরে এসে পড়েছে চাঁদের আলো।

গৌরীকুণ্ড— এখানে কুমারী গৌরী যৌবনপ্রাপ্তা হয়েছিলেন। কন্‌খলে সতীর দেহত্যাগের পরে নগরাজ-হিমালয়কন্যা হয়ে তিনি মা মেনকার কোল আলো করেন। পার্বতীর এই জন্মের লীলাভূমি তাই এই হিমালয়ের বুকেই।

সকালে উঠেই আগে স্নানের আয়োজন হাতে নিয়ে বেরিয়েছি। শুনেছিলাম গরম জলের কুণ্ড আছে এখানে। পাণ্ডাই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বসতির মাঝখানে একটি ছোট্টো আঙিনার সামনে ছোট্টো গৌরীমন্দির, ভিতরে গৌরীমূর্তি। পাণ্ডা বলে, গৌরী নাকি এইখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সেখান থেকে আমরা গরম জলের কুণ্ডের কাছে এলাম। বেশ বড়ো একটা

বাঁধানো চৌবাচ্চা, চারিদিকে নামবার সিঁড়ি। তপ্তকুণ্ডের একদিকে পিতলের গোমুখ থেকে অনবরত গরম ধারা পড়ছে। অন্যদিকে হয়তো জল বেরিয়ে যাবার নল আছে, নয় তো ভেসে যেত ছোট্টো নগরটুকু রাতারাতিই। বুক-সমান নির্মল উষ্ণ জল। বড়দি এরই কথা বলেছিলেন একদিন পথে আসতে যে, ধ্যানমগ্ন মহাদেবের উষ্ণ অঙ্গস্বেদ হতেই নাকি এই তপ্তকুণ্ডের উদ্ভব।

সিঁড়ির উপর শুকনো কাপড় রাখতে রাখতে নিরু বললে, 'আর দেরি করে লাভ নেই,— গরম গরম পাওয়া গেছে যখন স্নানটা সেরেই ফেলি। নয় তো বড়দি ওদিককার ঐ ঠাণ্ডা কুণ্ডতেই স্নান করাবেন আমাকে, বলবেন, এখান থেকে এবার একটানা বাবা কেদারনাথের কাছে গিয়ে পৌঁছব— স্নানশুদ্ধ হয়ে না নিলে কি চলে কখনো?'

ঠাণ্ডা কুণ্ড আছে একটা কাছেই। জল কেমন যেন মরচে ধোয়া হল্‌দেটে, গন্ধটাও তেমনি। কি জানি পাহাড়ের নীচে জলের স্রোতে কি ঘোঁটাঘুটি চলছে, খেতে নাকি সোডার মতো স্বাদ। নলের মুখের পাথরটা লাল হয়ে আছে, যেমন লোহাতে 'কল' পরে সেই মতো। পাণ্ডা খানিক তুলে এনে বাঁ হাতের তেলোতে তিলক মাটির মতো ঘষে কপালে তিলক পরিয়ে দিলে।

জ্ঞান মহারাজ বলে দিয়েছিলেন, 'গৌরীকুণ্ডে গরম জলে স্নান করবার কায়দাটা জেনে রাখুন। জল অত্যন্ত গরম। আস্তে আস্তে গরম সইয়ে সইয়ে ডুব দিতে গেছেন কি বিপদ, রক্ত মাথায় উঠে যাবে। জল স্পর্শ করে মাথায় ছুঁইয়ে মরি বাঁচি জলে নেমে চোখ কানবন্ধ করে প্রথমেই দুটো ডুব দিয়ে নেবেন, তারপর দিতে চান আর দুটো দেবেন। তা অবিশ্যি দিতে হবে না, অমন জলে থাকাই কষ্টকর। তবে স্নানটা কোনোমতে করতে পারলে আরাম পাবেন। দেহের ব্যথা বেদনা হাল্‌কা লাগবে।'

বগলাদিদির ঠিক মনে ছিল সে-কথা। আমাদের কাছ থেকে সরে ওদিকের সিঁড়ি ধরে নেমে ঝপাঝপ দুটো ডুব দিয়ে উঠে পড়লেন পারে। মনে হল পিঠটা যেন লাল হয়ে উঠেছে।

আর এদিকে আমরা জলে হাত ছোঁয়াই— ছ্যাক্‌ করে ওঠে। পা ফেলি— পা পুড়ে যায়। কুণ্ডে নামা দূরের কথা, ঘটিতে তোলা জল গায়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে স্নান সারি। কন্‌কনে হাওয়ায় বসে গরম জলে স্নান— নিরু বলে, 'বাদশা বেগম লাগে কোথায় এ বিলাসিতায়।'

আজ আর রান্নার সময় নেই। দোকানে পুরি-তরকারির অর্ডার দেওয়াই ছিল, খেয়ে রওনা হয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। ত্রিযুগী ছিল পাঁচ হাজার ফিট, গৌরীকুণ্ড ছ হাজার। এতদিনে যা উঠেছি আজ সাত মাইল পথে তারও বেশি উঠতে হবে। কেবলই চড়াই। জ্ঞান মহারাজ বলেছিলেন, 'হেঁটে যাচ্ছেন উত্তম কথা, তবে ত্রিযুগীর চড়াইটা পারবেন না, বড়ো খাড়াই। ওটুকু উঠতে ঘোড়া নিয়ে নেবেন। নীচের চটিতেই পাবেন। আর গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারে যেতে ঘোড়া ছাড়া কখনো সাহস করবেন না। প্রাণ বেরিয়ে যাবে, মহাকষ্ট।'

বড়দি বললেন, 'ঠাকুরের নাম নিয়ে ত্রিযুগী যখন উঠে গেছি, কেদারেও উঠতে পারব তাঁর দয়ায়।'

ফোঁটা-ফোঁটা নয়, কুয়াশার মতো ঝুরঝুরে বৃষ্টি, খানিক দাঁড়ালেই গা কাপড় ভিজে যায়। বর্ষাতি গায়ে দিয়ে নিলাম সবাই, তার নীচে কোমরে জড়িয়েছি গরম চাদর আঁটসাঁট করে; চড়াই ভাঙতে মজবুত লাগে নিজেকে। মাথায় সোলার, আর প্ল্যাস্টিকের টুপি; কাঁধের ঝোলাতে বইখাতা বাদ দিয়ে কেবল নিয়েছি চুইংগাম, লজেন্স, লবঙ্গ, মিশ্রি। হাতে মোটা বেতের লাঠি। শুরু করলাম চলতে।

নিরু বললে, 'মনে বেশ আহ্লাদ আসছে, আজ পৌঁছুব কেদারনাথে; এ কয়দিন চলেছি— যা দেখেছি দু হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি— যেন দেখবার জিনিস এ নয়, আছে সামনে। মনকে সেই কেদারনাথে রেখে পথ বেয়েছি। কোথায়ও একটুক্ষণ বেশি থাকা হলে অস্বস্তি জেগেছে যে, দেরি হয়ে গেল পৌঁছুতে। আজ স্থির জানি, গন্তব্যস্থানে পৌঁছুব ঠিকই, ভাবতেও বড়ো তৃপ্তি।'

গৌরীকুণ্ড থেকে এক মাইলেরও কিছু বেশি সোজা চড়াই। তারপর খানিকটা পথ মোটামুটি চলনসই। পথের মধ্যে 'চীরবাসা ভৈরব'। ইনি নাকি এখানকার ক্ষেত্রপাল। এঁর পূজা করে এঁকে বস্ত্র দিয়ে তবে আদেশ মেলে কেদারে যাবার। একটা গাছের নীচে খানকয়েক পাথর সাজানো খুপরির মধ্যে ভৈরবনাথ। গাছের ডালে অসংখ্য কাপড়ের টুকরো বাঁধা। সঙ্গে বস্ত্র না থাকলে বস্ত্রের জন্য টাকা দিলেও চলে।

বড়দি পূজারীকে খুশি করে বললেন, দর্শন ভালোয় ভালোয় ঘটলে যাবার পথে তাঁকেও বস্ত্র দিয়ে যাবেন।

তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠেছিল। নিরু গণ্ডূষ ভরে ভরে ভৈরবনাথের চরণামৃত পান করল। বললে, 'জল তো বটে ? গলাটা ভিজল।' গাছের ছায়ায় বসল ও খানিক। বললে, 'হল খানিক জিরোনো— এবার চল, কতকটা পথ অনায়াসে চলতে পারব।'

এবার আবার খাড়াই। পাণ্ডা উৎসাহ দেয়, 'চল চল, থেমো না, এ তো সুন্দর পথ, আরো উপরে উঠে তবে আসল চড়াই পাবে।' পাণ্ডা হাসে আর তরতর করে পথ চলে। বলে, 'সামনেই চটি— সেখানে গিয়ে চা পি লেও, দুধ পি লেও— মজে মে চল।'

অতি কষ্টে মঙ্গলচটি অবধি এসে আর পারেন না বগলাদিদি। পথের মধ্যেই দু পা ছড়িয়ে বসে পড়ে কাঁদেন আর পাণ্ডাকে বলেন, 'তুমি তো বাবা চা পিলোলে, দুধ পিলোলে, কিন্তু পা দুটো যে আর চলে না কিছুতে, তার কি করব বল ? অ্যাঁ ?'

দু একখানা ঘর আর দোকান নিয়ে মঙ্গলচটি। যেতে আসতে দিনের কয়েক মুহূর্তের বিশ্রামের জন্য কেবল প্রয়োজন এর। বড় একটা কেউ রাত্রিবাস করে না এখানে। বাদাম ভাজা, পেঁঢ়া, চা, দুধ, ছোলা— এই-ই দোকানের সম্বল। বাদাম ভাজা খেতে খেতে চা তৈরী হয়। বগলাদিদি গরম দুধ খান। নিরু ছেঁড়া চাটাইতে শুয়ে পড়েছিল দোকানীর দাওয়ায় পিঠটান করে। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে দু হাতে কোমর চেপে ধরে। বলে, 'বাকী পথটা যাব কি করে ?'

নীচে থেকে সাদা মেঘের ঘন কুয়াশা উঠে এসে ঢেকে ফেলল দিগ্বিদিক। নিরু কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ল। কাউকে কিছু না বলে আপন মনে কুয়াশা ঠেলে একা একা এগিয়ে চলে গেল।

এমন কুয়াশা আগে কখনো দেখিনি। বিদেশের কুয়াশার কথা শুনি— সে বুঝি এমনিই। দু হাত চারহাত দূরের লোক দেখা যায় না। আকাশ, পাহাড়, গাছ ফুল সব যেন এক আবরণে ঢেকে দিয়েছে কেউ। কেবল পায়ে পায়ে চলার পথটুকু মাড়িয়ে চলেছি, বাঁক ঘুরছি, নীচে নামছি, উপরে উঠছি। পথের পরিষ্কার নিশানা, আশঙ্কা নেই তাই। চলা মানেই এগিয়ে যাওয়া। কয়েক পা তফাত হলেই একে অন্যের সঙ্গ হারিয়ে ফেলছি।

পাহাড়ি পথে দু পা ফেলতে না ফেলতে সর্বশরীর গরম হয়ে ওঠে। সেই

গরম গায়ে গরম মুখে ঠাণ্ডা কুয়াশা লেগে জল হয়ে গড়াতে লাগল কপাল, ভুরু, চোখের পাতা আর দু গাল বেয়ে। বিপরীতগামী কুয়াশা ভেদ করে চলেছি, যেন জোর জেদাজেদি চলেছে দু পক্ষ থেকে।

মঙ্গলচটি থেকে পাণ্ডা এগিয়ে এসেছিল, বলেছিল, 'আমি আগে চলে যাই রামবাড়াচটিতে, গিয়ে কিছু আলু সিদ্ধ করে ঘিয়ে ভেজে তৈরী করে রাখি; এক পোয়া দেড় পোয়া খাঁটি ঘি ঢেলে করব— যত ঘি খাবে তত শরীরে তাকত হবে। সেখান থেকে আলু আর চা খেয়ে আবার পাহাড় চড়তে ফুর্তি লাগবে।'

রামবাড়া এসে দেখি নিরু আর পাণ্ডা লেগে গেছে সিদ্ধ আলু ছাড়াতে। পাণ্ডা অনেক আগেই এসে পৌঁছেছিল, নিরু বললে, 'আমি এইমাত্র এলাম। বেশ লাগল একা একা আসতে। বুকে আমারই কষ্ট হয় বেশি পাহাড় ভাঙতে — ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু কুয়াশাটা পাওয়াতে বোধ হয় সাহায্য হল; নিঃশ্বাসে তত কষ্ট লাগল না।'

পাণ্ডা বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতো ঠিক কথা। ওতে অক্সিজেন ভরা ছিল— কপাল ভালো, তাই এ পর্যন্ত একরকম আরামেই এলে তোমরা।'

গৌরীকুণ্ড থেকে যখন রওনা দিই, ভেবেছিলাম সাত মাইল পথ, দুপুরের আগেই পার হয়ে যাব। দাদার ঘড়িতে সময় দেখলাম দুটো পঞ্চাশ মিনিট এখন। বড়দি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাড়া লাগালেন, 'আর দেরি করো না— উঠে পড় শিগগির।'

রামবাড়াও ছোট্টো চটি, তবে মঙ্গলচটির চেয়ে বড়ো। থাকবার দু তিন খানা বড়ো চালাঘর। যাত্রীরা অনেক সময়ে এখানে এসে রাত্রিবাস করে, ভোরে উঠে বাকী পথটুকু পার হয়। লেপ কম্বলের ব্যবস্থা আছে। কার্পেটও আছে ছোটো ছোটো দু চারটে। তেমন তেমন যাত্রীদের দেওয়া হয় ব্যবহার করতে।

মেঝে থেকেই উঠেছে ছোটো ছোটো জানালা। নিরু তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়েছিল জানালা-ঘেঁষা ছোটো কার্পেটখানার উপর। বলছিল, 'শুয়ে শুয়ে এমনিতরো বাইরেটা দেখতে আমার কী যে ভালো লাগে।' বড়দি এসে আগে তাকেই হাত ধরে টেনে তুললেন। বললেন, 'এই নাও তোমার থলি টুপি জুতো, পরে তৈরী হও।'

নিরুকে সামলানো বড়দির এক বিশেষ কাজ। যখন-তখন বসে, যেখানে সেখানে গড়ায়, যা মনে আসে বলে, স্থান-অস্থানের পার্থক্য বোঝে না। বড়দির ঢালা স্নেহে আব্দারে নিরু জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বকবক্ করে চলে, 'কোথায় এখানে খাবে, থাকবে, আরাম করে ঘুমুবে, ভোরে "বাবা কেদার" "বাবা কেদার" করে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়বে, কেদারনাথ সামনা-সামনি চক্ষু-লজ্জায়ও মনের খুশি না দেখিয়ে পারবেন না। তা নয়, রাত-বিরেতে কে কাকে দেখে, অন্ধকারে এ ওর ঘাড়ে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়বে তাঁর দোরে। যেমন তোমরা, তেমনই তোমাদের ব্যবস্থা।'

বড়দি শুনেও শোনেন না, গলার রুদ্রাক্ষ হাতে নিয়ে চোখ বুজে মালা ঘুরিয়ে যান।

কুয়াশা কেটে গেছে, এবার ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি। পথের দুপাশে পাহাড়ের গায়ে হরেক রকমের ফুল। ডানদিকে মন্দাকিনীর খদ, তার ওপারে পাহাড়ের সারি, যেন দু হাত বাড়িয়ে তার ভিতর দিয়ে পথ কেটে কে আদরে আহ্বান করছে! ওপারের পাহাড়ের গায়ে থেকে-থেকেই যেন গুহার মতো ছোটো ছোটো কাল গহ্বর, দূর থেকে দেখা যায়। দুর্গম পথ, বনে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়, কেউ যেতে পারে কিনা সন্দেহ। নিরু বললে, 'কি জানি, সাধু মহাত্মাদের ব্যাপার, হয়তো ঐ গুহাগুলির কয়েকটার মধ্যে এখনো কেউ বসে তপস্যা করছেন। অবিশ্বাসের কি?'

যাত্রীরা নেমে আসছে দর্শন সেরে; যেন বানের বেগে ছুটে চলেছে। নিরু জিজ্ঞেস করে, 'আর কতদূর মাঈজী?' আনন্দভরা মুখে প্রসন্ন হাসি হেসে সাহস দেয় তারা, 'বেশি না— এই তো এসে গেলে, আর একটুখানি পথ বাকী।'

আশায় বুক বেঁধে পথটুকু পার হতে যাই। আবার একদল নামে। শুধোয় নিরু, 'আর কতদূর মাঈ?' সেই হাসি হেসে মাঈ বলে, 'এইতো এসে গিয়েছে, আর একটুখানি ধৈর্য ধর।'

খিলখিল হাসিতে নীচের দিকে তাকাই। ছোট্টো ক্ষেতটিতে দানা তুলছে দুটি মেয়ে। কি রসিকতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে কি জানি! এই সময়টায় ফসল ফলিয়ে ঘরে তুলতে উটকো বাসা বেঁধেছে এখানে এসে দু দিনের জন্য।

কাঠুরেদের ঘরও আছে কয়েকটা আশে পাশে, ডাল পালার বেড়া দিয়ে

ঘেরা, বড়ো বড়ো পাথরের চাবড়ার নীচে। এখান থেকে কাঠ কেটে নিয়ে যায় কেদারনাথে। কম কাঠের তো দরকার হয় না সেখানে।

বড়ো একটা ঝরনা পড়ে পথে। কাছে আসবার অনেক আগে থেকেই উগ্র গন্ধ এসে লাগছিল নাকে। কিসের গন্ধ, কিসের গন্ধ, চেনা জানা বড়ো। নিরু নিঃশ্বাস টানে আর ফেলে।

পাণ্ডা বললে, 'এ হচ্ছে গন্ধকের ঝরনা।'

ঠিক ঠিক, তারই উৎকট গন্ধ। পাহাড় থেকে ঝরনা নেমে পথ সাপ্‌টে নিয়ে নীচে গিয়ে পড়েছে। ছোট্টো পুল পেরিয়ে সেটুকু পথ পার হই। পাথরে পাথরে ধাক্কা খাওয়া ঝরনার ঝঙ্কার ছাপিয়ে একটা মিষ্টি মধুর মিহি ডাক কানে আসছে থেকে থেকে। এদিক ওদিক তাকাই। পুলের নীচে কালো বড়ো পাথরটায় ছোট্টো একটি পাখি। বার্ন্‌ট্‌ সিয়েনা বুকের রং, কালো ডানা, কালো লেজের ডগা, কালো মাথা। মাথার উপরে সাদা তিলক, যেন সাদা একটা টুপি বসানো, স্বদেশী নেতাদের মতো। পাখিটি ডাকতে ডাকতে ঝরনার ফাঁকে ফাঁকে জেগে থাকা কালো পাথর কয়টাতে যেন নেচে নেচে বসতে লাগল। এতক্ষণ পাখি তেমন চোখে পড়েনি, হয়তো বা খেয়াল করিনি। তাও ঠিক নয়, খেয়াল ছিল, তারাই দেখা দেয়নি। একটানা চলেছি পথ ধরে, পথের কাছে তারা এলে তবে তো তাদের দেখব। এখন আর এক রকম পাখি দেখলাম, এও ছোট্টো নীলপাখি, ডানাতে ইনডিগোর শেড, বুকে আকাশ-নীল, ভারী সুন্দর।

নীরু বললে, 'ঐ শোন, পাণ্ডা কেমন বড়দিকে বোঝাচ্ছে, "সংসার মে খানা আর দেনা, আউর কেয়া?" মানে সংসারে খাও আর দাও, এবং দানের পাত্রটি যে সে নিজে, বেশ ভালো করে সেটি সিঁধিয়ে দিচ্ছে বড়দির মনে।'

সেই পুরনো গাড়োয়ালী দল নেমে এলো। নিরু খুঁজে ফেরে তার সেই সাথীকে। হয়তো তারা আগেই ফিরে গেছে। কোন্ চটিতে ঘুমিয়েছিলাম, ঘুমের মধ্যে পাশে কে এল কে উঠে গেল কেই বা দেখেছে তা।

দু জন প্রৌঢ়া নিরুর কাঁধ ধরে খল্‌বল্‌ করে কি সব বলে গেল। হাসি-খুশিতে যেন ঝরনা ঝরছে; বাবার দর্শন মিলেছে, পুজো দিয়েছে, এবার ফিরে চলেছে ঘরে। বাবা টানলে আবার আসবে সামনের বছরে। ভাবে ভঙ্গিতে কথা, ভাবেই জানায় 'ওঠো ওঠো, আর একটু ওঠো— এই তো এসে গিয়েছ—

বাবাকে ডাকতে ডাকতে চলে যাও'। দু হাত ঘাড়ের উপরে তুলে পিছন দিকে এগিয়ে যেতে জানিয়ে তারা নীচে নেমে যায়।

নিরু বললে, 'সেই তখন থেকে যারা যাচ্ছে সবাই বলে যাচ্ছে, এই তো এসে গেছ— আর একটু গেলেই পেয়ে যাবে। একটু আগে ঐ পাঞ্জাবি ভদ্রলোকও বলে গেলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "ভাইজী আর কয়টা বাঁক বাকী?" খুব হেসে নিশ্চিত ভাবে বলে গেলেন, "আর মাত্র দুটো বাঁক বাকী, এসেই তো গেছ।" তারপর তো কত বাঁক ঘুরলাম। এ কী আশ্বাস দিতে লেগেছে সকলে মিলে? যেন অবুঝকে বুঝ দিয়ে চলেছে।'

বড়দি বললেন, 'কত সুন্দর মন তাদের তাই দেখ। উঠতে যে কত কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছে সবাই, দু একদিন আগে তারাও তো উঠেছে। আশায় আশায় কি না করা যায়? সেই আশা দিয়েই তো তারা আমাদের এতখানি তুলে দিল। নয় তো যদি বলতো যে এখনও সিকি পথ আসনি বা অর্ধেক আসনি— ভেঙে পড়তে না বুঝি হতাশায়? এ হল কায়িক তপস্যা। এ-কষ্টটুকু পাওয়া দরকার।'

বাঁকে বাঁকে উঠছিই। পায়ের পাতা উঁচু তালে ফেলতে ফেলতে পা দুমড়ে এল। আর চলে না। কাঁধের থলি আগেই তুলে দিয়েছিলাম মনবাহাদুরের পিঠে। এখন শাড়ির আঁচলটাও প্রচণ্ড ভার মনে হচ্ছে যেন। ইচ্ছে যায় ফেলে দি তা ঘাড় থেকে। চুইংগাম, লজেন্স চিবিয়েও রস জমে না জিবে; শুকনো জিব কেবলই শুকিয়ে আসে। এগুতে মিনিট তিনেক লাগে। পাঁচ পা এগিয়ে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়াই। সাত মিনিট বিশ্রাম নিই।

মেজদির মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁট নীলবর্ণ। নিরু তাঁর দিকে তাকায়, তিনি নিরুর দিকে তাকান, নিরুর মুখেরও ঐ এক অবস্থা।

গলা শুকিয়ে গেল, মুখ শুকিয়ে উঠলো, ঠোঁট শুকিয়ে এল। নিরু বললে, 'একটু জল খাব।' খাবার জল নেই এ পথে। গৌরীকুণ্ড থেকে সমানে বর্ষা পেয়ে আসছি। শরীরের তাপ ভেজা বর্ষাতির ঠাণ্ডা গায়ে ধাক্কা খেয়ে জল হয়ে গায়েই গড়াচ্ছে, বেশ টের পাচ্ছি। জামা কাপড় ঘামের জলে ভিজে জবজবে। প্লাস্টিকের বর্ষাতির ভিতর দিয়ে হাওয়া ঢোকে না, তাই রক্ষা। বর্ষাতির গায়ে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জল; নিরু হাতটা মুখের কাছে তুলে বর্ষাতির জলটা ঠোঁটের উপর ঘষতে লাগলো বারে বারে।

বেলা শেষ। বড়দি এগিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে আসেন, নিরু যে পিছনে একলা পড়ে আছে। আবার তার সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে চলেন। অথচ বড়দির জন্যই আমাদের ভাবনা ছিল সকলের। শোকে দগ্ধ শরীরকে লাঞ্ছনা দিয়েছেন তিনি বহুতরো ভাবে। সেই ক্ষীণ শরীরে এমন শক্তি পেলেন কোথা থেকে? বড়দি হাত বাড়িয়ে দেন, বলেন নিরুকে, 'না হয় আমার উপর একটু ভর দিয়েই চল, অন্ধকার ঘনাবার আগে গিয়ে না পৌছুলে—অজানা পথ ঘাট।'

করুণ মুখ তুলে তাকায় নিরু। বলে, 'এই আর দুটো নিঃশ্বাস টেনে বুক ভরে নিই, তারপর আপনিই পা ফেলব, তোমায় ধরতে হবে না বড়দি।'

ওপারের পাহাড়ের মাথার সারিগুলি হঠাৎ কেমন সোজা হয়ে চলে গেছে। যেন কেউ উপরে রাস্তা কেটে রেখেছে। নিরু বললে, 'ঐ দেখ— শিব পার্বতীর বেড়াবার পথ। সকালে বিকেলে দু জনে হাত ধরাধরি করে বেড়ান তাঁরা ঐ পথে। প্রথম আলো, শেষ আলো পথ ধুয়ে দিয়ে যায় দু বেলা। দেখলে না একটু আগে অস্তরবি কেমন করে ধুয়ে দিল পথ, মোটা পাইপের মুখে আলোর ফোয়ারা তুলে?'

বড়দির মনে আতঙ্ক, রাত এগিয়ে এল বলে। নিরুর মুখ চেয়ে বলতেও পারছেন না কিছু। কেবল ভিতরে ভিতরে ছটফট করছেন কি ভাবে কোন সাহায্যে লাগবেন তার, যাতে করে শেষের পথটুকু শেষ হয়।

একমনে চলতে চলতে দাদা এগিয়ে গেছেন অনেকখানি। বড়দি তাকিয়ে থাকেন। বহুদূরে দাদার কাঁধে ফেলা ছাতার কালো ডাঁটটা মিলিয়ে যায় চোখের আড়াল হয়ে। ব্রজরমণ, মেজদি, বগলাদিদি, মনবাহাদুররাও পার হয়ে গেল এক এক করে।

হঠাৎ বরফের রাজ্য থেকে মেঘের আবরণ ভেদ করে মন্দিরের ধূসর চূড়া একটি দেখা গেল। ঐ তবে কেদারনাথ। দেখা যখন দিয়েছে, তাহলে এসে গেছি কাছে। দীপ্তি ফোটে নিরুর চোখে। বড়দির ঠোঁট কেঁপে ওঠে, পলকবিহীন নেত্রে স্থির তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানান চিরমঙ্গলময় মহেশ্বরকে। বললেন, 'আর আমার ভাবনা নেই। তোমার দাদা এতক্ষণে পৌছে গেছেন সেখানে, তাঁর আশা পূর্ণ হয়েছে। এখন চল, ধীরে ধীরেই এগোই আমরা।'

কাঠুরে কাঠের বোঝা নিয়ে আসছিল পিছনে ; পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে উপুড় হয়ে চলতে চলতে মেঘের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দূরে মেঘে ছাওয়া কেদারনাথের মন্দিরের আশেপাশে হাল্‌কা কালিতে আঁকা বাড়ি-ঘরের চাল দু চারটে ফুটে উঠতে লাগলো। এখান থেকে মাইল খানেক অবধি ঢালা সমান রাস্তা। যেন বাঁধানো রাজপথ। এই পথটুকু অতি যত্নে পাথর ফেলে ফেলে তৈরী করা হয়েছে। এ পাহাড়ে আর গাছপালা নেই ; খোলা, নেড়া গা। মাঝে মাঝে কেবল ছোট্টো ছোট্টো ঘাসের চাপড়া।

মন্দাকিনী মাটিতে নেমেছে এইখানে।

পুল পেরিয়ে ওপারে কেদারনাথ। ওপারে গিয়ে হাত পঞ্চাশেক উঁচু জায়গা উঠলেই পাণ্ডার ঘর। শেষ নিঃশ্বাসটুকু যেন ক্ষয় হল এবারে, আর চলবার শক্তি নেই। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নিরু। জলপা সিং দৌড়ে এসে সব ভার নিজের উপরে নিয়ে টানতে টানতে তুলে আনলো তাকে পাণ্ডার ঘরে।

দোতলা ঘর ; গরম কার্পেট বিছিয়ে একরাশ লেপ এনে, আংটায় আগুন জ্বালিয়ে পাণ্ডা তৈরীই ছিল। দাদা দুটো লেপ নীচে বিছিয়ে দুটো লেপ গায়ে দেবার ব্যবস্থা রেখে সকলের বিছানা পাতাচ্ছিলেন। নিরু ঢুকে তারই একটাতে সটান সোজা পড়ে গেল। বড়দি তাড়াতাড়ি লেপ চাপিয়ে দিয়ে দিলেন তার উপরে।

ধুলো-পায়ে কেদার দর্শন করার শখ ছিল বড়দির। রাত হয়ে গেছে। দাদা বললেন, 'কেদারে যখন এসে গেছি, নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। কাল ভোরেই দর্শন করব তাঁকে। আজ সকলের শরীরেরই যা অবস্থা, যে যার শুয়ে পড়ে ক্লান্তি দূর কর আগে।'

সত্যিই নড়বার আর ক্ষমতা তেমন নেই কারুরই। সেই সকাল নটায় রওনা হয়েছি, রাত এখন সাতটা। পুরো দশ ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজেছি। চলার বেগে শরীর গরম ছিল এতক্ষণ। এখন থামতেই হাড়কাঁপুনী শীতে জ্বালা ধরল। আংটার আগুনে ঠাণ্ডা হাত দুটো কোনোমতে একটু সেঁকে পাণ্ডার দেওয়া লেপের গদিতে শুয়ে সেই গদিরই দুটো চারটে গায়ে ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। জানি কাল ভোরে প্রথম কথাই বলবে নিরু, 'কতজনার গায়ে দেওয়া তেলচিটে বোঁটকা গন্ধওয়ালা লেপ যে এত আদরের বস্তু হয়ে উঠতে পারে কে জানতো তা আগে ?'

পাণ্ডা মহাদেব প্রসাদের আদর যত্নের ত্রুটি নেই। গরম চা, থালাভরা বড়া হালুয়া নিয়ে এলেন রাত্রের মতো খেয়ে নিতে। বড়দি ডাকেন, কিন্তু খাবার উৎসাহ নেই কারুর। বড়দি কাকুতি করেন, 'একটু মুখে দাও, নয় তো খারাপ দেখায়, এত যত্ন করে আনল ভদ্রলোক।' লেপের নীচ থেকেই হাত বাড়িয়ে একটা বড়া তুলে মুখে পুরি। খাবার থালা, চায়ের গ্লাশ সরিয়ে বাতি নিবিয়ে বড়দি পাশে শুয়ে পড়লেন। নিরু একবার কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলে মাথার উপরকার পায়রার খোপের মতো জানালার পাটটা খুলে দেখে নিল মন্দিরটি এখান থেকে দেখা যায় কিনা। দেখল, তা যায়।

ঘুম ভেঙে উঠেই নিরু নেমে গেল নীচে। বলে গেল বড়দিকে, 'পূজা দর্শনাদি সময়-সুবিধেমতো যা করবার তোমরা করে নিও, আমার জন্য অপেক্ষা করো না, বা উতলা হয়ো না। আমাকে একলা ছেড়ে দাও, আমি ইচ্ছে-মতো ঘুরে বেড়াব।'

পাণ্ডা বলেছেন, ভোরে ঠিক সময়মতো এসে তিনি আমাদের নিয়ে বের হবেন। তাঁর আসা না পর্যন্ত লেপ ছেড়ে উঠতে মন চায় না। সামনের ঘরে শুয়ে আছে মনবাহাদুর, জল্‌পা সিংরা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় লম্বা লম্বা দেহ, পা থেকে মাথা অবধি রেজাই দিয়ে ঢাকা। পাণ্ডার দেওয়া আমাদেরই বাড়তি রেজাইগুলি থেকে তাদেরও চার পাঁচ খানা দেওয়া হয়েছে। ছোটো বড়ো পাণ্ডার আশ্রিত সবাই সমানভাবে ব্যবহার করে লেপ কম্বল। এইজন্যই বোধহয় সব রেজাইগুলি এত তেল চিটচিটে।

এক কোনায় বগলাদিদি তাঁর পোঁটলা পুঁটলি খুলে বসেছেন। চিঁড়ের পোঁটলা, গুড়ের কৌটা, আতপ চালের থলি, দানের গেলাস ঘটি, ভুজ্যির থালা, পাণ্ডাঠাকুরের ধুতি চাদর, শাখা সিঁদুর, গীতা, বেলপাতা, তুলসীপাতা, কেদার-নাথের জন্য রুপোর ছোট্টো ধুতুরা ফুল, ব্রহ্মকপালীতে ফেলতে শ্বশুরের অস্থিভস্ম, মন্দাকিনীতে ফেলতে ঠাকুরদাদার মাড়ির দাঁত, কিছুই বাদ নেই। এক একটা মোড়ক খোলেন আর আলাদা করে রাখেন; একভাগ বদরীনারায়ণের আর এক ভাগ কেদারনাথের।

মেজদি বললেন, 'এই না জ্ঞানমহারাজ আসবার আগে আজে বাজে

সব জিনিস কেড়ে রেখে দিলেন, তবু এতসব আনলো কোন্ ফাঁকে? ঐ ছোট্টো খাকির থলিতে আঁটলোই বা কেমন করে?'

সারা পথ ওটি হাতছাড়া করেননি বগলাদিদি; ছেলে কোলে করার মতো কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে এসেছেন। জ্ঞানমহারাজ রেখে দিয়েছিলেন অবশ্যি অনেককিছু, বলেছিলেন, 'বগলা, পথে খেতে খাবার জিনিসের অভাব তোমার হবে না কোনো। কেন মিছে এই ছাইপাঁশ ব'য়ে নিয়ে যাবে— কুলিকে পয়সা খাওয়াবে, হাল্কা হয়ে যাও।' পরে তিনি হেসে নিরুকে বলেছিলেন, 'কেড়ে তো রাখলাম, দেখবেন আমিও পিছন ফিরব আর বগলাও সব জিনিস ফিরে থলিতে পুরবে। এক মুঠো ছাতুও ফেলে রেখে যাবে না।' গোটা পথের চাল সঙ্গে এনেছিলেন বগলাদিদি; নিজ ক্ষেতের। মাত্র সেইটে শেষে সকলের আপত্তিতে রেখে আসতে বাধ্য হলেন।

বগলাদিদি ছাতু আর গুড় আলাদা বাটিতে জলে ভিজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'ও বাবু, আজ একাদশী, আমি নিজের ছাতু গুড় খাবো; আমার খাইখরচ আজ হিসাব থেকে বাদ দিও। আর গৌরীকুণ্ডে আমি মাত্র একটা প্যাঁড়া খেয়েছি, ওরা দুটো দুটো খেয়েছে, ভুল করো না আমার নামে বেশি লিখে।'

'ওরা' মানে নিরু। নিরুর দিকেই বগলাদিদির লক্ষ্য বেশি।

বগলাদিদির রাস্তা খরচের টাকা জ্ঞানমহারাজ দাদার হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'ওর জন্য যা খরচ হবে আপনিই করবেন এ থেকে।'

দাদা চোখ বুজে পরমেশ্বরের স্মরণ নিয়ে বালিশ থেকে মাথা তুলছিলেন; 'হুঁ হুঁ' করে সাড়া দিয়ে লেপ সরিয়ে উঠে বসলেন।

পাণ্ডা আসতে তাঁর সঙ্গে দোতলা থেকে নীচে নামলাম সকলে। চারিদিকে বরফের চূড়া, যেন হাতের নাগালে সব। ঘিরে আছে এমন ভাবে, যেন দুর্গে এসে ঢুকেছি আমরা। চলতে চলতে এতখানি পথ পেরিয়ে এসে যেন পথের শেষ হয়েছে এইখানে।

ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে, পাথরে বাঁধানো পথ, আঙিনা; জল জমে ছল-ছল করছে। বর্ষাতি, ছাতা, টুপিতে নিজেদের ঢেকে ছপ্ছপ্ করে চলেছি তার উপর দিয়ে। পাণ্ডা বললে, এমন কখনও হয়নি— আজ বারো চোদ্দ দিন ধরে অনবরত বৃষ্টি, লোকেদের বড়ো কষ্ট হচ্ছে। এসময় বৃষ্টি হবার কথাই

নয়। শীতের দেশ, বরফের মাঝখানে বাস, এই রকম আর কয়দিন চললে নেমে যেতে হবে সবাইকে মন্দির বন্ধ করে।

যেদিকে তাকাই চারিদিকে শুভ্র তুহিন শিখর। স্তরে স্তরে মেঘ, তারি ফাঁকে বরফের চূড়া এখানে ওখানে এদিকে সেদিকে। মনে হয় ঐ-ই বুঝি সর্বোচ্চ শিখর, তার উপরে আর নেই। তখুনি সেখানকার মেঘটা সরে যায়, আরো উপরে বরফের সারি দেখা দেয়। যেন জাত্নুর দেশ, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি আর খুঁজে খুঁজে বেড়াই। এই দেখা দেয়, এই নেই; এই একটু হাসে, এই মুখ ঢাকে।

গোল হয়ে ঘিরে আছে তারা। যেন, আর এগোবার নিশানা নেই। এতদিনের দুরূহ পথ অতিক্রম করার পর যেন নিশ্চিত আশ্রয়ের দুর্গ মিলল একটি।

এই বরফের পাহাড় ঘেরা তল্লাটের কোল ঘেঁষা বেশ খানিকটা সমতল ভূমি, মন্দির, মন্দিরের সামনে দোকান, ঘর, যাত্রীর আবাস; ছোটোখাটো জনবসতি। পাণ্ডা বললে, এইরকম স্থানে এতখানি জমি পাওয়া, কেদারনাথের ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়।

মন্দিরের দরজা খোলা হতে এখনো খানিক দেরি। পাণ্ডা বললে, 'এখানে এক ফলাহারী বাবা আছেন, চল ততক্ষণ তাঁর কুঠরিতে গিয়ে বসি।'

মন্দিরের পাশেই ছোট্টো ছোট্টো খান কয়েক কুঠরি, সাধুসন্তরা এসে থাকেন এখানে। ছোট্টো দরজা, মাথা নিচু করে ঘাড় গুঁজে ঢুকতে হয় ভিতরে। জুতো ছাতা বাইরে বৃষ্টিতেই ফেলে রেখে ঢুকলাম ভিতরে। ধুনি জ্বলছে; ধুনির ধোঁয়ায় অস্পষ্ট আলোয় অন্ধকার খুপরিতে ঢুকে ঠেসেঠুসে বসি। দেখি নিরু এসে আগে হতেই ফলাহারী বাবার পাশ ঘেঁষে জাঁকিয়ে বসে আছে। কালো রঙের মানুষটি; ছোট্টো ছোট্টো পাকা চুল দাড়িতে মাথা মুখখানা। কম্বলে গা ঢেকে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন দরজার পাশের কোণটাতে।

নিরু এরই মধ্যে ভাব জমিয়ে ফেলেছে তাঁর সঙ্গে। বললে, 'জানো, এঁর বয়স সত্তরের উপরে। আঠারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। বারো বছর কেবল ফল খেয়ে ছিলেন, তারপর প্রদোষব্রত আরম্ভ করেন— একদিন ফলাহার ও একদিন নিরম্বু উপবাস। তাতেও বারো বছর কাটে। পরের বারো বছর আরো কঠিন ব্রতাচারণ করেন। কেবলমাত্র বায়ুসেবন করেও

কিছুকাল থাকেন। এখন শুধু ফলাহার করেন। দেখলাম, একটু আগে একটি লোক, ভক্ত হবে বোধ হয়, ঘটিতে করে দেড়পোয়া দুধ, একটা রুটি আর একটা আলুসেদ্ধ দিয়ে গেল। তাই খেলেন। বললেন, "এখানে ফল তো পাওয়া যায় না, তাই কোটোর দানার রুটি খাই। কোটোর দানাকে ফল বলা যেতে পারে। আর আলুও মূল বিশেষ, তাই তা খেতে বাধা নেই।" ঐ সকালে একবারই যা খান। সারাদিন আর কিছু না— কেবল একটু চা ছাড়া। শীতের দেশ, ওটা না খেলে চলে না।'

নিরু বলে চলেছে, ফলাহারী বাবা নিমীলিত নেত্রে মুখ নিচু করে মিটি-মিটি হাসছেন।

পাণ্ডা ইশারা করলে, চল এবার যাই, মন্দিরদ্বার খুলবার সময় হল।

মন্দিরটি বেশ উঁচু, ওড়িশ্যার মন্দিরের মতন সরু হয়ে উঠেছে আকাশে। মেঘে হিমে, বরফে ঢাকা সাদা পর্দার গায়ে কালো পাথরের মন্দিরটি যেন এক শক্তিশালী দৃঢ়তা। উঁচু চত্বর, গোটা দশেক সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম উপরে। বড়ো বড়ো পাথরের চাপ বাঁধানো খোলা চত্বর মন্দির ঘিরে।

নিরু বসে পড়ল মন্দিরের দেয়ালে পিঠ ঠেশ দিয়ে। বললে, 'কি জানি কেবলই মনে হচ্ছে— সেই কত জন্ম আগে আমি এখানে বসে গান গেয়েছি আপন মনে তানপুরা হাতে নিয়ে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। সেই ছিল আমার তপস্যা।'

কেদারনাথের উচ্চতা ১১৭৫০ ফিট। মন্দিরের দ্বারের সামনে বাইরে বিরাট এক বৃষমূর্তি, পাথরের। বিষ্ণুর যেমন গরুড়, শিবেরও বৃষ নইলে চলে না। যেখানে শিব সেখানেই বৃষ। মন্দিরমুখী হাঁটু মুড়ে বসা বৃষকে প্রদক্ষিণ করেন বড়দি। দ্বার খোলে পূজারী। জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রীরা ঢোকে ভিতরে। প্রথমে নাট মন্দির, থেকে থেকে পাথরের থাম। মন্দিরগাত্রে পাথরের মূর্তি, কারুকাজ। অন্ধকারে দেখা যায় না সব ভালো করে। শীতে সকলের পা অসাড়। আংটায় আগুন জ্বালিয়ে কম্বল মুড়ে বসে পূজারী ব্রাহ্মণ কয়েক জন স্তোত্র পাঠ করছেন নাটমন্দিরে। দরজা দিয়ে ঢোকা দিনের আলোটুকু ঢেকে কিলবিল করে যাত্রীর ছায়া। নাটমন্দিরের পরে গর্ভমন্দির, ছোট্টো চৌকো পরিসর, নিচু মেঝে শ্বেত পাথরের। দ্বারে ভিড় জমে লোকের। কতকালের পাথর ঘিয়ে জলে কালিতে শেওলায় কালো পিছল হয়ে

আছে। নকশাকাটা দ্বারের দু দিক। মেঝের মাঝখানে কেদারনাথ— স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গ— পর্বতাকৃতি। যেন ছোট্টো একটি পাহাড়। মানুষের হাতে খোদাই করা নয়, স্বাভাবিক পাথর। ভিতরের কুলুঙ্গিতে প্রদীপ জ্বলছে, তারি আলোতে চিক্‌চিক্ করছে দেয়ালের গা, জলে ভেজা মেঝে, ঘিয়ে মাখা কেদারনাথ।

পাণ্ডা তাড়া দিলে, বললে, 'এই হল আজকের মতো। আজ মন্দিরে ভিড় বেশি, এক রাজাবাবুর দল এসেছে, তারা আজ পুজো দেবে, মন্দির দখল করে রেখেছে তারাই। কাল তোমাদের পুজো হবে। তখন শখ মিটিয়ে দর্শন করো। আজ কেবল হাজিরা দিয়েই চল।'

দর্শন হল; এখন তবে একটু চায়ের ব্যবস্থা দেখা যাক্। পাণ্ডার বাড়ি, যেখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, নাম 'পদ্মাশ্রম'। পদ্মাশ্রমের পাশেই এক দোকান ঘর, বললে পরে চা, পুরি, ফুলুড়ী গরম গরম ভেজে দেয়।

উনুনের পাশে গোল হয়ে বসতে যাব, নিরু বললে, 'দাঁড়াও আমি আসছি।' বলে সে ছুটে গেল ফলাহারী বাবার ঘরে, গিয়ে মুঠো ভরে কি যেন নিয়ে এল। বললে, 'সকালে ফলাহারীবাবাকে যখন খাবার এনে দেয়— ফলাহারীবাবা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "খাবে?" ঘাড় নেড়ে বললাম, "হ্যাঁ খাব।" কতটুকুই বা রুটি, হাতে থেবড়ে থুবড়ে আগুনে ফেলে সেঁকে দিয়েছিল বোধ হয় লোকটা, কিনারটা পুড়ে পুড়ে গেছে, ফলাহারী বাবা তা ভেঙে ভেঙে একটা বাটিতে রাখলেন, বললেন, "এগুলিই খেতে ভালো, মুচ্‌মুচে, আমার তো দাঁত নেই, আজ তুমিই খেয়ো। কেদারনাথ দর্শন কর আগে, পরে নিয়ো।"'

চা খেতে খেতে নিরু বললে, 'জানো বড়দি, আজ যেন কি একটা ব্যাপার হবে। ঠিক বুঝলাম না— হিন্দিতে কথাবার্তা তো? মন্দিরের পূজারী এসে কি যেন জিজ্ঞেস করলেন ফলাহারী বাবাকে, অনুমতি চাইলেন, আরো বললেন, "ভৈরবনাথ কি আসবেন?" ফলাহারী বাবা বললেন, "দেখ চেষ্টা করে— উনকো মর্জি হ্যায়।" কথার ভাবে বুঝলাম ভৈরবনাথ আজ প্রকাশ্যে উদককুণ্ডে স্নান করবেন। পুরীতে যেমন জগন্নাথদেব স্নানযাত্রায় বের হন তেমনি বোধ হয় ভৈরবনাথের বিগ্রহও আজ বের হবে। যাই হোক, একটা বিশেষ ব্যাপার বলে মনে হল। খেয়াল রেখো, দেখতে হবে।'

বলতে না বলতে মন্দিরের ঘণ্টা ঢং ঢং করে বেজে উঠল। পাণ্ডা মন্দিরে গিয়ে আবার ছুটে এল, বললে, 'চল চল ভৈরবনাথের আবির্ভাব হবে। শিগগির চল— দেখবে তো।'

গরম চা ঢোকে ঢোকে গিলে খানিক রেখে খানিক ফেলে হুড়মুড় করে ছুটলাম সেদিকে। কি জানি কি ব্যাপার, দেখতে যদি বাদ পড়ে যাই; ধাক্কাধাক্কি লাগে সকলের। মন্দিরের নাটমন্দিরে তখন ঠাসা ভিড়। ধূপ দীপ ঘণ্টা মন্ত্র— সব মিলিয়ে গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ। গায়ের জোরে ভিড় ঠেলে নিক গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। নাটমন্দিরের মাঝখানে কৃষ্ণের বাহন গরুড়ের প্রস্তরবেদী, তার নীচে বসে আছেন ফলাহারী বাবা চোখ বুজে প্রশান্তমুখে; পাশে একটি যুবক পাহাড়ি একাসনে। তাদের সামনে জন চারেক পূজারী হাত নেড়ে ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি দেখিয়ে মন্ত্র পড়ে চলেছেন, আর যুবক পাহাড়িকে জলের ছিটা দিচ্ছেন। রাজাবাবুর দলও আছেন সামনে। যুবক জোড়াসন করে বসে কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে। ক্রমেই যেন একটা বিচলিত ভাব দেখা দিচ্ছে ভিড়ের মাঝখান হতে। যেন যা আশা করা যাচ্ছে ঠিকমতো হচ্ছে না। পূজারীদের মুখে উদ্বেগের সুস্পষ্ট ছাপ।

যুবক নিরুপায়। ঘন ঘন মন্ত্রোচ্চারণে মন্দিরের অভ্যন্তর কেঁপে কেঁপে উঠল, একজন পূজারী হাঁটু গেড়ে বসে যুবকের কপাল রক্তচন্দনে লেপে দিয়ে আতপ চাল ছড়িয়ে দিল; রক্তচন্দনের লাল ধারা কপাল হতে লাল চোখ বেয়ে গালে গড়িয়ে পড়ল। ছেলেটি কাঁপছে, থরথর করে কাঁপছে, কোলের উপর মুষ্টিবদ্ধ হাত কাঁপছে, গা কাঁপছে, ফর্সা মুখে রক্ত জমেছে, দু চোখ বড়ো হ'তে হ'তে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ঘিয়ের প্রদীপে ঘি ঢেলে দিতে আরও দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো আলো, আরো রক্তচন্দন দিল কপালে, আরো স্বেদস্রোত গড়াল গাল বেয়ে, আরো ঘণ্টা, আরো ধ্বনি, আরো ধূপ আরো ধোঁয়া— ছেলেটা কাঁপতে কাঁপতে অকস্মাৎ হুঙ্কার দিয়ে সামনে রাখা জলভরা ঘটিটা উপুড় হয়ে দাঁতে কামড়ে মুখে তুলে নিল। হৈ হৈ করে উঠল সব জনা— 'জয় জয় ভৈরবনাথ' —আনন্দ ধ্বনিত হল পাথর ফাটিয়ে। পূজারীরা ভৈরবনাথকে তুলে দাঁড় করিয়ে মুহূর্তে বোতাম খুলে কোট সুয়েটার কুর্তা গেঞ্জি পাতলুন জাঙ্গিয়া গা থেকে টেনে ফেলে একটুকুরো হলুদ রেশমী গামছা পরিয়ে কাঁধে চাপিয়ে দৌড়ে নিয়ে গেল উদককুণ্ডে স্নান করাতে। যেন এক টুকরো সোনার খেলনা। এই

দারুণ শীত কত গরম কাপড় কম্বল মুড়েও স্বস্তি পাচ্ছে না লোকে, এমন শীতে খালি গায়ে বরফ জলে ডোবাবে লোকটাকে !

পাণ্ডা বললে, 'এই তো ভৈরবনাথের মাহাত্ম্য। কিছু হয় না তার। উদককুণ্ডে এক ঐ ভৈরবনাথ ছাড়া আর কারো নামবার হুকুম নেই।'

আগ্রহে মুখ বাড়িয়ে আছি। ভৈরবনাথকে স্নান করিয়ে তেমনি কাঁধে করেই নিয়ে এসে ঢুকলো তারা মন্দিরে, কেদারনাথের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে এসে বসলো আবার সে আগের আসনে। এবার সকলে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করতে শুরু করল তাকে। বহু প্রশ্নের শেষে তারা বললে, 'আচ্ছা তুমি যে এসেছ তার প্রমাণ দাও। এই বৃষ্টি বন্ধ কর।'

ভৈরবনাথ বললে, 'কি করে করবো, বড়ো অনাচার।' বলে সামনের থালা থেকে এক মুঠো আতপ তুলে নিয়ে ফলাহারী বাবা ও নিজের মাথায় দিয়ে বললে, 'আচ্ছা, এক ঘণ্টার জন্য বৃষ্টি বন্ধ হবে— একটা থেকে দুটো পর্যন্ত। দেখো— দো ঘণ্টেকে বাদ ক্যা হোতা হৈঁ।'

আবার আনন্দধ্বনি উঠল। এক ব্রাহ্মণ একটা মোটা ঘিয়ে ভেজানো সলতেয় আগুন জ্বালিয়ে ভৈরবনাথের হাতে তুলে দিলেন। ভৈরবনাথ তা নিজের মুখের সামনে আরতির ভঙ্গিতে দু তিনবার ঘুরিয়ে হা করে মুখে পুরে দিতেই হেলে পিছন দিকে পড়ে গেল। ঠকাং করে মাথাটা তার পাথরের বেদীতে ধাক্কা খেল। পূজারীরা তাড়াতাড়ি আবার তাকে ধরে জামা কাপড় পরিয়ে দিতে থাকলো।

মনটা কেমন থমকে গেল। নিরুর মুখে ঘন ছায়া। থমথম করছে ঈশান কোণ যেন জমাট কালো মেঘে। মন্দির হতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এগারটা বেজেছে। হংসকুণ্ডে তর্পণ করবেন দাদা মেজদি। এখানে তর্পণ করলে মৃতের আত্মার মঙ্গল হয়। শ্রেষ্ঠ স্থান। দাদা মেজদি চলে গেলেন সেখানে পাণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে, বড়দি গেলেন 'পদ্মাশ্রমে'; কিছু করবার নেই, বৃষ্টিতে কোথায় বা ঘুরবেন বাইরে। নিরু বললে, 'আমাকে কেউ ডেকো না, ঘরে ঢুকতে পারবো না এখন।'

মন্দির বরাবর পথটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক দোকান-ঘরে গিয়ে নিরু থামলো। দেখল তাকিয়ে, সোজা দেখা যায় মন্দির। বললে দোকানীকে, 'ভাঈজী, বসব এখানে?' দোকানী হাসিতে মুখ ভরিয়ে ছোট্টো একটি

কার্পেট এনে দিল দরজার কাছে। অর্ধেক শরীর ভিতরে ঢুকিয়ে অর্ধেক বাইরে রেখে চৌকাটের উপরে বসে নিরু, মন্দিরের দিকে মুখ করে। বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে বাঁ অঙ্গ তার। বলে, 'ভিজুক, নয় তো মন্দির দেখা হবে না। মন্দির দেখতে দাও আমায়।' বলে, 'কী উদ্ভট কাণ্ড মন্দিরের ভিতরে। কত যুগ ধরে কত সাধক আসছে এখানে উদ্ধার পেতে, কত ঋষির তপস্যা সঞ্চিত আছে এই স্থানে, সেখানে এমন বুজরুকি করে এরা কোন্ সাহসে?'

দিদিমা বলতেন, পুরুতরা কি আর দেবতা জ্ঞানে পুজো করে? করতে হয় তাই 'নমঃ নমঃ' ফুলচন্দন দেয়। নয় তো শালগ্রাম সামনে রেখে পুজো করতে করতে গামছায় মুখ মুছে দু ছিলিম তামাক খেয়ে নেয় কোন সাহসে তারা? তোর বাবা মামারা এতখানি বয়েসেও কর্তার সামনে তামাক খেতে পারল না।

খাতা খুলে পেন্সিল হাতে নেয় নিরু। হাল্‌কা হাতে মন্দির গেঁথে তোলে কাগজের উপরে। বলে, 'আজ যখন প্রথম মন্দিরে ঢুকলাম, কি মনে হল জানো? মনে বড়ো শখ জাগলো, ঐ যে ঘুপ্‌সি চৌকো মেঝেটুকু, যার মাঝখানে কেদারনাথ, অন্ধকার ঘর ঠাণ্ডা হিমসিম, তারি এক কোনায় আড়ালে একলাটি আপন মনে যদি বসে থাকতে পেতাম খানিক। কিছু নয়, কেবল একবার একটু জানতে ইচ্ছা যায়, কি আছে ওখানে, কি অমৃত পেয়েছেন পুণ্যবানেরা। একটু তারই আভাস, ইঙ্গিত ;— আর কিছু না।'

পুজো সেরে রাজাবাবুর দল বেরিয়ে এলেন, এই পথ ধরেই তাঁদের বাসস্থানে গেলেন। পথের পরিচিত সেই বাঙালি দলটিই। যেতে যেতে উঁকি মেরে দেখে গেলেন নিরুর খাতা। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এক দুই করে নিরুর ঘাড়ের কাছে অনেকে এসে ভিড় করল। আঁকতে আঁকতে নিরু মুখ তুলে সবার আগে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে তাকায়। দেখে, আরে, এ যে ভৈরবনাথ। নিরু হাসে, ছেলেটিও হাসে। নিরু বললে, 'একটু আগে তুমি মন্দিরে কি করেছিলে মনে আছে?'

সে হেসে ঘাড় নাড়লে, কিছু মনে নেই।

'জলে স্নান করলে, শীত লাগে নি?'

'কৈ, বুঝতে পারি নি কিছু।'

'মাথায় ধাক্কা খেলে, টের পাও নি তা'ও ?'

'একটু ব্যথা ব্যথা লাগছে এখন মাথার পিছনটা, আর কিছু জানি না।'

'এই রকম করে ভৈরবনাথ প্রায়ই আবির্ভূত হন নাকি তোমার মধ্যে ?'

'প্রায় না, মাঝে মাঝে হন। আর আমি না, আমার দাদার মধ্যে ভর দিয়ে আসেন।'

একজন সৌম্যমূর্তি পূজারী পূজা সেরে যাচ্ছিলেন, বললেন, 'ওর দাদাই ভৈরবনাথের ভক্ত, তার ভিতর দিয়ে সহজে আসেন ভৈরবনাথ। সে গেছে নীচে হাট করে আনতে। রাজাবাবুরা দেখতে চাইলেন ভৈরবনাথকে, কি করা যায়, ওকেই এনে বসানো হল। দেখলে না, আজ কত দেরি হল তাঁর আসতে। যাঁরা মন্ত্র পড়ছিলেন, তাঁরা তো ঘাবড়েই গিয়েছিলেন ব্যাপার দেখে। যাক্ তিনি দয়া করেছেন, তাঁর মান তিনিই রাখেন। এই দেখ না মাহাত্ম্য, কেমন রোদ উঠল।'

কথায় কথায় একটু বেখেয়ালী হয়ে পড়েছিল নিরু নয় তো মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখছিল। জানি মনের কোণে কোনো কাঁটা বিঁধে আছে। ঘড়ি দেখল, সত্যিই একটা বেজেছে। আশ্চর্য। নিরু নির্বিকার মুখে তাকায় আমার দিকে।

দেখতে দেখতে দূরের মেঘও সরে যায়। পরিষ্কার রোদে উঠোন ভরে, বাঁধানো আঙিনার সিঁড়ির ভিজে পাথরগুলি শুকিয়ে ওঠে। খটখটে হয় মন্দিরের চাতাল, কেদারখণ্ডের সীমানা। ঘড়ি দেখে আর কেবলই চারদিকে তাকায় নিরু।

দেড়টা বাজে, দুটো বাজতে চলে, এক ঘণ্টার মাত্র মেয়াদ। আকাশের মেঘগুলি আবার যেন কাছে এগিয়ে আসে, আবার ছায়া ফেলে সামনের চত্বরে। ঠিক এক ঘণ্টা, টিপ টিপ করে আবার বৃষ্টির ফোঁটা নামে। আশ্চর্য, নিরু আবার গুমরে ওঠে 'কি বলব একে ?'

পূজারী নিরুর খাতায় আঁকা মন্দির দেখে ভারী খুশি। মাথায় হাত দিয়ে প্রসাদীফুলে আশীর্বাদ করেন, বলেন, 'এ আমার সরস্বতী মাঈ।'

নিরু জোরে জোরে ঘষতে থাকে কালো সীসের ডগাটা ; মন্দিরের চুড়োটা আর একটু তুলতে হবে বরফের গায়ে। ছেলেরা হটে যায়, মন্দিরের আসল পূজারী এসে দাঁড়ান সামনে। আঙুলের ইশারায় ডাকেন নিরুকে, বলেন, 'উঠে এসো।'

নিরু হকচকিয়ে যায়, 'আমাকে বলছেন ? উঠতে ? কিন্তু, কেন ?'

'এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'মন্দিরে।'

'মন্দিরের ভিতরে? দরজা তো বন্ধ।'

পূজারী জানান অন্য দরজা খুলে দেবেন।

নিরুর বিশ্বাস হয় না, এ'ও কি সম্ভব? বলে, 'দাঁড়ান, বড়দিকে ডেকে আনি। মন্দিরে যদি অসময়ে ঢুকতেই পাব তবে বড়দিকে ছাড়া এ ভাগ্য একলা গ্রহণ করি কি করে?'

দৌড়ে নিরু গেল 'পদ্মাশ্রমে।' বড়দিকে নিঃশ্বাস ফেলবারও অবকাশ দেয় নি বোধ হয়, টানতে টানতে বিহ্বল বড়দিকে নিয়ে এল সে। পূজারীকে বললে, 'চলুন।'

সামনের দুয়ার বন্ধ, পাশের এক দরজা দিয়ে পূজারী নিরুকে নিয়ে ভিতরে ঢোকেন।

নিস্তব্ধ মন্দির। নাটমন্দির পেরিয়ে দুটো সিঁড়ি উঠে তিনটে সিঁড়ি নেমে গর্ভমন্দিরে এল নিরু পূজারীর সঙ্গে।

পূজারী একখানা কম্বল আসন বিছিয়ে দিলেন কোনায়। নিরু বসতে যাবে, পূজারী মানা করলেন। বললেন, 'দাঁড়াও, এইটে ধর', বলে পিতলের থালায় কর্পূর জ্বালিয়ে তার হাতে তুলে দিয়ে হাত ধরে ঘোরাতে লাগলেন, বললেন, 'প্রথম এলে, কেদারনাথের কাছে আগে আরতি করে নাও তাঁর।'

পূজারী স্তোত্র পাঠ স্বরু করলেন। পাথরের গাঁথনির বন্ধ মন্দির গম্‌গম্ করছে পূজারীর স্বরে; সে স্বরে আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে যোগ দিলেন এসে এক এক করে আরো কয়েকজন পূজারী। দাউ দাউ জ্বলছে কর্পূর থালার মাঝখানে, দু হাতের তেলোয় আরতির থালা হাতে নিয়ে নিথর নিরু যেন দেখতে পায় তার এই আরতির আলো গিয়ে পড়ল সেই কোন আকাশভেদী শুভ্র হিমাদ্রিতে। একটি একটি করে দেখতে দেখতে গগন জোড়া সব শিখর জ্বলে উঠল সে আলোর রঙে। আর সেই আলোতেই তার কেদারনাথ দেখা দিলেন পূর্ণ বিকাশে।

নিরুর দু চোখ জলে ভরে উঠল। পূজারীরা পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন আরতির স্তোত্র। যেন থামতে পারছেন না কেউ।

কর্পূর নিঃশেষে নিভে এল। বড়দি এক হাতে ছুঁয়ে ছিলেন থালার কানা

এতক্ষণ, এবারে যত্নে নামিয়ে রাখলেন পাশে। অসাড় এক আনন্দানুভূতি নিরু ও বড়দির দেহে মনে। পূজারীদের ভঙ্গি নিঃশব্দ শান্ত। মৃদুস্বরে প্রথম পূজারী বললেন নিরুকে, 'এবার এইখানে বসে তুমি কেদারনাথকে আঁকো', বলে তাঁরা দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন।

একি বিশ্বাস্য! এমন একলার করে পাবে কেদারকে এ যে স্বপ্নেও ভাবে নি কখনো নিরু। বড়দি জোড়হাতে ধ্যানে বসে গেলেন। নিরু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে থুতনিতে হাত রেখে; কুলুঙ্গির কালো প্রদীপে অখণ্ড জ্যোতিঃ, অম্লান নিষ্কম্প শিখা; তাকিয়ে থাকে তার দিকে। সময় পেরিয়ে যায়, নিরু খাতা খোলে না, পেন্সিল ধরে না। বললে বড়দিকে, 'ওঁরা বলে গেলেন কেদারনাথকে আঁকতে, কি আঁকব? কার কেদারনাথ? আমার কেদারনাথ তো অন্য জিনিস। এই কেদারনাথকে আঁকব, পেন্সিলে কাগজে দেখাবে যেন খুদে পাহাড় একটি। কেদারনাথকে ধরব কি করে?'

ঘণ্টা খানেক পরে পূজারী আবার এলেন। বললেন, 'আঁকা হল?' নিরু বললে, 'বুঝিয়ে বলুন কি আঁকতে হবে, কি চান আপনারা?'

পূজারী বললেন, 'রাজাবাবু বললেন কেদারনাথকে রুপোর টোপর পরাবেন। পুরোটা ঢাকবেন, শৃঙ্গার বেশ হবে। কিন্তু কেদারনাথ তো ঠিক গোল নন — এই দিকটা উঁচু— ঐ দিকটা চ্যাপ্‌টা— ও দিকটা গোল— ঢালু— তাই কেদারকে এঁকে মাপ জোক দিয়ে দিলে তাঁরা সেই গড়নের সাজ তৈরি করে পাঠাবেন।'

'ও, এই কথা? তবে একটা টেপ চাই।'

নিরু উৎসাহে উঠে দাঁড়ায়, বলে, 'ও বড়দি ওঠো ওঠো, ফিতের এদিক ওদিক টেনে ধর, পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, চার দিকের চার গড়নের মাপ এঁকে দিই ঝট্‌পট্‌।'

ফিতে ধরে দু জনে কেদারনাথকে মাপে আর আঁকে, বলে, 'এ বেশ হল। যেন পুজো আসছে, ঘরের ছেলের জামা করতে হবে, মাপ নেয়া হচ্ছে। কত ইঞ্চি হল? সাড়ে সাতাশ এখানটা? আর চওড়া?' নিরু বড়দি খিলখিল করে হাসে আর ইঞ্চির দাগ গোনে।

নকশা পেয়ে পূজারী খুশি। হাসিমুখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, 'হ্যাঁ, কেদারনাথকে ঠিকই ধরা হয়েছে, নিখুঁত রুপোর সাজ হবে এখন।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে বড়দি বুকে চেপে ধরেন নিরুকে, বলেন, 'কাল আমরা অভিষেক-পুজো করব, হয়তো অনেকক্ষণই মন্দিরে থাকব, কিন্তু আজ যা আনন্দ পেলাম তা আর মিলবে না জানি।'

পদ্মাশ্রমে ফিরলাম যখন তখন বিকেল পাঁচটা। কোথায় গেছি কেউ জানে না। দাদা মেজদি তর্পণ সেরে এসে অপেক্ষা করে করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছেন লেপ-কম্বল মুড়ে। অসন্তোষের ছায়া তাঁদের মুখে। নিরু বড়দি চোখে চোখে তাকিয়ে হাসে, হাসতে হাসতেই নীচে নেমে যায়। ভৈরবনাথ — ওরফে মথুরানাথ পাণ্ডার আত্মীয়, দোকানের মালিকপুত্র ; খাওয়া-দাওয়ার তদারক সেইই করছে। মথুরানাথ থালা জল এগিয়ে দিল, ভাত বেড়ে দেবে। পিতলের থালাতে ময়লা লেগেছিল, তাড়াতাড়ি বসার কম্বলের আসনখানা দিয়েই থালাটা সে রগড়ে নিল। কম্বলের লোম, বালি, থালায় কির্‌কির্ করে উঠল। হেসে বড়দি নিজের থালাখানায় জল বুলিয়ে বলে ওঠেন, 'ভৈরবনাথ, এটাতেই ভাত তরকারী দাও, আমরা দু জনে একসঙ্গেই খেয়ে নেব।' প্রতি গ্রাসে হাসি উপ্‌চে পড়ে আর সেই হাসিমুখে ঝোলে ঝালে ভাত মুখে তোলেন দু জনে।

আজ পূর্ণ তৃপ্তি, পূর্ণ বিশ্রাম। খাওয়ার পরে মোটা কম্বলে ঢাকলেন নিজেকে বড়দি। বাইরে যেন চেপে বৃষ্টি এল। কুলুঙ্গির জানালাটা একটু খুলি কি শীতে হুল ফোটায়।

দাদা বললেন, 'বিশ্বাস করি কি না করি, আজ অবাক কাণ্ডটা দেখলে? তর্পণ করতে করতে ঘড়ি দেখছিলাম, মনটা ছিল তাতেই পড়ে। ঠিক একটার সময় কিন্তু বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল ঠিকই। দুটো নাগাদ আবার মেঘ করে বৃষ্টি নামল।'

মেজদি বললেন, 'আমাদের তর্পণের সময়টা কিন্তু ফাঁকতালে ভালো পেয়ে গিয়েছিলাম। শুকনো রোদ, সূর্যের মুখও দেখলাম খানিকক্ষণের জন্য। নয়তো এই শীতে বসে বসে তর্পণ করা— কোমর অবধি ধরে উঠেছিল এমনিতেই।'

ব্রজরমণ বললেন, 'অবর্ণনীয় মহিমা, অপার রহস্যলীলা। এ রহস্য ভক্ত ছাড়া ভেদ করতে পারে না আর কেউ।'

বগলাদিদি বললেন, 'বিশ্বাস তো করবে না আজকালের মেয়েরা। উলটে কেবল ঠোঁট বেঁকাবে। এবার দেবস্থানের মাহাত্ম্য টের পাক একবার।' বগলাদিদি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন কথাটা কতখানি বিদ্ধ হল নিরুর গায়ে।

নিরু ছিল না এখানে, খাওয়ার পরে 'আসছি' বলে কোথায় যে গিয়েছিল— পায়ের জল ঝাড়তে ঝাড়তে ছপ্ ছপ্ করে ঘরে ঢুকল। বললে, 'মনে খট্কা লেগেছিল, ফলাহারী বাবা নিজে পাশে বসেছিলেন কিনা? গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তাই, "আচ্ছা, ভৈরবনাথ কি সত্যিই এসেছিলেন?"'

দাদা বড়দি উঠে বসলেন, 'কি, কি বললেন তিনি?'

নিরু বলল, 'তিনি বললেন, "দেখ, মুনি ঋষিরা তপস্যা দ্বারা যে মহাশক্তি লাভ করে গেছেন মন্ত্রের মধ্যে তা গেঁথে রেখে গেছেন। সেই মন্ত্রের তো খানিকটা শক্তি আছে মানতেই হবে।"'

বড়দি বললেন, 'তা হয়, মন্ত্রের জোরে অনেক কিছুকে আহ্বান করা যায়। শাস্ত্রে আছে লেখা।'

নিরু দু হাত উল্টে দু চোখ বুজলো, বললে 'কি জানি, যাক্ সব; সাক্ষাৎ ভৈরবনাথ দর্শন হল, আর কি চাই? ভববন্ধন হতে মুক্ত আমি, আমার তো মোক্ষলাভ ঘটলো।' বলে, বিছানায় ঢুকে সারা গায়ে লেপ টেনে দিল।'

আজ গুরুবার, শুক্লাত্রয়োদশী; আজ অভিষেক-পূজা কেদারনাথের। সকালে উঠেই সর্বাগ্রে স্নানের ব্যবস্থা হল। এসব জায়গায় বিধিবিধান খুব স্থানোপযোগী। ছেলেবেলা থেকে জানি মন্দিরে যেতে হলে স্নান করে শুচি হয়ে যেতে হয়। এঁরা বললেন, ওসবের দরকার নেই, 'মার্জন' করলেই হয়। মার্জন মানে গঙ্গাজলের ছিটে গায়ে দিতে হয়— 'নমঃ বিষ্ণু নমঃ বিষ্ণু' ব'লে। বড়দি মানেন না। হাঁড়ি হাঁড়ি গরম জল করালেন জলপা সিংকে দিয়ে। কাঠের পাটাতনের মেঝে প্রতি ঘরে। বেশ বড়ো বড়ো ঘর, নীচের তলার প্রতিটি ঘরে মেঝের মাঝখানটা পাথর দিয়ে বাঁধানো, যেন ছোট্ট চৌবাচ্চা এক-একটি। ঐটাই উনুন, ঐটাই ধুনি। যাত্রীরা এক-এক দল এক-এক ঘর দখল করে মাঝখানে ধুনি জ্বালিয়ে ঘিরে বসে। ঐ আগুনেই রান্না হয়, রুটি সেঁকা হয়, যে যার খেয়ে নেয়। ওখানেই বসে বাসন মাজে, মুখ ধোয়, দরকার পড়লে স্নানও সারে। পাটাতনের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে যায় নীচে। যাত্রীর ভিড় কম বলে নীচের ঘরগুলি প্রায়ই খালি। এক ঘরে জল গরম হতে থাকল, আর ঘরে বালতি ভরে জল নিয়ে আমরা স্নান করলাম। মেয়েরা আগে। যত বেশি গরম জল গায়ে ঢালি ততই আরাম। নিরু বললে, 'মনে হচ্ছে যেন কেবল দেহের নয়, মনেরও ময়লা ধুয়ে গেল অনেকটা।'

ব্রহ্মকমল আনতে লোক গেছে, এখনও ফিরে এল না। এদিকে আবার বেলা না বেড়ে যায়। ব্রহ্মকমলের গল্প শুনি, ব্রহ্মা, এখানে ব্রহ্মগুম্ফ নামক গুহায় বসে শিবকে সন্তুষ্ট করতে শিবের তপস্যা শুরু করলেন। অর্চনা করবেন, ফুল পেলেন না একটিও। মনের দুঃখে ব্রহ্মা কাঁদতে লাগলেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মার অষ্টচক্ষু থেকে অশ্রু ঝরতে থাকল। দেখে মন গলল শিবের। তাঁর কৃপায় ব্রহ্মার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু এক একটি কমলরূপে প্রকাশ পেতে লাগল। পুষ্প দেখে ব্রহ্মা আনন্দিত হলেন, ঐ কমল দ্বারা কেদারনাথের অর্চনা করলেন। কেদারনাথ সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে, ব্রহ্মা বর চাইলেন— 'প্রতি বছরে এই সময়ে এই পুষ্প প্রস্ফুটিত হবে, আর এর নাম হবে ব্রহ্মকমল, এবং এই কমল দ্বারা যে তোমার অর্চনা করবে তুমি তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দিয়ো।'

জ্ঞান মহারাজ বলে দিয়েছিলেন, 'যাচ্ছেন বড়ো সুসময়ে। শ্রাবণ ভাদ্র এই দুই মাসেই কেবল ব্রহ্মকমল ফোটে। বছরের আর কোনো সময়ে হাজার চেষ্টা করুন, একটি ফুলও খুঁজে পাবেন না। দেড় হাত দু হাত লম্বা গাছগুলি, বরফের পাহাড়ে পাথরের ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে গজায়, সোজা একটি ডাঁটা, গায়ে দু চারটি কোঁকড়ানো লম্বাটে পাতা, ডগায় একটি মাত্র ফুল। যাচ্ছেন তো, দেখবেন, কী সুন্দর ফুলের গড়নটি, যেন পদ্মকোরক, আর তেমনই সুগন্ধ। সবুজে সাদা রং, ভিতরে বেগুনি রঙের গোল গোল চক্র, ছোটো বড়ো ছ'টা সাতটা, অনেক সময়ে তার বেশিও থাকে। ওরা ওখানে বলে ও গুলি নাকি শিবলিঙ্গ, একাদশ লিঙ্গ পর্যন্ত আছে। পদ্মের পাপড়িগুলি আমাদের দেশি পদ্মের পাঁপড়ির মতো কোমল নয়, কাগজের মতো একটু খসখসে। কয়েকটা নিয়ে আসবেন আসবার সময়ে, পুজোর পরে প্রসাদী ফুল জল ঝরিয়ে কাগজের ভাঁজে চেপে নিয়ে আসবেন; কিছু নষ্ট হবে না। শুনেছি, পরে জল দিলে আবার নাকি টাটকা হয়ে ওঠে।'

শশী মহারাজও বলেছিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আনবেন; শুনেছি ব্রহ্মকমলের কথা, কিন্তু দেখি নি আজ পর্যন্ত।'

বৃষ্টির জন্য কেউ ফুল আনতে যেতে রাজি হয় না। খুব বরফ পড়ছে নাকি সেখানে; কয়দিন আগে কে একজন গিয়েছিল, সে বললে। এসেই পাণ্ডাকে ধরেছি আমরা, ব্রহ্মকমল আনিয়ে দিতে হবে, যে করে হোক। যজমানকে খুশি

রাখাই পাণ্ডার ব্যাবসা। অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে পাঠিয়েছে একজনকে আজ ভোরে। পাণ্ডা বললে, মাত্র দু ঘর ব্রাহ্মণ, তারাই এই ফুল তোলার অধিকারী। অন্যরা যায় না। স্নান করে উপবাসী হয়ে ফুল তুলতে যেতে হয়। বরফের পাহাড়ে মাইল-জোড়া ফুলের বন, 'কড়া বাস', নাকে মুখে আচ্ছা করে ফেটি বেঁধে কোনো রকমে ফুল তুলে পিঠের ঝুড়িতে ফেলেই নেমে চলে আসে। বন-ভরা ফুলের সুগন্ধ নাকে গেলে ওখানেই ভিরমি খেয়ে পড়বে।

বড়ো বড়ো পিতলের থালায় পূজা-উপাচার সাজিয়েছেন বড়দি : পুষ্প, চন্দন, কর্পূর, ধূপ, নববস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, কুমকুম, আতর, বিল্বপত্র, নৈবেদ্য, গঙ্গাজল।

পাণ্ডা বললে, 'ব্রহ্মকমল আসতে আসতে চল ততক্ষণে অন্যদের পূজা সাঙ্গ করে নিই। সময় লাগবে সব সারতে। আগে মা গঙ্গার পূজা। মন্দাকিনীর তীরে চল।'

ফুলের মধ্যে কয়েকটা ঘাসফুল ঘাসপাতা সম্বল। অনেক সময়ে ফুল না পেলে চন্দ্রমল্লিকার মতো পাতা তুলে এনেই পুজো চলে। পাতাগুলিতে বেশ একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ— বুনো চন্দ্রমল্লিকা হবে হয়তো এগুলি। আমাদের বেলায়ও পাণ্ডা তাই সংগ্রহ করে এনেছে।

মন্দাকিনীর ঘাট একটু নীচে, ঘাটে পাথর বাঁধানো। সদ্য বরফগলা জল, হাত ছোঁয়ালে যতটুকু ছুঁইয়েছি যেন কেটে নিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কোনোমতে দু আঙুল দিয়ে মাথায় জল ছিটিয়ে 'অপবিত্রো পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা' বলে মানসস্নান-মানসে নিরু জলে আঙুল ডোবাতে যাবে কি চাদরের তলা থেকে পাঞ্জাবির হাতটা ঝলঝল করে নেমে এসে ভিজে গেল খানিকটা। নিরুকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাতে দেখেই বড়দি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, কি জানি এখুনি আবার হয়তো বকুনি শুরু করবে।

এই আজ সকালেই স্নানের পরে শীতে যখন ঠকঠক করে কাঁপছিল নিরু— বড়দির মনে ব্যথা লাগল। নিজেকেই অপরাধী মনে করলেন। হরিদ্বার থেকে রওনা হবার সময়— গরমে তখন ওখানে সেদ্ধ হচ্ছিলাম সবাই— বুঝতে পারা যায় নি যে, জিনিসপত্র কমাতে কমাতে প্রায় সবই ওখানে রেখে আসা হল। শেষ মুহূর্তে নিরুর গরম কোটটাও বড়দি ওর হাত থেকে কেড়ে রেখে দিলেন— মিথ্যে কেন ব'য়ে নিয়ে যাওয়া। আজ ভোরে বড়দি তাঁর ফুলকারি কালো

ট্রাঙ্কটা খুলে যাবতীয় জিনিস ঝাড়ানাড়া দিতে লাগলেন। প্রথমটা বুঝতে পারি নি, ভেবেছি পূজার সামগ্রীই কিছু হয়তো খুঁজছেন, টুকিটাকি কত কী তাঁর সংগ্রহের ধন। শেষে দেখি তা তো নয়, দাদার দুটো ফ্লানেলের পাঞ্জাবি বের করে সাদাটা দাদাকে পরালেন, আর খয়েরিটা নিরুকে। বললেন, 'এইটে পরা থাক, কোমর পর্যন্ত ঢাকা থাকবে। শীতে কষ্ট পাবে না।'

সকালবেলা এরই মধ্যে একবার নিরুর দাপাদাপি হয়ে গেছে। চাদরের নীচে পাঞ্জাবি পরে আছে, ভুলেই গিয়েছিল কথাটা। বাঙালি দলটি চলে যাচ্ছে আজ, দৌড়ে নিরু তাদের বিদায় দিতে গেল। বৌটির সঙ্গে এ কয়দিন থেকে-থেকেই দেখা হয়েছে, কথাবার্তাও কয়েছে, ভালোও লেগে গিয়েছে হয়তো কিছুটা। তারপর বিদায়কালে করুণ মুখে নমস্কার করতে হাত বের করেছে যেই, পার্শিয়ান ছবির মতো পাঞ্জাবির হাতা নিরুর হাত ঢেকে বাইরে বেরিয়ে আধ হাত ঝুলে রইল। বৌটি তো হতভম্ব। তখনকার মতো নিজেকে সামলে ঘরে এসে আছড়ে পড়ল নিরু। দাদা বললেন, 'কেন ভাবছ, তুমি যা করবে সেটাই তো ফ্যাশান। দেখবে'খন এর পরের বারে এইরকম পাঞ্জাবি পরাই হয়তো চল হয়ে যাবে কেদারবদরীর পথে।'

ভিজে পাথরে দাঁড়িয়ে আছি, প্রবল স্রোতের জল পাথর ছিটকে লাগছে পায়ে, যেন সহস্র সূচের ধারালো ডগা বিঁধছে। পাণ্ডা বিধি অনুসারে জাহ্নবীর অর্চনা করিয়ে তবে নিষ্কৃতি দিলে। সেখান থেকে ঘরে এসে আগুনে হাত পা সেঁকে শরীর তাজা করি।

এই শীতে বরফজলে স্নান, সে যে কী ব্যাপার তাই ভাবি। জ্ঞান মহারাজের কাছে শুনেছি— গল্প বলেছিলেন, 'মানসসরোবরে গেছি— মাঝ-রাত্তিরে যোগ, সেই সময়ে স্নান করতে হবে। মানসসরোবরের জল, বুঝতেই পারছেন, লিকুইড বরফ বললেই হয়। ঘাটের কাছেই তাঁবু ফেলা হয়েছে। তাঁবুর ভিতরে কম্বল বিছানো, স্টোভে গরম জল ফুটছে, আংটায় আগুন; ঘাটে দু জন কম্বল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, একজন জলে নেমে একটা ডুব দিয়ে উঠলেই কম্বলে জড়িয়ে তাকে তাঁবুতে এনে কম্বলে ফেলে মাসাজ করে আগুনে সেঁকে তবে তার সম্বিত ফিরিয়ে আনি। কেউ কেউ এমন বেহুঁশ হয়ে যায়, মাসাজে আগুনেও কিছু হয় না। তখন কুলী তৈরি থাকে, তাকে পিঠে করে সোজা নীচে নেমে চলে আসে। সেখানে তখন তার শুশ্রূষা চলে।'

নিরু বলেছিল, 'এমন স্নান না করলেই কি নয়?' জ্ঞান মহারাজ হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'গেলাম মানসসরোবর উপলক্ষ করে, গিয়ে ডুব না দিয়েই চলে আসব? অনেক সময়ে কেউ কেউ জলে নেমে আর ডুব দিতে চায় না, তখন আমরা তার মাথাটা চেপে ধরি।' বলেই আর-এক দফা হেসেছিলেন হো হো করে। সদানন্দ মানুষ, মজাটা যেমন পেতে জানেন, দিতেও জানেন তেমনি।

এবার অভিষেক-পূজার অর্ঘ্যথালা হাতে নিয়ে রওনা হওয়া গেল মন্দিরের দিকে। দ্বারের ডানদিকে সিদ্ধিদাতা গণেশ। খোলা চত্বরে মুক্ত আকাশের তলে সবাই পুজো দিতে বসলাম। সর্বসিদ্ধি গণপতি। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়ে গিয়েছিল। তার পর তিনি যখন হস্তিমুণ্ড প্রাপ্ত হলেন, লাল গণেশকে বুকে নিয়ে মা পার্বতী চোখের জলে ভাসেন। ব্রহ্মা এসে বললেন, 'কেঁদো না পার্বতী, তোমার ছেলের স্থান সর্বদেবতার পুরোভাগে। প্রতি দেবতার পুজোর আগে তোমার ছেলের পুজো হবে জগতে, নয়তো অসিদ্ধ হবে সেই পুজো। সিদ্ধিদাতা গণেশ তোমার ছেলে, এর খুশিতেই খুশি হবেন অন্য দেবতারা।'

পাণ্ডা মন্ত্র আওড়াচ্ছে, আর পঞ্চামৃতে গণেশকে স্নান করানো হচ্ছে। স্নানের পরে কুঙ্কুম-চন্দনে সাজানো হল তাঁকে, যজ্ঞোপবীত গাত্রাবরণে ঢাকা হল তাঁর দেহ, শেষে ভোগ নৈবেদ্য দিয়ে পূজা সাঙ্গ করে প্রণাম করবার সময় প্রার্থনা জানাতে হল, 'হে গণপতি, এবার মন্দিরে ঢুকছি, মম যাত্রা সফল কর।'

আমাদের হয়ে আজ পূজার সময়ে মন্দিরে রুদ্রপাঠ করবার জন্য কয়জন ব্রাহ্মণ ঠিক করা ছিল আগে থেকে। তাম্রখণ্ডে সুপারি আতপচাল গঙ্গাজল নিয়ে সংকল্প-মন্ত্রে তাঁদের বরণ করা হল। তাঁরা অঞ্জলি পেতে তা গ্রহণ করে সুমধুর গম্ভীর ধ্বনিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন— 'করিষ্যামি করিষ্যামি'।

দ্বারের কাজ শেষ হলে মন্দিরে ঢুকলাম। ব্রহ্মকমল এখনো এসে পৌঁছুল না, বেলা বেড়ে চলেছে। পাণ্ডা বললে, 'ভাগ্যে থাকলে ঠিক এসে পৌঁছুবে। ততক্ষণ কেদারনাথকে স্নান করানো যাক।'

সারি দিয়ে আমরা কেদারনাথকে ঘিরে বসলাম। শিবের মন্দির, জল ঢালাঢালির জন্য কাদা-জলে প্রায় সর্বত্রই মেঝেটা পিচ্ছিল হয়ে থাকে। এখানেও

তাই। তবে এখানকার এ-অবস্থা শিবের অঙ্গধোয়া জলের জন্য নয়; সে-জল চলে যায় নীচে, গৌরীপট্টের স্বাভাবিক ফাটলের ভিতর দিয়ে। কিন্তু ফাটল আছে মাথার উপরকার পুরু পাথরে, ছাদ চুঁইয়ে সারাক্ষণ টপটপ করে জল পড়ছে। পাণ্ডার কাছে শুনলাম, অনেকবার অনেক ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন, তবু নাকি মেরামত সম্ভব হয় নি। ভাঁজে ভাঁজে পাথরের গাঁথনি, কোন্ গাঁথনিতে ফাটল কে জানে। পাঁচ ফুটের উপরে চওড়া দেয়াল ও ছাদ, একটা জানালা পর্যন্ত ফোটাতে পারল না তারা।

দধি, দুগ্ধ, আতর, মধু, শর্করা দিয়ে শিবকে স্নান করানোর পর কুঙ্কুমে চন্দনে তিলক কেটে শুভ্রবস্ত্রে তাঁকে সাজানো হল। সেই যে দুটি স্বর্ণ-বিল্বপত্র গড়িয়ে এনেছিলেন বড়দি, অঞ্জলি দিলেন তাই দিয়ে। কর্পূরে, ধূপে, ঘৃত-প্রদীপে, শঙ্খ-ঘণ্টায় মন্দিরে একটি অপরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাহ্মণ-পূজকগণ সমস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। বড়দি স্তব গাইতে লাগলেন—

শশিলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সন্মুকুটং
কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী-কৃত-পূতজটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

ধ্যানমগ্ন সবাই। কেবল একপাশে বসা নিরু যেন কথা ক'য়ে উঠল কার সঙ্গে। মন্ত্রের ভাষা সে জানে না, পূজা করতে শেখে নি কখনো। কী এক বেদনায় সে বলে উঠল হঠাৎ, 'হায়, কোথায় আমার সেই পূজারী ঠাকুর—যাঁর গলার স্বরে আমার কথা তুলে ধরব তোমার কানে, যাঁর হাত দিয়ে আমার পূজা পৌঁছে দেব তোমার সিংহাসনে।'

হঠাৎ চারি দিক উগ্র সৌরভে ভরপুর হয়ে ওঠে। বিস্মিত হয়ে তাকাই চার দিকে। দেখি, মস্ত এক ঝুড়ি-ভর্তি ব্রহ্মকমল এনে ঘরের কোনায় নামিয়ে রাখল একটি লোক।

পাণ্ডা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'এই নাও, সহস্র কমল এসে গেছে, কত সাজাবে সাজাও কেদারনাথকে।' ব'লে দু হাত ভরে ভরে ঝুড়ি থেকে ব্রহ্মকমল তুলে এনে সবাইকে দিতে লাগলেন। সে-ফুলে ঢেকে গেলেন কেদারনাথ, আর জায়গা নেই। আরো চাপাও, ফুলের উপরে ফুল চড়াও।

অন্ধকার ঘরটিতে শুভ্র ফুলে যেন জ্যোতি খেলে গেল। নিরু ধীরে ধীরে উঠে এল, সযত্নে একটি ফুল হাতে নিয়ে আলগোছে কেদারনাথের একপাশে রেখে দিল সে।

দ্বারের কাছে হবন হল। যজ্ঞাহুতি দিলাম। মন্দিরের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পূজারী এক এক করে নিজ হাতে যজ্ঞতিলক পরিয়ে দিলেন আমাদের কপালে।

পরম পরিতৃপ্তি বড়দির আনন্দভরা মুখে। বললেন, দেবতাকে আলিঙ্গন করার রীতি আর কোথায়ও নেই, এই এক কেদারনাথ ছাড়া। নিরুর ছলছলে দুই চোখে কানায় কানায় ভরা জল, পলক ফেলতেই গড়িয়ে পড়ল।

আজ দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবেন বড়দি। কাল রাত থেকে উনুনে ডাল চাপানো হয়েছে। বরফ-জলে ডাল ফোটে না মোটে, মাগগির কাঠ প্রচুর খরচ হয়। ডাল খাওয়া তাই বিলাসিতা এখানে। কাল রাত্রে পরামর্শ হচ্ছিল কী কী খাওয়ানো হবে। পাণ্ডা বললেন, 'ডাল যদি খাওয়াতে চাও তো আজ রাত থেকেই উনুনে বসাতে হবে। তা ডাল কর, সেইসঙ্গে আলুর সবজি আর হালুয়া পুরি। যথেষ্ট। ভূরিভোজন হবে সবাইকার।' মথুরানাথই রান্নার ভার নিয়েছে। বড়দিরা চলে গেলেন পদ্মাশ্রমে, ভোজনের ব্যবস্থা দেখতে। নিরু বললে, 'ততক্ষণ আমি ফলাহারীবাবার কুঠরি থেকে ঘুরে আসি। পারি তো তাঁর একটা স্কেচ করবো আজ।'

ফলাহারীবাবার ঘরে দু-চারজন ভক্ত সর্বদাই লেগে আছে। হয়তো পূজারীরা এসে বসেন, দু চার কথা বলেন, উপদেশ নেন, ধুনির আগুনে ঘটিতে করে চা বানিয়ে খান, খেয়ে গেলাস ঘটি ধুয়ে ওখানেই উপুড় করে রেখে যান। নিরু বলেছিল সেদিন, 'বাবার ঘরে কত বাসনপত্র, পুরো সংসার। এর পরের বারে এসে আপনার ঘরেই থাকব।' শুনে ফলাহারীবাবা হেসে-ছিলেন। বড়ো স্নেহমধুর হাসি।

নিরু ঘরে ঢুকে একপাশে জায়গা করে নিল। অন্ধকার ঘরের অন্ধকার কোনায় বসে আছেন ফলাহারীবাবা। তাঁকে দেখাই যায় না ভালো করে তো আঁকবে কি নিরু। তবু, সাবধানে কাগজের উপরে পেন্সিল ঘষে চলেছে। এই করতে করতে হয়তো এক সময়ে ফুটে উঠবে তাঁর মূর্তি।

ফলাহারীবাবা বলছেন ভক্তদের, 'গুরোপদিষ্ট সাধনমার্গই অনুবর্তন করে যাও। সাধন করতে করতে মল, বিক্ষেপ ও আবরণ সরে যাবে। মল হল পূর্বজন্মার্জিত পাপাদি এবং বিক্ষেপ চিত্তচাঞ্চল্য আর আবরণ হল মায়ার প্রভাবে চিরশুদ্ধ নিত্যমুক্ত, আত্মাকে বদ্ধ অশুদ্ধ ও অনিত্য মনে করা। তীব্র সাধনার প্রয়োজন। এ-পথ ক্ষুরধারের উপর দিয়ে গমনের ন্যায় কঠিন। নিষ্কাম-ভাবে কর্ম করতে হবে। দেখো, হুঁশিয়ার থেকো, দান-পুণ্যাদির অনুষ্ঠান যেন কোনোপ্রকারে বাসনাযুক্ত না হয়।

'আর, ত্যাগ না করলে বস্তুলাভ হবে না। নিজের জীবনযাত্রা-নির্বাহোপযোগী বস্তু রেখে আর সবই পরিত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ব্যতীত উপায় নেই। যতদিন পর্যন্ত না ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হয় ততদিন পর্যন্ত ভক্তি সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণদেব কী পরিমাণ ত্যাগ করে কত কঠোরতা করে তবে ভক্তি লাভ করেছিলেন। প্রত্যেকেরই হৃদয়ে আত্মা আছেন, আর তিনিই সর্বব্যাপী। আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাঁর সন্ধান না জেনে ইতস্তত খুঁজে মরছি। যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিকে, ঘটাকাশ মহাকাশকে, জলবিন্দু সাগরকে প্রশ্ন করছে নিজের ও তাদের স্বরূপ সম্পর্কে।'

শুনেছি ফলাহারীবাবা নিরক্ষর সাদাসিধে মানুষ, নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে জানেন না। অথচ কী প্রাঞ্জল ভাষায় ভক্তিতত্ত্বের কথাগুলিকে বুঝিয়ে দেন। নিরু বলে, 'অন্তরে উপলব্ধি হলে এসব কথা আপনিই আসে। স্বচ্ছ কাঁচে প্রতিবিম্ব দেখার মতো দেখতে পান তাঁরা।'

বড়দি খবর পাঠালেন— ব্রাহ্মণরা পংক্তিতে বসে গেছেন, খাওয়া দেখবে তো এসো শিগগির। ফলাহারীবাবার স্কেচটাও প্রায় হয়ে এসেছে। ফলাহারী-বাবাকে দেখাতে তিনি বেশ খুশির হাসি হাসলেন। খাতা মুড়ে পেন্সিল রবার হাতে নিয়ে নিরু বেরিয়ে এলো। এক ভক্ত হেঁকে বললেন, 'ফলাহারী-বাবাকে পাবার জন্য আমরা কতকাল ধরে বসে আছি, আর তুমি এমনি করে তাঁকে নিয়ে চললে?' নিরু বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে উত্তর দিল, 'জী হাঁ, যে যেমন পারে।'

ব্রাহ্মণদের খাওয়া ততক্ষণে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উল্লাসধ্বনিতে বোঝা গেল, খেয়ে তাঁরা খুব খুশি হয়েছেন। তাঁরা উঠে যেতে আমরা খেতে বসলাম। সকাল হতে না-খাওয়া, খিদে পেয়েছে খুব। পাণ্ডা

থালাতে পুরি দিলেন, এক কৌটা আলুর তরকারি, আর বাটিতে ডাল খানিকটা। ডাল তো নয়, মশলা গোলা জল, নীচে গোনাগুনতি কয়েকটা ছোলার ডালের অক্ষত দানা। কাল থেকে সিদ্ধ হয়ে এই অবস্থা? মেজদি বললেন, 'দেখলে না তো তাঁদের খাওয়া। এই ডালের ঝোলে লুচি ডুবিয়ে ডুবিয়ে কী পরিতোষ করে খেলেন সবাই। দেখলাম, আর অবাক হলাম।' ঘিয়ে চপচপে আটার হালুয়াটা বেশ মুখরোচক, তাই দিয়ে পেট ভরালাম। এই খাওয়াতেই নাকি ষাট পয়ষট্টি টাকা লেগে গেছে।

আজ আর কুঁড়েমি নয়, বেলাও পড়ে আসছে। আজ ঘুরে বেড়াব কেদারনাথের জমিদারিটুকুতে।

পাণ্ডা বললে, 'চল, আগে তোমাদের রেড্‌সকুণ্ড দেখিয়ে আনি। রেড্‌স কুণ্ড একটু দূরে, দূরেরটাই আগে দেখা ভালো।'

বৃষ্টির জন্য পথ ভালো নয়। আর সর্বত্রই তো পাথর ছল্‌কে ছল্‌কে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। তবু যেখানে একটু মাটি মিলেছে, দূর্বাঘাসের মতো ছোটো ছোটো এক রকমের ঘাস গজিয়ে স্থানটুকুকে উজ্জ্বল সবুজ মখমলে ঢেকে রেখেছে। পাণ্ডা বললে, 'এই ঘাস ঘোড়া মোষে খায়, তাতেই তাদের শরীর গরম থাকে।'

নিরু বললে, 'ও তাই। আর আমি এদিকে অযথা ভেবে মরছি। শুনতে পাই, রাতভর ঘরের বাইরে ঘোড়ামোষের গলার ঘণ্টা বাজে। ভেবে পাই না, আগুনে-কম্বলেও শীত ঘোচে না আমাদের, আর ওরা এমনি প্রকৃতির পুত্র হয়ে বেঁচে আছে কী করে? এখন বুঝলাম, সবেরই ব্যবস্থা আছে সংসারে। এই ঘাস তাহলে শীতের দাওয়াই বল?'

পাণ্ডা বললে, 'হ্যাঁ, খুব গরম। এই ঘাস খায় বলেই তো তারা বরফের দেশে টিঁকে আছে, নয়তো একদিনও এখানে থাকতে হত না। মানুষেরই স্থান হয় না, ঘোড়া মোষকে ঘরে রেখে আগুন জ্বালিয়ে আরাম দেবে কে বল?'

রেড্‌স কুণ্ডে এলাম। ছোট্ট একটা পাথরের মন্দির, তার ভিতরে কুণ্ড। পাণ্ডা বললেন, 'এই কুণ্ডের মহিমা আছে, "হর হর বোম্ বোম্" বলে হাত-তালি দাও, দেখবে কী হয়।' বলে নিজেই 'হর হর বোম্ বোম্' বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুক্‌বুক্ করে জলের উপরে ছোটোবড়ো কয়েকটা বুদ্বুদ ভেসে উঠল। দেখাদেখি সকলেই 'বোম্ বোম্' বলি আর

হাততালি দিই, অমনি শব্দ করে বুদ্বুদ ভেসে ওঠে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলাম, এমনিতে যে বুদ্বুদ না ওঠে তা নয়, থেকে থেকে দু-চারটে উঠছেই, তবে কথা কিংবা তালির আওয়াজেই ভিতরের হাওয়াটুকুতে বেশী চাপ পড়ে বোধহয়, তাইতেই বিরবির করে একসঙ্গে অনেকগুলি বুদ্বুদ ভেসে ওঠে। সেখান থেকে এলাম হংস কুণ্ডে। যাত্রীরা এসে প্রিয় মৃতজনের অস্থি বিসর্জন দেয় এখানে। বিশ্বাস করে, এতে মৃতের আত্মার মঙ্গল হয়। কাছ দিয়ে সরস্বতী নদী ব'য়ে যাচ্ছে। পাণ্ডা বললেন, কেদারে ক্রোড় গঙ্গা। ক্রোড় না হোক বহু তো নিশ্চয়ই। তিনদিক ঘেরা বরফের পাহাড়ের যেদিকে তাকাই সেদিকেই অবতরণমুখী জলধারা, সব ধারা এখানে একসঙ্গে মিলে এক মন্দাকিনী হয়ে ব'য়ে চলেছে। বরফগলা জল, অথচ এক-একটির এক-এক রং। নিরু বলে, 'এ কী করে সম্ভব?' মন্দাকিনী নামছে মন্দিরের পিছন দিককার উঁচু পাহাড় হতে, ঠিক যেন শিবের জটা ধুয়েই নামছেন গঙ্গা। তার জল ঘোলাটে। দুধগঙ্গা ঐ পাশে, দুধের মতোই সাদা। মধুগঙ্গা— তার জল নাকি ভারী মিষ্টি। ওদিকে স্বর্গদ্বারী, ক্ষীরগঙ্গা, আরো কত কী। বড়দি বললেন, 'কোন্ বইয়ে যেন পড়েছিলাম বর্ণনা যে, "কেদার-ক্ষেত্রের চতুর্দিকস্থ শুভ্র বরফ-বিমণ্ডিত পর্বত-প্রাচীরের গা হতে ধবলবর্ণা মধুগঙ্গা, দুধবর্ণা ক্ষীর-গঙ্গা, ধূম্রবর্ণা মন্দাকিনী, পঙ্কিলবর্ণা স্বর্গারোহিণী আর নীলাভ সরস্বতীর জলপ্রবাহ সারি সারি নীচের উপত্যকায় পড়ে বিবিধ বর্ণে পঞ্চগঙ্গা শঙ্খার্ঘ্যের অগ্রভাগে একত্র মিলিত হয়েছে, যেন কামদেব তাঁর পঞ্চফুলশর যোজনা করে হাসছেন ধ্যানমগ্ন পার্বতীনাথের পাদপদ্ম লক্ষ্য করে।" সত্যিই তা-ই মনে হয়।'

পাণ্ডা স্বর্গারোহিণী নদীর উদ্‌গম-স্থানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, প্রাচীনকালে লোক ঐ পথ ধরে ভৃগুপাতে গিয়ে দেহত্যাগ করতো।

বড়দি বললেন, ব্রহ্মজ্ঞানে বলীয়ান মহাতপা সন্ন্যাসীরাই দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক জেনে স্বেচ্ছায় এইভাবে 'ভৃগুপাতে' দেহত্যাগ করতে অধিকারী হতেন।

মন্দাকিনী আর স্বর্গারোহিণী যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখান থেকে স্বর্গারোহিণীর ধারা ধরে পুবদিকে কতকটা উঠে দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দু মাইল পাথর আঁকড়ে উঠে আবার এক মাইল পর্বতের ওদিকে নেমে

অর্ধ-চন্দ্রশিলায় পৌঁছানো যায়। অর্ধচন্দ্রাকার একখানি দশ-পনেরো হাত লম্বা ও সাত-আট হাত উঁচু প্রস্তরখণ্ড। এর উপরেই নাকি পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী শেষ উপবেশন ও বিশ্রাম করেছিলেন। এবং এখান থেকেই স্বর্গারোহিণীর গতি লক্ষ্য করে তাঁরা তুষার-আরোহণ আরম্ভ করে মহাপ্রস্থান করেছিলেন। এখান থেকেই ঠিক উত্তর-পূর্বে বদরিকাশ্রম। বহুকাল আগে এই পথেই কেদারবদরী চলাচল হত। এখন ঘুরে যায় সকলে, বহু মাইল পথ মাড়িয়ে। শুনেছি, অর্ধচন্দ্রশিলার গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ তার অর্থ বুঝতে পারেন নি। এর উপরে আরো আধ মাইল উঠলে তবে 'ভৃগুপাত'।

কেদারক্ষেত্রের পুবদিকের পর্বত-প্রাচীরের উপর দিয়ে দু মাইল পুব-দক্ষিণে গিয়ে অগ্নিকোণে 'বীরভদ্র' মন্দির। বড়দি বললেন, দক্ষযজ্ঞে পতি-নিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেছেন সংবাদ পেয়ে মহেশ্বর ক্রোধভরে নিজ মস্তকের একটি জটা ছিন্ন করে নিক্ষেপ করলে বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। শিবানুচর বীরভদ্রই শিবের আদেশে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। সেই বীরভদ্রই এখানে এককোণে প্রহরীরূপে অবস্থান করে মহাযোগী মহাদেবের ধ্যান-ভূমির নীরবতা রক্ষা করছেন।

শুনে নিরু লাফিয়ে উঠল। এই বীরভদ্রই বুঝি ব্রহ্মের বাহন হংসের মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, তা থেকেই হংসকুণ্ডের সৃষ্টি।

বড়দি বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো বলে পুরাণ গাথায়। মহাদেব ধ্যানমগ্ন আছেন। এমন সময়ে হংসারূঢ় ব্রহ্মা বীরভদ্রের অনুমতি না নিয়ে কেদারক্ষেত্রে প্রবেশ করছিলেন। দেখে, বীরভদ্র রেগে গিয়ে করল কি, ব্রহ্মার শান্তশিষ্ট বাহন হাঁসটার মুণ্ড ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলে দিল। মাথাটা যেখানে গিয়ে পড়ল সেই জায়গাই হংসকুণ্ড বলে খ্যাত। ব্রহ্মা, কিন্তু খুশিই হলেন বীরভদ্রের প্রভুভক্তি দেখে। আপন কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে আবার নিজ বাহনকে তিনি সঞ্জীবিত করে নিলেন।'

মন্দাকিনীর উৎপত্তিস্থানের দু মাইল উপরে, 'চোরা-বারি' নামে অনন্ত 'বরফের সমুদ্র'। তা থেকে কঠিন বরফ-প্রস্তর প্রতিনিয়ত নীচে গড়িয়ে পড়ছে।

মধুগঙ্গার উপরে তিনচার মাইল বিস্তৃত নির্মল জলপরিপূর্ণ 'বাসুকি-সাগর'। চারিদিক কোনো এক সময়ে প্রস্তরে বাঁধানো ছিল। লম্বা লম্বা প্রস্তর ভগ্নাবস্থায় এখনো নাকি দেখা যায় সাগর-তীরে। সাপের মতো জল-তরঙ্গ নিয়ত উঠছে ঐ জলাশয়ে, তাই তার নাম বাসুকি-সাগর। এই প্রদেশই নাগ-লোক। সব আর দেখা হয় না। কানে শুনেই কল্পনায় ধরে নিই।

মন্দির বাঁয়ে রেখে ঘুরতে ঘুরতে এলাম মন্দাকিনীর তীরে। সবুজ ঘাসে ঢাকা খানিকটা জমি, তারই পারঘেঁষা নির্দিষ্ট একটি জায়গা দেখিয়ে পাণ্ডা বললেন, 'এই হল শঙ্করাচার্যের সমাধি।' দেখে স্তম্ভিত সবাই। এমন যে মহামানব, তাঁর সমাধির এই অবস্থা! দুটো পাথরের গাঁথনি দিয়ে জায়গাটুকু রক্ষা করার কথাও কারো মনে আসে নি আজ পর্যন্ত?

নিরু বললে, 'নীচে যে দুর্দান্ত নদী, ঐ পারটুকু ধসে যেতে কতক্ষণ?'

দাদা আক্ষেপ করেন, 'শঙ্করাচার্যের সমাধি যে এখানে তা জানতামই না। পাণ্ডা না বললে, না-জানাই থাকত।' মেজদি 'আহা-হা' করে ওঠেন, 'তাঁর মতো লোকের সমাধিস্থান এমন অবহেলায় পড়ে থাকে কী করে?'

বড়দি নিশ্চুপ।

মন্দিরের পিছনদিকে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। পুবের আকাশের খানিকটা জায়গা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। শুক্লা ত্রয়োদশীর নিটোল চাঁদ কালো মন্দিরের চূড়া ঘেঁষে দেখা দিল— যেন শশিশেখরের শোভা ফুটল।

নিরু হলুদ রঙের একগোছা ঘাসফুল তুলে শঙ্করাচার্যের সমাধির উপর ছড়িয়ে দিল।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখতে হবে, এখন ঘরে ঢুকে লাভ নেই। কাছেই ফলাহারীবাবার কুঠরি, সেখানে গিয়ে বসলাম। এই আধ ঘণ্টাটাক সময় এখানেই কাটানো যাক।

সকলে পা গুটিয়ে স্থির হয়ে বসতেই ফলাহারীবাবা মুখ তুললেন, বললেন, 'শঙ্করো শঙ্করোঃ সাক্ষাৎ; এই কেদারনাথেই শঙ্কর বিলীন হয়েছেন, ভগবান কেদারেশ্বররূপেই শঙ্কর এখানে অবস্থিত আছেন। কাজেই তাঁর আবার আলাদা মন্দির বা সমাধি করতে যাওয়া কেন? এতে ভক্তদের মন বিক্ষিপ্ত হয়।' দাদা বড়দি দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। মেজদি ফিসফিস করে বললেন, 'ইনি জানলেন কী করে যে আমরা শঙ্করের সমাধি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি? আমরা ছাড়া আর তো কেউ ছিল না সেখানে, পাণ্ডা তো ঢোকেই নি এখনো ঘরে।'

মন্দিরের পুজারী কয়েকজন ধূপদীপ জালিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। শিবস্তুতি-গান করতে করতে আরতি করতে লাগলেন ফলাহারীবাবাকে। আরতি-শেষে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে তাঁরা চলে গেলেন। মন্দিরের আরতির আগে বাবাকে নাকি রোজ এমনি করে আরতি করা হয়।

মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমরাও উঠে পড়লাম। মন্দিরে আজ ভিড় বেশ। এই বিকেলের মধ্যে অনেক নতুন যাত্রী এসে পড়েছে দেখছি। নিরু বললে, 'রঙিন সাটিনে ঢাকা দিয়ে সোনার মালা মুকুটে কেদারনাথকে সাজিয়েছে দেখ। এর চেয়ে ঘি-মাখা অঙ্গেই তাঁকে বেশি মানায়।'

ছাদ থেকে ঝোলানো রুপোর ছত্র, তা থেকে ঝুলছে রুপোর ঘটি। ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে শিবের মাথায় দিবারাত্র। সামনে ত্রিশূল ডমরু। কপালে ভস্মমাখা মন্দিরের পূজারী প্রথমে এক, পরে তিন, তারপর পাঁচ, সাত, নয়, দীপযুক্ত দীপাধারে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে আরতি করলেন। এক হাতে ঘণ্টা বাজান আর অন্য হাতে দীপাধার ঊর্ধ্বে তুলে ধীরে ধীরে নামিয়ে এনে যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তেমনি তাঁর স্তোত্রপাঠ। আরো কতজন সেই সঙ্গে স্তোত্র পড়ছেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর যেন সুগম্ভীর মেঘ-ডম্বর, যেন মহাকালের বিজয়-ভেরী ; সব কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে ওঠে। স্তোত্র শেষ করে হুঙ্কার দেন, আশায় আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন নাটমন্দিরের সামনে, আরতি দেখতে। সঙ্গে পুত্র, পুত্রবধূ, বহু লোকলশকর। ধনী, জ্ঞানী, সম্মানিত ব্যক্তি ইনি, আর-সকলের হাবে ভাবে তাই মনে হয়। সবাই সন্ত্রস্ত। খালিপায়ে ভিজে মেঝেতে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ! নিশ্বাস নেবার ধরনে মনে হয় অসুস্থ। একজন পিছন থেকে একটা শাল জড়িয়ে দিলেন তার কাঁধে। তিনি ঘাড় নেড়ে ফেলে দিলেন। এ-সময়ে এ-সব ব্যাপারে মন ঘোরাতে চান না। চোখ বুজে জোর-করে সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে স্তোত্র পড়ছিলেন ভদ্রলোক ; পড়তে পড়তে থেমে গেলেন, দম্ রাখতে পারলেন না। সুরের তালে কেবল দুলতে থাকলেন, এ পাশে ও পাশে।

পূজারী ময়ূরপুচ্ছের ব্যজনী দিয়ে ব্যজন করলেন, ধূপ জ্বালালেন, কর্পূরের আলোয় কেদারনাথকে প্রদক্ষিণ করলেন। কেদারনাথের আরতি সমাপ্ত হল। বেদ, গায়ত্রী, রুদ্রস্তোত্রে মুখরিত মন্দির। ধূপদীপ হাতে নাটমন্দিরে বেরিয়ে এলেন পূজারী ; দেবী পার্বতী, নন্দী ও লক্ষ্মীনারায়ণের আরতি হল। তারপর দর্শক ও ভক্তমণ্ডলীর কপালে কর্পূরারতির আধারস্থ বিভূতি লাগিয়ে সন্ধ্যাপর্ব সমাপন করে মহাকালকে তিনি প্রণাম জানালেন।

পদ্মাশ্রমে ফিরে যেতে যেতে মেজদি পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা,

শুনেছিলাম ছ-মাস যখন মন্দির বন্ধ থাকে তখন প্রকাণ্ড একটা প্রদীপে মণটাক্ ঘি ঢেলে জ্বালিয়ে রাখা হয়। ছ মাস তাতেই চলে যায়। অথচ কুলুঙ্গির ঐ ছোটো প্রদীপটাকে অখণ্ড প্রদীপ বল কেন? ওতে তো বড়ো জোর সওয়া সের ঘি ধরে।'

পাণ্ডা বললে, 'হ্যাঁ, তাইতো, সওয়া সেরই তো ধরে। ওর বেশি দরকার নেই। ঐ ঘিয়েই ছ-মাস প্রদীপ জ্বলে। ঘি পোড়ে না মোটে। দরজা বন্ধ থাকার দরুণই এটা হয়।'

মেজদি বললেন, 'তা অক্সিজেন না থাকলে আগুন তো জ্বলতেই পারে না শুনেছি।'

পাণ্ডা বললে, 'পাথরের ফাঁকে ফাঁকে চিড় আছে তো—যা চুইয়ে জল পড়ে, ঐ ফাঁকটুকুতেই প্রদীপ জ্বলার মতো অক্সিজেন মিলে যায় বোধ হয়। কী জানি, কত বৈজ্ঞানিক তো এলো গেল, এ-রহস্য কেউ ভেদ করতে পারে নি। অথচ, প্রথম মন্দির-দ্বার খোলার দিনে আমি নিজে কতবার দ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে জ্যোতির আভা দেখেছি।'

পিছনে সকলের শেষে নিরু আসছিল মাথা নিচু করে। বললে, 'বড়দি, একটা জিনিস আজ লক্ষ্য করেছ আরতির সময়ে? সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক যখন চুপ করে ঢুলছিলেন আরতির তালে তালে, পুত্র পুত্রবধূ স্বস্তি পাচ্ছিল না। ভাবছিল, কখন বুঝি বা পড়ে যান। এক সময়ে এমন ঢুলতে লাগলেন, মনে হল দাঁড়াবার আর শক্তি নেই তাঁর। পুত্রবধূ তাড়াতাড়ি স্বামীকে ইশারা করতেই সে গিয়ে ধরল বাপকে। বাপ ঝটকা মেরে রুখে উঠলেন, বললেন, আমার শরীর ঠিকই আছে; তুমি আমার দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকাও, এ সময়টুকু একটু ভগবানের ধ্যান করো।'

বড়দি বললেন, 'দেখেছি। তাইতো ভাবছি, অমন পঙ্গু শরীরে এতখানি শক্তি আসে কোত্থেকে।'

পরের দিনও কাটল—শুক্লাচতুর্দশী পার হয়ে গেল। তেরাত্রিবাস হল কেদারখণ্ডে। আজ পূর্ণিমা, রওনা হব এখান থেকে। বরফের গতিকও সুবিধের নয়, রোজই দেখি নীচের পাহাড়ে বরফ নেমে আসছে। আজ

ভোরে জানালা খুলে নিরু চেঁচিয়ে উঠল। পুব পশ্চিমের একেবারে সামনেকার পাহাড় দুটোকে রাতারাতি বরফে ঢেকে ফেলেছে। আর দেরি করা নয়, তাড়াতাড়ি বদরিকাশ্রম সারতে হবে। সকাল হতেই বাঁধাছাদা শুরু হয়ে গেছে। বড়দি ট্রাঙ্কের জামা-কাপড়গুলি সব খুলে বিছানায় পুরলেন। খালি ট্রাঙ্কে কাগজের ভাজে ভাজে ব্রহ্মকমল পুরে নিয়ে যাবেন, দেশে গাঁয়ে-প্রিয় পরিজন সবাইকে দেখাবেন, একটা দুটো করে দেবেনও ঘরে রাখতে। দু দিন যাবত মেঝেতে বিছানো শুকনো কাপড়ে শুকোচ্ছে ফুলগুলি পাশের ঘরে। কাল দুপুরে নিরিবিলিতে নিরু সে-ঘরে শুতে গিয়ে ছুটে চলে এলো। এত ফুল একসঙ্গে—নিরু বললে, 'খানিক চুপচাপ ভাবতে লেগেছি, কি, জমাট সুগন্ধে মাথার দরজাটায় যেন খটাং করে খিল এঁটে দিল কেউ। পালিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি।'

হাতের কমলটি তুলে ধরে নিরু বললে, 'জানো, এ ফুল দেখেই কেমন চেনা চেনা লাগছিল আমার, যেন দেখেছি অনেকবার। এখন মনে পড়েছে—পুরাতন বিষ্ণুমূর্তিতে বিষ্ণুর এক হাতে এই পদ্মই খোদাই করা থাকে। মাঝখানের ডাঁটা, পাতা, ফুল,—হুবহু ঠিক এই। মূর্তিতে ফুল দেখে ভাবতাম, কমল বুঝি আবার এমন হয়, জলপদ্মই দেখা অভ্যেস কিনা আমাদের; ধরে নিয়েছি, ফুলকে ডেকোরিটিভ ফর্মে ফেলতে গিয়ে শিল্পী বোধ হয় এই ভাবে তার রূপ বদলে দিয়েছে। আশ্চর্য, পাতার এই ঘোর প্যাঁচটিও অবিকল এমনিতরো খুঁদেছে তারা পাথরে।'

বড়দির ভাবনা—বন্ধ-ট্রাঙ্কে ফুলগুলি ভেপসে উঠবে না তো? দাদা বললেন, 'যে অজস্র ফুটো তোমার ট্রাঙ্কে— কিছু ভাবনা নেই— হাওয়া চলাচল ঠিক করবে।'

এই ট্রাঙ্ক সম্বন্ধে বড়দির বড়ো দুর্বলতা। হরিদ্বারে যখন মালপত্রের ওজন কমাতে হবে বলে রব উঠল, বড়দি একদিন বাজারে চললেন। সুটকেস ওজনে ভারী, আর জ্ঞান মহারাজ বলেছিলেন, 'কুলিরা পিঠ থেকে দুপদাপ ফেলবে মাল, পথে পাথরে; চামড়ার সুটকেস দু দিনে ছিঁড়ে তচনচ হয়ে যাবে। তা ছাড়া বৃষ্টিবাদলের ভাবনাও আছে। বড়ো বড়ো অয়েলক্লথ দুটো তিনটে এনেছেন তো সঙ্গে, কুলিরা যখন বিছানার মোট পিঠে নিয়ে পথ চলবে, ঐ অয়েলক্লথ উপরে ফেলে বিছানা ঢেকে দিতে হবে। নয়তো চটিতে গিয়ে আর বিছানা পেতে শুতে হবে না, ভিজে বরফ হয়ে থাকবে।'

তা ট্রাঙ্ক কিনবেন বড়দি— পাতলা হওয়া চাই, বড়ো হওয়া চাই, ভালো টিনের হওয়া চাই। দোকান ঘুরে ঘুরে শেষে এক দোকানে পছন্দ মতো মিলল। নিজের হাতেই তুলে ধরে দেখলেন তিনি, না, বেশ পাতলা। ঢাক্‌নায়, গায়ে, লাল গোলাপ আঁকা, নীল পাখি মাঝে বসা। কালো ভোম্‌রা, বেগুনি প্রজাপতি— কিছু বাদ নেই তাতে। তা হোক। নিরু বললে, 'কিন্তু, বড়দি, নতুন ট্রাঙ্কে ফুটো যে বেশ কয়েকটা।'

দোকানী বললে, 'ও কিছু না— বড়ো সুবিধেয় পেয়ে গেছ, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।'

নিরু বললে, 'তাতে আর কি, এর তলায় একটা টিনের পাত বসিয়ে নিয়ো। আর হোল্ডলটা কেটে ভিতরটা জুড়ে নিয়ো। ডাকব্যাকের ওয়াটারপ্রুফ— জল ঢুকবে না ট্রাঙ্কে।' একবার পছন্দ করে ফেলেছেন যখন, আর 'না' বলেন কী করে বড়দি? শেষপর্যন্ত সেই ট্রাঙ্ক নিয়েই বাড়ি ফিরলেন। বললেন, 'এ বেশ ভালোই হল, না? বড়ো আছে, তোমার আমার কিরণ সকলের কাপড় একটাতেই এঁটে যাবে। এর চেয়ে সস্তা কি হতে পারত?'

সায় দিতে হয় সঙ্গে সঙ্গে, 'হ্যাঁ, ভাগ্যিস্ এরকম সুবিধাজনক ব্যবস্থা হল, নয়তো মুশকিল হয়েছিল আর কি আর একটু হলে।' সেই ট্রাঙ্কই এই পথটা আসতে দড়ির বাঁধনে, আছাড়ে, দুমড়ে মুড়ে একাকার। শেষ দিন তো বাক্সের কাপড় আধাআধি ভিজেই গেল। পরের দিন একলা বড়দি কোল চেপে বসে আংটার আগুনে সেঁকে সেঁকে শুকোন সেগুলি। এ হেন ট্রাঙ্কে কাপড় না গিয়ে ফুল যায় দেখে নিরু বরং আশ্বস্তই হয়।

পাণ্ডা এল 'সুফল' দিতে। 'সুফল' না নিয়ে গেলে নাকি তীর্থে আসার ফল প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটে। প্রথমেই পাণ্ডা দাদা বড়দিকে পাশাপাশি বসাল। তাঁদের চার হাত এক করে এক অঞ্জলিতে ফুল দিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা জড়িয়ে বেঁধে মন্ত্র পড়াতে লাগল, 'উত্তরাখণ্ডে কেদারক্ষেত্রে শুক্লা-তিথিতে—'

নিরু বললে, 'দেখ, দেখ, কী সুন্দর— যেন বরকনে বসেছে সূর্যার্ঘ্য দিতে। এ কিন্তু বেশ বিধি।'

প্রসন্নবদনেই মন্ত্র পড়ছিলেন দাদা, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকুনি দিলেন। পাণ্ডা মন্ত্রের মধ্যে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে চাইছে, আমি

অমুক পাণ্ডাকে তীর্থফল প্রাপ্তির জন্য অত শত টাকা দেব। দাদা বললেন, 'তা আমি কেন বলবো? আমার সাধ্য মতো যা কুলোয় খুশিমনে আমি তাই দেব।'

দাদার অঞ্জলিতে বড়দির অঞ্জলি— ফুল রুদ্রাক্ষতে আটকা, পাণ্ডাকে অর্থ দেবেন, পাণ্ডা হাত পেতে না নিলে হাত মুক্ত হয় না। পাণ্ডা বললে, তবে অত দাও। দাদা বললেন, উঁহুঃ, পারব না। পাণ্ডা এবার দু হাতে তাঁদের দু জোড়া হাত চেপে ধরল; বলল, তবে আমার ছেলের পড়ার খরচ দাও এক বছরের মতো। অতিকষ্টে রফা হয়, দাদা হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়েন।

নিরু বললে, 'বলে দাও দাদা আগে ভাগে যে আমার বিয়ে হয় নি এখনো — কুমারী নিরাশ্রয়া; দান, দক্ষিণা কিছু দিতে পারব না।'

বড়দি তার রঙিন সিঁথির দিকে এক নজর তাকিয়ে খাটু খাটু করে ওঠেন।

সুফল নেওয়া হয় সকলের। পাণ্ডা বললে, 'এখন আর একটি কাজ আছে, —উদককুণ্ডে চল।'

সেই উদককুণ্ড— যার জলে কেবল ভৈরবনাথই পা ছোঁয়াতে পারেন, আর কারো অধিকার নেই। চৌবাচ্চার মতো একটি কুণ্ড, উপরে পাশে পাথরের গাঁথনি। পাণ্ডা বললে, 'পারে বসে ডান হাতে তিনবার জল খাও, বাঁ হাতে তিনবার জল খাও, দু হাত এক করে অঞ্জলি ভরে তিনবার জল খাও, গোমুখ করে তিনবার জল খাও, হাঁটু মুড়ে দু হাতে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে গোরুর মতো মুখ দিয়ে শুষে জল নাও।' নিরুকে বললে, 'এক গোপন খবর তোমাকে বলে দিচ্ছি। এই উদককুণ্ডের বড়ো মাহাত্ম্য। ধর কেউ ছেলে হতে কষ্ট পাচ্ছে, ডাক্তার বদ্যি কিছু করতে পারছে না, এক গণ্ডুষ এই জল খাইয়ে দাও; এক দুই তিন, ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। সব্সে সেরা দাওয়াই। এক বোতল জল নিয়ে যাও সঙ্গে করে!'

মন্দির প্রদক্ষিণ করে ফলাহারীবাবার কাছে গেলাম। বড়দির ইচ্ছে বাবাকে কিছু প্রণামী দেন, কিন্তু কী দেবেন। পাণ্ডা বললে, 'কিছু কাঠ কিনে দিয়ে যাও— বাবা ধুনি জ্বালান— কাজে লাগবে।'

সকলের কাছে বিদায় নেওয়া হল। সেদিনের সেই পূজারী— যিনি প্রসাদী ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন নিরুকে— এসে নিরুর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে

দিলেন। বললেন, 'সরস্বতী মাঈ, কেদারনাথ কো ভুলনা মত্। কেমন?' চোখ নামিয়ে নিয়ে নিরু ঘাড় হেলাল।

মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে পাণ্ডা আমাদের পথে তুলে দিল।

এবারে ফিরতি পথ— কেবলই উৎরাই। হুড়মুড় করে চলেছি সবাই। নামছি, কেবলই নামছি, কেবলই ঢালু পথ; থামবার জায়গা কোথায় যে থামব! মনে হচ্ছে, এই তো, দেখতে না দেখতে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে যাব; সেখানে থামব না, আরও দু চটি পেরিয়ে যাব আজ। নদীর তোড়ে নেমে চলেছি যেন। এই নামার প্রসঙ্গেই সূর্যপ্রসাদ বলেছিলেন দেবপ্রয়াগে, 'নামবেন কি আপনারা? ঘাড় ধরে আপনাদের নামিয়ে দেবে।' নিরু বললে, 'সত্যিই তাই, দেখছ না— যেন মনে হচ্ছে কেউ ঠেলা মারছে পিছন থেকে।'

লাল কালো দুটো কুকুর সঙ্গ নিয়েছে নিরুর। কেদারক্ষেত্রে সারাক্ষণই তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত এ দুটো। আধহাত লম্বা লোম গা ভরা, ঘাড়ের কাছেরগুলি আরো বড়ো, ঠিক যেন সিংহের কেশর। সেই রকম কেশর ফুলিয়ে লম্বা লোমের ভিতর থেকে মুখ উঁচু করে তাকাত— যখন, পুরি হাতে নিরু হেসে কুটিকুটি হত। বলত, 'তাজ্জব ব্যাপার, দেখ, কুকুরের জানি ঘি সয় না, খেলে গায়ের সব লোম পড়ে যায়; আর এখানে এরা কিরকম ঘিয়ে ভাজা পুরি হালুয়ার জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করছে।' লালু কালু নাম দিয়েছিল নিরুই তাদের। আজ ওখান থেকে রওনা হবার সময় পায়ে পায়ে চলতে চলতে এই অবধি চলে এসেছে। তাল রেখে চলেছে। নিরু দৌড়লে দৌড়য়; থামলে থামে।

অনেকটা এগিয়ে এসেছে তারা। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল নিরু, ডাইনে বাঁয়ে লালু কালু। বড়দি বললেন, 'দেখ না— দাঁড়িয়েছে, যেন সিংহ-বাহিনী।' নিরু বললে, 'বড়দি, কী করি এ দুটোকে নিয়ে। এতটা এসে গেল, ফিরবে কী করে?'

আর একদল যাত্রী উঠছে উপরে। দলে সেই কালো মতো পশ্চিমা ছেলেটি, —দেবপ্রয়াগের ঘাটে দেখেছিলাম মাথা মুড়োচ্ছে বসে। সে চলেছে আড়াইসেরী মতো একটা ঘিয়ের টিন হাতে ঝুলিয়ে, কেদারকে মাখাবে। নিজের ঘরের ঘি বোধ হয়; খাঁটী। লালু কালু টিনটা একবার শুঁকল; শুঁকে এদিক ওদিক

তাকিয়ে ধীরে ধীরে দু পা এগিয়ে এবার ছুটল ছেলেটির পিছু পিছু। বড়দি মেজদি হেসে উঠলেন। এমনভাবে নিরুকে তারা ত্যাগ করল, নিরুর মনে লাগল বৈকি একটু।

বড়দি বললেন, 'থেমো না, থেমো না, চল— পা ফেল।'

'রামবাড়া চটিতে এলাম— একটু চা ?'

'আচ্ছা— তাড়াতাড়ি করে গিলে নাও।'

বৃষ্টি— ঝরঝর ধারা। ছুটছি, না ছুটে উপায় নেই। কোমরভাঙা এক বুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে উপরে ওঠে। শুধোয়, আর কতদূর। বলি, 'এসে গেছ, পৌঁছে গেছ প্রায়।' ফিরে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সে সামনের দিকে হাত পা বাড়ায়। এবার রীতিমতো দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে গৌরীকুণ্ডে এসে পৌঁছলাম। সকাল ন-টায় রওনা হয়েছি, এখন বেলা দুটো।

মেজদি কঁকিয়ে ওঠেন, 'ওরে বড়দি রে, আমি মরেছি! পা দুটোতে বিষ বেদনা— পেকে যেন ফেটে পড়বে এখুনি।'

সকলেরই সেই অবস্থা। একবার বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। উঠবার কথা মনে হলে মাথায় বাজ পড়ে। উঠে বসতে গেলে মনে হয় যেন শেষ নিশ্বাসটা গলার কাছ অবধি এসে আটকে আছে, এখুনি সেটা বেরিয়ে যাবে। একে অন্যকে তেল মাখালে উপকার হবে কি কিছু? কিন্তু পায়ে হাত লাগাই সাধ্য কি. 'বাপরে' 'মারে' ডাক ছাড়তে হয়। থাক্, দরকার নেই। কোনো মতে এখন দুটি খেয়ে শুয়ে থাকি। কিন্তু এর নিয়মই যে এই, ব্যথা নিয়েই চলতে হয়, নয়তো ব্যথার উপশম হয় না। কথাটা শুনেও নিরু শোনে না, মট্‌কা মেরে পড়ে থাকে।

বিকেলেও আজ নড়া গেল না। বিছানা ছেড়ে কেউ উঠতে পারে না। রাতও কাটল এইভাবে। বৃষ্টি ধরে গেছে, স্বচ্ছ আকাশ, পূর্ণিমার আলোয় সারা আকাশ হেসে উঠছে।

শেষ রাত্রে উঠে রওনা হলাম। বরফের পাহাড় বোধ হয় কাছেই, বাঁক ঘুরতে গিয়ে মোড়ের মাথায় মুখেচোখে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগে। ভোর হল, আলো ফুটল, গাছের মাথা বেয়ে নামতে নামতে সে-আলো নীচে এসে পড়ল। ঝাউ গাছটার গোড়া ঘেঁষে এক মিনিট জিরোই। নীল আকাশের গায়ে ধব্‌ধবে বরফের চূড়া— চোখ ঠিক্‌রে যায়। মনে হল একছুটে গিয়ে

একবার দেখে আসি কেদারক্ষেত্রে, আলোর ঝলমলানির কী উৎসব আজ সেখানে।

পথে কয়েকটা সজারুর কাঁটা পেলাম, তুলে থলিতে পুরলাম। সেলাইয়ের কাজে লাগবে। সজারুর কাঁটা দিয়ে কাপড় ফুটো করে একরকমের এমব্রয়ডারির কাজ হয়— ছেলেবেলায় করেছি। সে-ফ্যাশান এখন উঠে গেছে।

আগে আগে চলছিল নিরু। আচমকা ধাক্কা খাই, নিরু পিছু হটছে। সামনে পথ ধসে গেছে— হুড়হুড় করে জল বইছে সেখান দিয়ে। ক'দিন আগে এই পথ দিয়েই গেছি— এই ক'দিনেই এমন অবস্থা? নিরু বললে, 'হঠাৎ পাহাড়-পথ ভেঙে ঝরনা ছুটেছে, রাতবিরেতে লোক পড়ে মরবে যে এখানে। দু পা আগেও টের পাওয়া যায় না, পথের মধ্যে এই ব্যাপার।'

দেখি পাশ থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উপর দিকে একটা পা-চলা পথে চলে গেছে। সেই পথেই উঠে গেলাম। এ ক'দিনে পথ-চলতি লোকেরাই এ-পথটি চলে চলে তৈরি করে ফেলেছে। ঘুর হল, কিন্তু আবার রাস্তায় এসে পড়লাম।

দুপুরে বদরপুর। অনেক দিন পরে রোদ পাওয়া গেছে। ময়লা কাপড়গুলি কেচে চালের বাতায় গুঁজে টান করে শুকোতে দিলাম। কাদায় কালিতে মাখা জুতোগুলিও সাবান ঘষে ধুয়ে রোদ্দুরে রাখলাম। এ ক'দিন জুতো ভিজেছে আর উনুনের উপরে শুকিয়েছি— ছাইয়ে কয়লায় মাখামাখি। চুলও ঘষেছি। বেশ হালকা লাগছে। রাস্তার দু পাশে লম্বা দু সারি চটি। পুবের দিকের চটি ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিলাম। সারা দুপুর রোদ পাওয়া গেল। দাওয়ায় বসে দু পা মেলে পা শুকোচ্ছি, চুল শুকোচ্ছি, শরীরের আড় আলিস্যি ভাঙছি। একটু পরেই তো উঠে চলতে হবে আবার। সামনের চটিতে একদল মারোয়াড়ী যাত্রী ছাতু গুলে মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা করছে।

মেজদির অবস্থা অচল। বলেন, 'ফেলে যাও পড়ে থাকব এখানে, তা'ও সই, তবু নড়তে পারব না।'

আসবার আগের রাত্রে কেদারক্ষেত্রে পন্নাশ্রমের দোতলায় উঠতে কেমন করে মেজদির পা হড়কে যায়। প্রথমটায় আমল দেন নি বিশেষ। সেই পায়েই নেমে এসেছেন এতখানি পথ। পায়ে কোমরে এখন দারুণ যন্ত্রণা। বলেন, 'পা ফেলব কি মাটিতে— মাথা অবধি ঝন্‌ঝন্ করে উঠছে।'

ডাণ্ডি পাওয়া যায় না এখানে। শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য একটি কাণ্ডি ঠিক করা হল। কাণ্ডি প্রায় প্রতি চটিতেই একটি দুটি পাওয়া যায়। একা কুলি খালি ঝুড়ি পিঠে নিয়ে এ জায়গা সে জায়গা ঘুরে বেড়ায় নিজেদের খুশি মতো। ডাণ্ডি চলে চারজনের চারমত এক হয়ে! সে-বস্তু তাই সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তা ছাড়া দরেও কাণ্ডি সুবিধের, ডাণ্ডির চেয়ে।

নিরু এগিয়ে দাঁড়াতেই, কাণ্ডিওয়ালা তাকে দেখে ঝুড়ি পিঠে তুলে ফিরে চলে যায়। মন বাহাদুর হাঁকে, 'আরে, ঐ মাঈজী নয়—।'

ওজনে ভারী নিরু হাসে, বলে, 'গুরু না করুন, পথে ঘাটে অসুখ হয়ে পড়লে আমাকে বওয়াও তো এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে দেখছি।'

মন বাহাদুর বললে, 'ডরো মত্ মাঈজী, গত বছর তোমার চেয়েও মোটা এক মাঈজীকে আমি কাণ্ডিতে চাপিয়ে পিঠে করে নিয়ে গেছি। এই এতখানি শরীর তার, ঘোড়ায় চেপেই যাচ্ছিলেন, বদরিনাথের পথ পর্যন্ত গিয়ে এমন গায়ে গতরে ব্যথা হল, স্বামীকে বললেন, "এই বসলাম, যত টাকাই লাগুক ডাণ্ডি কাণ্ডি জোগাড় কর।" আমি সে-দলে কুলি ছিলাম, আমার মোটটা অন্য লোককে দিয়ে চটি থেকে ঝুড়ি কিনে আমিই তাকে পিঠে তুলে নিলাম। আমাকে তিনি ডবল বকশিশ দিয়েছিলেন।'

বড়দি বললেন, 'থাক, ডবল তিন ডবল বুঝি না। তুমি মাল নিয়েই চল। মাঈজীর কথা সময় এলে ভাবব।'

অনেক যাত্রী চলেছে আজ কেদারের উদ্দেশ্যে। অনবরতই এক একটি দলের মুখোমুখি হচ্ছি। তারা উঠছে, আমরা নামছি। জিজ্ঞেস করে, 'ওহী সে আতী হো? ধন্য হো তুম্ ধন্য হো।' কেদার দর্শন করে আসছি, ধন্য হয়ে গেছি। নিরু বলে, 'বড়ো ভালো লাগে এদের এই সুরটি। আপনা হতে প্রাণে যেন প্রেমভক্তির পরশ পাই, অকারণ আনন্দে মন ছেয়ে যায়।'

ধান কাটছিল মেয়ে, পিঠে ঝুড়ি বেঁধে পাহাড়ের উপরে; চিৎকার করে ডাকল কাকে—নীচের বসতিতে খচ্চরে ফসল খেয়ে ফেলছে। পাহাড়ি মেয়ের ডাক পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে ও-হো—করে ছুটে বেড়ায়।

ফের ফাটাচটি আসি। দোকানীর সঙ্গে যাবার পথেই ভাব হয়ে গিয়েছিল। তার দোকান থেকে উলের চাদর কিনলাম। চৌকিদার তার গাছের বিন টমাটো খেতে দিল, পয়সা নিল না। দোকানী খেতে দিল শশা—ঘর

থেকে এবার বড়ো দেখে দুটো আনিয়ে রেখেছিল। আধ মাইল উপরে তার বাড়ি। রাত্রে গায়ে দেবার জন্য নতুন কম্বল বের করে দিল। তার চটিতেই আশ্রয় নিয়েছি এ রাত্রের মতো। তত শীত নয় এখানে।

পূর্ববঙ্গের মহিলাটি পাশেই শুয়েছেন। ঘুম আসছে না, কাতর কণ্ঠে দুঃখ জানাচ্ছেন, 'প্রভু, এনেছ যখন, আর ফিরিয়ে দিও না, তোমার কাছেই রেখে দিও এ-যাত্রা।'

পূর্ববঙ্গ পাকিস্থান হল, সর্বস্বান্ত হয়ে হিন্দুস্থানে চলে এসেছেন। শোক ভুলতে পারেন না, আশায় আশায় এতদূর এসেছেন।

বলি, 'ভুলে যান সে-সব কথা, আবার নতুন করে ঘর বাঁধুন, নতুন সংসার পাতুন।'

বললেন, 'যে-ঘর ভেঙে এসেছি মা, আর শখ নেই ঘরের। সব আশা আকাঙ্ক্ষা তারই সঙ্গে রেখে দিয়ে এসেছি।'

নিরু বললে, 'সত্যি, আপন ঘর যখন পরের হয়ে যায় সে বড়ো চরম দুঃখ। দু দিনের বাসার জন্যই মন কেমন করে। সহজে ভোলা যায় না। এই যে ক-রাত্তির রইলাম কেদারে, চলে এসেছি, মনটা কেবলই খচখচ করছে সেই ঘরটুকুর জন্য। ভাঙা-বাসার টানও কি কম? মানুষ তো মানুষ, পশুপাখিতেও এমন দেখেছি। স্বামী সেবার রাজধানীতে কাজ নিয়ে এলেন, আমিও সঙ্গে এলাম। বাড়ি পাওয়া যায় না, কী করি, হোটেলেই আছি। তেতলায় থাকি, নীচে খাবার ঘর। সিঁড়ি দিয়ে নামতে উঠতে হয় দিনে কতবার। মাঝখানে ক'দিনের জন্য দেশে গেলাম, ফিরে এসে দেখি একতলার সিঁড়ির নীচে সাদা দেয়ালের গায়ে কালো কালো ফিঙের মতো পাঁচ ছটা পাখি বাসা বেঁধেছে। অদ্ভুত পাখিগুলি। এমনিতে সচরাচর দেখি পাখিরা বাসা বাঁধে কাঠকুটো দিয়ে, এরা বেঁধেছে পাখির পালক দিয়ে। হোটেলেরই জবাই করা মুরগীর পালক তুলে এনেছে বোধ হয়। সেইগুলিই দেয়ালের গায়ে আটকে আটকে বাসা তৈরি করেছে। বসার ধরনও বড়ো মজার। মসৃণ দেয়ালে টিকটিকির মতো থাবা মেরে লেগে থাকে। কী করে আঁকড়ে ধরে, কী জানি। স্বামী বললেন, সোয়ালো পাখি। বললাম, তাই সাহেবী মেজাজ, পালকের বাসা চাই।

'উপরে নীচে উঠতে নামতে যখনই চোখ তুলি, দেখি পাখিগুলো বাসার

মুখে বুক চেপে বসে থাকে। ডিম পেড়েছে, তা দেয়। দেখতে দেখতে উঠি, দেখতে দেখতে নামি। এ যেন একটা অভ্যাসের মতো হয়ে গেল।

'ক'দিন যায়। একদিন ভোরে নীচে চা খেতে নামব, দেখি সিঁড়ির মুখে পাশের ঘরের মেমের বাচ্চার আয়াটা চেঁচামেচি জুড়েছে। কী ব্যাপার? না, মিস্ত্রিরা দেয়ালে মই লাগিয়ে চুনকাম করছে, পাখির বাসাগুলি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে ফেলে দিয়েছে। বলে, হোটেলওয়ালা বলেছে সব সাফ করতে। দুটো বাসা কুড়িয়ে এনে আয়াটা হাউ মাউ করে ওঠে। বলে, দেখ, বাচ্চা ফুটেছে ভিতরে—

'বলি, কী আর করবে, সুতো দিয়ে বেঁধে রেলিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখ, মা এসে এসে খাবার দিয়ে যাবে।

'দুপুরে দেখি সেটাও কোন ফাঁকে তারা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে রইল। আহা, মায়েরা আজ সারাক্ষণ না জানি কত খুঁজে বেড়াচ্ছে বাচ্চাদের। ঘুরে ফিরেই আসছে হয়তো। কিন্তু আর কি বাসা বাঁধবে ওখানে। ভয় পেয়ে গেল যে ওরা।

'রাত্রে খেয়ে উপরে উঠছি। জানি, আজ আর দেখবার কিছু নেই, তবু অভ্যেস বশে আপনা হতেই মুখ তুলে উপরে তাকালাম। দেখি, ঝক্‌ঝকে সাদা দেয়ালে সেই কালো কালো পাখিগুলি। যেখানে তাদের বাসা ছিল, ঠিক সেইখানটিতে এসে দেয়াল আঁকড়ে তারা বসে আছে।

'মনটা যেন হু-হু করে উঠল। ভেবে পাই নে কিসের এই টান। অন্যের নির্মম হাতে আপন বাসা বারে বারে ভেঙে যায়, তবু কি তার মায়া কাটে না?'

থেকে থেকে কী যে হয় নিরুর, কেমন গুম হয়ে যায়। কারুর সঙ্গে কথা কয় না, আপন মনে থাকে, লোক এড়িয়ে চলে। বুঝতে পারি নে ওকে। নিরু বলে, 'আমিই কি ছাই বুঝতে পারি? এক এক সময়ে নিজের মনে ডুব দিতে যাই, দেখি অতল কালো গহ্বর। ভয়ে সরে আসি। এ কি সহজ জিনিস? এই তো কিছুক্ষণ আগে, অনেকটা এগিয়ে এসেছি, পিছু-দলের নজরছাড়া হতে ভাবনা জাগল, এগুতে সাহস হল না; পথের ধারের ঐ কালো পাথরটায় বসে পড়লাম। কাছেই বসতি, একটি মেয়ে মাটি কেটে

তুলে ফেলছে পারে। শুধোলাম, কী হবে? সে বললে, ঘর বানাবে। ঘর বানাবে, মাটি তুলে ফেলে পাকা ভিত গাঁথবে আগে। ভাবলাম, এমনিতরো যদি ভিত পাকা করে নিতে পারতাম, তা হলে বুঝি বা আর কোনো ভয় থাকত না।

ফাটা থেকে মৈখণ্ডার পথের দু ধারে বসতি, সবুজ সবজি, ক্ষেতভরা লঙ্কা। লাল টুকটুকে লঙ্কা, যদি কয়েকটা তুলে নিতে পারতাম।

একটি মেয়ে হন্‌হন্‌ করে পিছন থেকে সামনে এসে পড়ল। বছর আঠারো উনিশ বয়েস; নথ, বালা, খাড়ু, কম্বল পরা ফর্সা সুন্দরী। নিরু বলে, 'এ পথে যুবতী বেশি দেখি না কিন্তু। পাহাড়ি মেয়েরা বোধ হয় মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো যৌবনে এসেই হেলে পড়ে, দু'দণ্ড স্থির থাকে না। তারপরেই বলিরেখা ফুটে ওঠে, যৌবনের আর কোনো চিহ্নই থাকে না। কঠিন পাথরে কঠিন জীবন যাপন; যৌবন, সে ঐ পাহাড় ফুঁড়ে ফোটা হলুদ ফুলটির মতোই ক্ষণস্থায়ী। মনে পড়ে, সেদিন যখন রুদ্রপ্রয়াগে আসছিলাম বাসে, মুখোমুখী সিটে বসে ছিল এক এদেশী দম্পতি। ভদ্রলোক কোনো স্কুলের শিক্ষক, বৌকে নিয়ে কর্মস্থানে চলেছেন। কচি বৌ'র কচি মুখখানি বড়ো ভালো লাগছিল। তাকিয়ে আছি, এক সময়ে কোলের উপর রাখা তার হাত দু খানায় দৃষ্টি পড়ল। শক্ত, রুক্ষ, স্ফীত আঙুল, যেন চল্লিশ বছরের কাজকরা হাত। মুখখানি কোমল, হাত দুটি কর্কশ; দেখে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল।'

নিরু পা চালিয়ে মেয়েটির সঙ্গ ধরে, মেয়েটি গতি শ্লথ করে নিরুর সঙ্গে চলে। মুহূর্তেই আলাপ জমে যায় দু জনের। মেয়েটির নাম 'পাতি', মৈখণ্ডায় তার শ্বশুরবাড়ি। চলেছে উখীমঠে, মার কাছে। মার অসুখ শুনেছে বারো চোদ্দ দিন যাবত। সঙ্গে দশ এগারো বছরের একটি ছেলে, পাতির ছোটো দেওর। দেওরের পিঠের থলিতে ভুট্টা, শশা, তুরই আর ক্ষেতের কিছু গম। মার জন্য নিয়ে চলেছে। পাতি বললে, 'আমাদের ক্ষেতে "ছেমী" "গোদরে" "করেলে" "অরমেদ", "কাঁকড়িয়া", "মুংড়ি" সব রকম সবজি হয়; রুটির জন্য "অখোর" "মনহুয়া" "জোয়োয়া" "কোনী", তা'ও হয়। কিন্তু এ-বছর বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে। জেঠ্‌কি মায়না মে "সোলে" আয়া— সব "গেউ" খা লিয়া। ভুখ্‌মে মরতা সব কোই।' জ্যৈষ্ঠমাসে পঙ্গপাল এসে সব গম খেয়ে নিয়েছে। লোকে এখন খিদেয় মরছে। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে নানা সুখদুঃখের

কথা চলে তাদের। নিরু শুধোয় এটা কী গাছ, ওটা কী ফল। পাতি বলে— 'এ হিঁসর্', 'এ চোলা', 'এ কিভোর্', 'এ মোল'— খেতে খুব মিষ্টি— পাকলে কালো হয়।

আবার সেই গন্ধ। পথে যেতে অনেকবার পেয়েছি। মেজদি বলেন, 'আখরোট পেকেছে রে, তারই গন্ধ।'

পাতিকে জিজ্ঞেস করে নিরু, 'এই গন্ধ কোন গাছের?' পাতি এদিক ওদিক তাকিয়ে ছুটে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল, লাফিয়ে একটা বড়ো গাছ থেকে খানিকটা ডাল ভেঙে নিয়ে তেমনি ভাবেই নেমে এল আবার। জাম-পাতার মতো পাতা, পাতার বোঁটা ঘেঁষে ডালের গায়ে ছোটো ছোটো ফুল। ঠিক যেন পাকা কাঁঠালের ছোট্ট কোয়া এক একটি, তেমনি রং তেমনি গড়ন; সুমিষ্ট সৌরভ। পাতি বললে, 'এ শিলিঙ্গা ফুল। ফল হয় না এর।' ডালটি খাতার পাতায় চেপে রেখে দিল নিরু।

নানা বসতি পেরিয়ে চলেছি। ঘরে ঘরে শীতের জন্য খাদ্য সংগ্রহ চলছে। পাথরের উঠোনের মাঝখানে একটা পাথরে গর্ত করা, সেটাই ওদের উদূখল। দানা ভাঙছে মেয়ে বৌ। দানা ছিটকে না যায় তার জন্য একটা তলাখসা ঝুড়ি বসিয়ে নিয়েছে গর্তটার উপরে। দুটো ঘুঘু ধান খায় শূন্য ক্ষেতে খুঁটে খুঁটে। এদিকে ওদিকে কয়েকটা মুরগীও নজরে পড়ে।

পাতির মাথায় লাল আলোয়ান। গরম লাগছে, ঘাড়ের উপর ঝোলা আলোয়ানের কোণগুলি তুলে মাথার উপরে জড় করে দিল, তবু মাথা থেকে কাপড় নামাল না। পাহাড়ি মেয়েরা সবাই এমনিতরো এক একটা আলোয়ান মাথায় চাপিয়ে রাখে দেখেছি। নিরু বললে পাতিকে, 'আলোয়ানের স্তূপ মাথায় চাপিয়ে রাখ কেন তোমরা সারাক্ষণ?' পাতি বললে, 'এই আমাদের রেওয়াজ। শ্বশুর শাশুড়ী বাইরের লোক সবার সামনে মাথায় চাদর না থাকলে নিন্দা হয়।' হেসে বললে, 'খালি ঘরে স্বামীর কাছে অবশ্যি দিই না।'

বিয়ে হয় এদের অল্প বয়সে। পাতি বললে, 'মেয়েপক্ষের সঙ্গে বরপক্ষের যখন পাকাপাকি কথাবার্তা হয়ে যায়, শুভদিন দেখে বরপক্ষের লোক গিয়ে নথ পরিয়ে মেয়েকে মেয়ের বাড়ি থেকে নিয়ে আসে। নথ পরালেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। তারপর বরের বাড়িতে লোকজন আসে, খুব খাওয়া-দাওয়া হয়। অনেক কিছু রান্না হয় সেদিন— পুরি, পাকোরি, শাক, ডাল, বেসনের মণ্ডা।'

চলতে চলতে নানা বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে পাত্তি কথা বলে। চেনা, জানা আত্মীয় তারা। ঝরনার জলে দু পায়ে কম্বল চেপে দাঁড়িয়ে ছিল এক রমণী ; তোড়ে জল এসে ধাক্কা খাচ্ছে কম্বলে, ময়লা কম্বল সাফ হয়ে যাচ্ছে। পাত্তির গ্রাম-সম্পর্কে কাকীমা। পাত্তি চলেছে মার ঘরে। মা সত্‌মা। পাত্তি বললে, 'আমার বাবার চার বিয়ে ছিল। আমার মা তিস্‌রি সাদিকি থী। ওতো মর গিয়া। এ মা চৌথা সাদিকি। আমার শ্বশুরেরও তিন বিয়ে। এক শাশুড়ী মরে গেছে, দুজন এখনো আছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই দু-চার-পাঁচ-সাত বিয়ে করে। এই-ই রেওয়াজ, কেউ কিছু মনে করে না।'

নিরুর অদম্য কৌতূহল। বলে, 'সতীনরা সব এক সঙ্গে থাকে, ঝগড়া করে না?'

'তা করে মাঝে মাঝে। স্বামী মেরে সায়েস্তা রাখে।'

'থাকেও একই ঘরে?'

'না। এই যেমন আমার শাশুড়ীরা, দিনে একই ঘরে থাকে, রাত্রে এক একদিন এক একজন শ্বশুরের ঘরে ঘুমোয়। আমাদের দেশে গউ, ভঁইস, ক্ষেত খামারি— অনেক কাজ কিনা? বেশি বৌ না থাকলে এত কাজ করবে কে? যার যত বেশি ক্ষেত খামারি তার তত বেশি বৌ। আমার বাবার অনেক ক্ষেত খামারি ছিল।'

পাত্তির স্বামী কাঠের মিস্ত্রি, চাষ বাস আছে, বন আছে। বছরে তিন মাস কাঠ চালান দেয়। সচ্ছল অবস্থা। পাত্তি তার প্রথম স্ত্রী।

নিরু বললে, 'তোমার স্বামী যদি আবার বিয়ে করে, কী রকম লাগবে তোমার?'

মুখখানা অল্পক্ষণের জন্য মলিন হয়ে উঠল পাত্তির। পরে হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, সে আর বিয়ে করবে না।'

নিরু অন্য কথায় নামে। পাত্তির স্বামীর নাম মোহনলাল। দেড় বছরের মেয়ে আছে একটি। ঘরে রেখে এসেছে, নাম বাচনদ। মেয়ের কথায় পাত্তির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আপন মুখের সামনে ডান হাতের চেটোটা মেলে বললে, 'এই রকম মুখ মেয়ের, খুব খুবসুরত।'

মানে বোধহয় চ্যাপ্টা, ধবধবে। কি জানি, কোন সৌন্দর্যের তুলনা দিল পাত্তি। নিরু কিন্তু খুব খুশির হাসিই হাসল।

চটিতে চা খেয়ে নিলাম। পাতি ইতস্তত করছিল, নিরুর পিড়াপিড়িতে সেও চা খেল। খেয়ে ঝরনার জলে গ্লাসটা ধুয়ে নিয়ে এল। বললে, 'আমরা কাহার, আমাদের ঝুটো দোকানীরা ধোবে না।'

নালাচটি থেকে নিচু পথে নেমে মন্দাকিনীর তীরে এলাম। এখানে উত্তরাখণ্ড বিদ্যাপীঠ, বিদ্যাপীঠেরই উপযুক্ত স্থান। ছাত্ররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোধ হয় স্নান-আহারের সময় এখন। মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে এপারে এলাম। এখান থেকেই মন্দাকিনীকে ত্যাগ করলাম আমরা। এখন থেকে অলকনন্দার সঙ্গ ধরতে হবে।

কড়া রোদ উঠে গেছে। উৎরাই থেকে আবার চড়াই। কষ্ট হল খুব; গাছের ছায়ায় শুয়ে বসে উঠতে থাকলাম। উখীমঠে এলাম। বর্ধিষ্ণু বসতি, দালান কোঠা, মঠ মন্দির, বাঁধানো সড়ক; নিরু বললে, 'এ যে দস্তুরমত ছিল স্টেশন।'

পাতি যাবে আরো এগিয়ে দূরের বসতিতে। আঙুল দিয়ে দেখাল, 'ঐ আমার গাঁ।'

নিরু তার হাতে দুটো টাকা দিয়ে বললে, 'ছ দিন পরে যখন ফিরে যাবে শ্বশুরঘরে, এই উখীমঠ থেকে তোমার মেয়ের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যেয়ো।' জিব কামড়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে পাতি দাঁড়িয়ে রইল পথের মাঝখানে। দোতলা চটির সিঁড়ি বেয়ে নিরু উপরে উঠে গেল।

উখীমঠের প্রকৃত নাম শোনিতপুর। এক সময়ে এখানে বান-রাজার রাজধানী ছিল। স্থানটি এখনও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শীতকালে কেদারনাথ যখন তুষারাবৃত হয়ে ধ্যান-সমাধিস্থ থাকেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্যে এখান থেকেই পূজার্ঘ্য অর্পিত হয়।

পাণ্ডা বললে, 'ছ মাস কেদার উপরে থাকেন, ছ মাস উখীমঠে নেমে আসেন।'

নিরু বললে, 'এ যে দেখছি দিল্লী-সিমলা ব্যবস্থা।'

বড়দি বললেন, 'কী করবে তা নইলে? বরফে ঢেকে যায় দেশ, পূজারীরা থাকে কী করে? অথচ দেবতার পুজো বাদ দিলে চলে না— তাই এখান থেকেই পুজো দিতে হয়।'

চটির পাশেই মন্দির। মন্দিরেই রাওয়লজীর বাড়ি। বাড়ি তো নয়,

প্রাসাদ। ভিতরেও রাজকীয় ব্যবস্থা। কিন্তু এখন আর রাওয়লজীর সেই সর্বেসর্বা প্রতাপ নেই। আসল ক্ষমতা সরকার নিয়ে নিয়েছেন, রাওয়লজী বেতনভোগী পূজারী মাত্র। বড়দি বললেন, 'দক্ষিণ দেশের ব্রাহ্মণরা খুব নৈষ্ঠিক। শুনেছি, সেই জন্যই নাকি শঙ্করাচার্য সেখান থেকে রাওয়ল এনে মন্দিরের পূজার ভার তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।'

নিরু বললে, 'কেদারবদরীর রাওয়লদের নিয়ে কত কাহিনী শুনেছি, রাজ রাজড়াদেরও এমন দাপট ছিল না।'

মন্দিরের পাণ্ডা আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ। দুই দিকের দেয়ালে বড় বড় দর্পণ। ঘরের একদিকে সোনারুপোর কারুকাজ করা একটি ঝলমলে সিংহাসন। পাণ্ডা বললে, 'এই হল কেদারের গদি।' তার পাশে প্রকাণ্ড এক রুপোর থালায় রৌপ্য-নির্মিত মুখ দেখিয়ে পাণ্ডা বললে, 'আর এই হল বাবার মুখারবিন্দ। আরতির আগে এইটে নিয়ে চাপিয়ে দেয় কেদারের উপরে। এই রকম আরো চারটি মুখ আছে— তুঙ্গেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, কল্পেশ্বর, আর রুদ্রেশ্বর।' সূর্যপ্রসাদ বলেছিলেন, উত্তরাখণ্ডে পাঁচ বদরী পাঁচ প্রয়াগ, পাঁচ কেদারেশ্বর আছেন। এঁরাই তাঁরা, পাঁচ কেদারের পাঁচ প্রতিকৃতি।

ভিতরে ছোট ছোট ঘরে হরেক দেবদেবী। দেবী পার্বতীর মন্দিরের সামনের আঙিনায় একটি বেদী। পাণ্ডা বললে, 'এ হল উষা-অনিরুদ্ধের বিবাহবেদী।'

নিরু বললে, 'তা কী করে হয়? পুরাণে শুনি— উষা-অনিরুদ্ধের বিয়ে হয়েছিল গান্ধর্ব মতে, লুকিয়ে।'

বড়দি বললেন, 'তা তো ঠিকই, কৃষ্ণ তখন পুত্রপৌত্র নিয়ে দ্বারকায় দ্বারকাধীশ হয়ে বিরাজমান। বানরাজ-কন্যা উষা স্বপ্নে দেখলেন কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে। দেখেই আসক্তা হলেন। প্রিয়সখী চিত্রলেখা ভাল ছবি আঁকতে পারত, তাকে দিয়ে আঁকা ছবি বেচতে পাঠিয়ে নানা কূট কৌশলে অনিরুদ্ধকে নিজ বিলাস-ভবনে এনে প্রেম-বন্ধনে বাঁধলেন। পরে এই নিয়ে দুই রাজত্বে মারামারি কাটাকাটি, কত কিছু। বিষ্ণুবিরোধী বানরাজা মেয়ের বিবাহের কথা জানতে পেরে অনিরুদ্ধকে বিনাশ করতে চাইলেন। খবর পেয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বলরাম কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন সবাই এলেন অনিরুদ্ধের পক্ষ নিয়ে। এদিকে

বান ছিলেন মহাদেবের বরপুত্র, পুত্রের পক্ষ নিয়ে মহাদেবও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। বুঝে দেখ ব্যাপারখানা। এতই যদি কাণ্ড, তবে মৌলিক প্রথায় বিবাহবেদী কে সাজাল ?'

'সখীরাই বোধ হয় এইখানে বসিয়ে তাদের গলার মালা বদল করিয়ে দিয়েছিল।'

মন্দির ঘুরে তাড়াতাড়ি চটিতে ফিরলাম। বিকেলে আবার রওনা দেব। স্নান খাওয়া সেরে বিছানা বেঁধে তৈরি, চারদিক কালো করে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল। আজ আর এ-বৃষ্টি থামবার লক্ষণ নেই। খানিকক্ষণ বাঁধা বিছানার উপরে বসে থেকে যে যার বিছানা খুলে আরাম করে শুয়ে পড়লাম। সকলেরই আজ বড় ক্লান্ত লাগছিল। যাওয়া হল না, তাতে খুশিই হল সবাই। দোতলার খোলা বারান্দায় শুয়ে আছি। দূরে বহুদূরে বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী, দীর্ঘ দৃঢ় ঝাউয়ের সারি, আকাশ-ভরা কালো মেঘের মন্থর গতি, বাদল-ধারার আড়ালে যেন মেঘলোকের এক স্বপ্ন নগরীর মত দেখাচ্ছে। অলস হৃদয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে নিরু বললে, 'কে জানে, আমিই সেই সে-জন্মের নির্বাসিতা যক্ষদয়িতা কিনা। নয় তো মনের মধ্যে এত তোলপাড় কিসের ?'

সন্ধ্যা পার হয়ে রাত এগিয়ে এল। প্রহরের পর প্রহর কাটল। শুকতারা দেখা দিল পুব গগনে। আমরা উঠে উখীমঠ ত্যাগ করে চললাম। কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার চাঁদ পশ্চিম আকাশ থেকে আলো ফেলতে লাগল চলতি পথে, হিমে ভেজা টিনের চালে। পায়ের কাছে দৃষ্টি নামিয়ে পথ চলছি। আগে আগে চলেছে নিরু, তার পিছনে আমরা। কুলিরা আসবে পরে, রোদ উঠলে। একটু পথ আসতে ওদের আর কতক্ষণ লাগবে। ডাইনে বাঁয়ে তাকাই, দুধারে শস্যক্ষেত। চলার পথ তো এত সরু হবার কথা নয়। তবে ? নিরু আরো এগিয়ে যায়, আরো। এগতে এগতে শেষটায় গিয়ে পৌঁছয় এক কাঠের সিঁড়ির সামনে। এই সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলা একটি দোচালা কাঠের ঘরে। কোথায় যেতে কার ঘরে এসে উঠলাম ! ঘুরে দাঁড়াই, বড়দি এবার আগে আগে চলেন, নিরু পিছনে। সেই সরু পথ ধরেই ফিরে এসে আবার সড়কে পড়ি। কাণ্ডিতে বসে মেজদি ভয়ে জবুথবু, কুলির পিঠে ধীরে ধীরে আসছিলেন, হঠাৎ আমাদের না দেখতে পেয়ে কুলিকে বললেন, 'এখানেই অপেক্ষা কর। অন্য কুলিরা আসুক, একসাথে যাব।'

মেজদির কুলি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল, আমরা অনুসরণ করলাম। অনেকখানি সময় ও শক্তি বৃথা ব্যয় হল। তা হোক, হিমেল হাওয়ায় কারো তেমন ক্লান্তি লাগছে না।

পরিষ্কার আকাশে বরফের সারি ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে সকালের আলোর ছোঁয়া লাগল পর্বতের শুভ্র শিরে। ফিরে ফিরে দেখি। যেন আগুন-গলা স্বর্ণসিংহাসনে গৌরী গিয়ে উঠে বসলেন সোনার সিঁড়ি বেয়ে। সর্বোচ্চ শিখরে তাঁর মাথার মণিটি জ্বলতে থাকে।

শুকতারা অদৃশ্য হয়।

নীচে উপরে বসতির লোক জাগে। উনুন ধরায়, চাল ফুঁড়ে ধোঁয়া ওঠে। কি জানি, পাতির মায়ের ঘর কোন্‌টা। গোরু মোষ ঘোড়া ছাগলের গলার ঘণ্টা বাজে। দুধ দোয়ায় পাহাড়ি বৌ, কাছের চটিওয়ালার দোকানে দিয়ে আসবে। ভোর না হতে চলতি যাত্রীরা চা খেতে এসে দাঁড়াবে— তার আগে দুধ চাই দোকানীর।

বিরাট বিশ্ব— মহাধ্যানের গম্ভীর মূর্তি।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুরে ঘুরে চলি।

নিরুর গোড়ালির ক্ষতে ব্যথা লাগে। বলে, লাগুক। প্রতি পদক্ষেপে ক্ষতের উপরে জুতোর ঘষা খায়। মারোয়াড়ী বুড়োর কথা হয়তো মনে পড়ে তার। শক্ত নাগরাই পরে চলেছে আগে আগে। নাগরার পিছনের উঁচু কঠিন কোণটার খোঁচা লাগছে, আর গোড়ালি থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। বুড়ো চলেইছে। বড়দি তাকে ডেকে বসিয়ে কাঁধের ঝোলা থেকে টিনচার বেঞ্জিন বের করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। বুড়ো কী খুশি। দু হাত তুলে আশীর্বাদ করলে। বললে, 'কতদিন থেকে দুই গোড়ালি এমনি ধারা হয়ে আছে ; তাই নিয়েই হাঁটছি, কী করব ?'

নিরু বলে, 'আজ বুঝছি, ব্যথার স্থানে ব্যথা দিয়ে তবেই হয়তো বেদনার লাঘব করা সম্ভব। আঘাতে আঘাতে ক্ষতস্থানের চেতনা অবশ হয়ে এসেছে, এখন আর আগের মত অতটা লাগছে না।'

তিন মাইল দূরে কন্থাচটি। চা খাই, প্যাঁড়া খাই। খোয়া কিনি পোয়াটাক— পথের সম্বল। রুদ্রাক্ষ গলায় দেবীভক্ত সাধু ফেরেন বদরিকাশ্রম থেকে। থাকেন গুপ্তকাশীর নীচে। প্রতি বছর কেদারবদরীতে যান। দীর্ঘ,

কৃশ পুরুষ। পিঠে বাঁধা কমণ্ডলু থেকে একটি আপেল বের করে দেন নিরুর হাতে, প্রসাদী ফল। বলেন, 'দেবার মত আর তো কিছু নেই আমার, পথে এইটি খেয়ো। সাবধানে যেয়ো, ঠাণ্ডা লাগিয়ো না। শরীর হচ্ছে বাধাস্বরূপ—ব্রহ্মের কাছে যাবার প্রকাণ্ড বাধা। শরীর খারাপ হলে সাধনা হয় না, মন মুক্ত হয় না। শরীরকে আঁকড়েই সে পড়ে থাকে।'

কম্বাচটি থেকে মাইল খানেক নীচে দুর্গাচটি। কুমড়ো, কাঁকড়ি কিনি। শীত আসবে, গাছ মরে যাবে; কুমড়োর পুরন্ত ডগাও কিছু কিনি সেই সঙ্গে। পুল পেরিয়ে এপারে আসি, নীচে পড়ে থাকে আকাশগঙ্গা।

এপারে সোজা চড়াই। ঘোড়া নিয়ে লোক সাধাসাধি করে, 'এ চড়াইটুকু সবাই ঘোড়াতে পার হয়; এ মোটা মাঈ, তুমি একটা ঘোড়া নাও— নয় তো যেতে পারবে না।'

নিরু ইতস্তত করে একটু। তার পর, সবাই এগিয়ে যায় দেখে কোমরের চাদরটা আর একবার শক্ত করে বেঁধে চড়াই উঠতে থাকে। পৌনে দু মাইল একটানা চড়াই। অতি কষ্টকর পথ। পথের দু ধারে ঝাঁকড়া লতা-ঝোপ, ছোট ছোট সাদা ফুলে ছাওয়া। যেন রৌদ্রতাপে দগ্ধ পর্বতগাত্রে স্নিগ্ধ আচ্ছাদন এক একটি। বড়দি বললেন, 'এ যেন বৃন্দাবনের কুঞ্জলতাটি। বৈষ্ণব কবি সঙ্গে থাকলে এখুনি রাধাকৃষ্ণকে মনে মনে এখানে বসিয়ে খুশি হয়ে উঠতেন।'

দেড়াচটিতে যখন পৌছলাম, বেলা তখন প্রায় দশটা। বেশ শীত শীত করছে। রান্নার আয়োজন চলছে। দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত এখানেই আছি। সামনেই চওড়া ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। নিরু বললে, 'যাই, স্নান করে নিই গে তাড়াতাড়ি। রোদ্দুর আছে, কাপড় শুকিয়ে যাবে।'

উখীমঠে নাগপুরের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি একাকী গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ও কেদারনাথ হয়ে এবার বদরীবিশাল দর্শনে চলেছেন। ম্যালেরিয়া-জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে আমাদের সঙ্গ নিলেন। ঘর থেকে ব্রত নিয়ে বেরিয়েছিলেন যে, দিনে একবার মাত্র ভোজন করবেন। অসুস্থ শরীর, অর্ধাহারে কাহিল, তার উপর আজ আবার তাঁর উপবাস, আজ গণেশ চতুর্থী। ভালো দই পাওয়া গেল, বড়দি তাঁর জন্য আধ সের দই কিনে আনলেন। দইয়ে দোষ নেই, উপবাসকালে গ্রহণ করা চলে। খেয়ে ভদ্রলোক একটু সুস্থ বোধ করলেন।

দৈড়া থেকে দোগলবীঠা সাড়ে পাঁচ মাইল। তার এক মাইল দূরে বানিয়াকুণ্ড। সেইখানেই আমাদের যাবার কথা। পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, তাই দোগলবীঠাতেই থামলাম। সারাপথে বৃষ্টি পেয়েছি, তার উপর ছিল চড়াই ; হিসেবমত তাই এগতে পারি নি।

বেজায় শীত। জায়গাটা আট হাজার ফুট উঁচু। দুদিক থেকে দুটো পাহাড় এসে চেপেছে, তারই ভিতরে চটি। সূর্য ডুবে গেল। বড়দি বললেন, 'আজ নষ্টচন্দ্র, চাঁদ দেখো না, কলঙ্ক রটবে।' চাঁদ কোথায় ? আকাশ মেঘে ঢাকা। ডালপালা-ছড়ানো লম্বা লম্বা কালো গাছগুলি পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে যেন চারদিক থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। যেন লোহার শিকে-ঘেরা বিরাট ভয়ংকর গারদ একটি। গা শিউরে উঠল।

বিছানাগুলি ভিজে স্যাঁতসেঁতে। কুলিরা পিঠের বোঝা মাটিতে নামিয়ে রেখে বিশ্রাম নেয়। সারাদিন আজ বৃষ্টি হয়েছে ; রাস্তার জলকাদার উপরেই মোট নামিয়ে রেখে বিশ্রাম নিয়েছে তারা।

উনুনের পাশে বসে রুটি সেঁকে সেঁকে চটিওয়ালা তার ছেলেকে খাওয়াচ্ছিল। গরম চাও দিল তাকে এক গ্লাস। বছর আড়াই-তিনের ফুটফুটে ছেলেটা। পাহাড়ের উপরে বসতি, মা থাকে সেখানে। ছেলে থাকে বাপের কাছে। নাম নারায়ণ। বাপ বলে, 'ছেলেকে ডাকতে ডাকতে এই নামেই তরে যাব। জীবনে কত দোষ করেছি, কত অন্যায় করেছি ; ভগবানের শরণ নিয়ে সে-সব স্খালন করবার ফুরসত ঘটে না। তাই এই নারায়ণকেই আঁকড়ে ধরে পড়ে আছি।'

রাতভর শীতে কাঁপলাম। ভিজে স্যাঁতসেতে মেঝে। ঘরের একদিকে নিচু বারান্দা। ঘোড়া-মোষগুলি তার সামনেই বাঁধা। থেকে থেকে ঘোড়াগুলি চিঁহিঁ-হিঁ ডাক ছাড়ছে আর গায়ের জল ঝাড়ছে। মুখের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে বারে বারে জিজ্ঞেস করে নিরু, রাত কতদূর গড়াল। বলে, 'সব জায়গাতেই আমরা আগেভাগে গিয়ে নিরিবিলি নির্জন চটি দখল করি। ভাবি, ভাগ্য বড় ভালো আমাদের। আর আজ যেন কেবলই মনে হচ্ছে, আরও লোক থাকলে ভালো হত। দেয়াল-ঘেঁষা উনুনগুলিতে যদি একসঙ্গে আঁচ পড়ত, বড় ভালো লাগত তা হলে।'

ঘোড়াগুলিকে আমাদেরই জন্য বেঁধে রাখা হয়েছিল। কাল সন্ধ্যেয় তাদের গাঁ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এখান থেকে তুঙ্গনাথ যেতে চার মাইল খাড়া চড়াই। পথে, চটিতে একবাক্যে সবাই বলেছে, 'এ চার মাইল ঘোড়া ছাড়া যাবেন না।' জ্ঞান মহারাজও বলে দিয়েছিলেন, 'হেঁটে যে উঠতে পারবেন না এমন নয়। কিন্তু বড্ডই কষ্ট হবে। এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবেন, পূজার্চনা সেরে সেদিন আর নেমে আসতে হবে না। অথচ ওখানে থাকবারও তেমন সুবিধে নেই। কেউ তো বড় একটা থাকে না। তার চেয়ে ঘোড়ায় যাবেন। বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। পূজা-দর্শনাদি সেরে দোকানে গিয়ে অর্ডার দিয়ে দেবেন, পুরি হালুয়া তৈরি করে রাখবে। তাই খেয়ে নেমে চলে আসবেন। নীচে ভুলকানা চটি। সেখানে এসে রাত্রে ঘুমিয়ে ভোরে আবার চলতে শুরু করবেন।'

ঘোড়ার ভাড়া মাইল-পিছু এক টাকা। নাগপুরী ভদ্রলোকের বেলায় অবশ্য দেড় টাকা লাগবে। তাঁর ওজন কিঞ্চিৎ বেশি। ঘোড়া হয়রান হয়ে পড়তে পারে, ফিরে এসেই তাই বাড়তি গুড় খাওয়াতে হবে।

মেজদি তো কাণ্ডিতে চলেছেন। আমাদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা হল। কে আগে চড়বে। সহিসদের মধ্যে একজন এগিয়ে এল। নিরুকে এসে বললে, 'এটা সবচেয়ে তেজী ঘোড়া; মাঈজী, এটা তোমার জন্য।' অনেক কসরত, আতঙ্ক, উৎকণ্ঠায় ঘোড়ায় উঠল নিরু। উঠে, লাগাম ধরে চোখ বুজে বসে রইল। বললে, 'চোখ খুললেই মাথা টলে উঠছে, উলটে পড়ে যাব।'

একে একে আর সবাইও উঠল। বগলাদিদি উঠতেই নিরু বললে, 'এই সহিস, আমার ঘোড়া আগে আগে চালাও। জলদি।' নিরুর ভয়, বগলাদিদিকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখলে সে হাসি সামলাতে পারবে না। আর হাসির দমকে নিজেই হয়তো ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়বে। পড়া তো পড়া, একেবারে সেই খদে গিয়ে শেষ। ডাইনে গা-ঘেঁষা পাহাড়, বাঁয়ে অতল খদ। অনেকখানি একলা এগিয়ে নিরু হাঁকল, 'বড়দি, এবার তোমাদের ঘোড়া ছাড়তে পারো।'

ধীরে ধীরে চলেছে ঘোড়া। পাশেই সহিস। ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে

সে হাঁটছে। আর আমরা ঘোড়ার গলার বকলস চেপে ধরে নিশ্চল তটস্থ হয়ে বসে আছি। খানিক এগিয়ে মনে একটু সাহস এল, আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে আশপাশে তাকাতে লাগলাম।

যতই উপরে উঠি, দেখি দিক-দিগন্ত মেঘে ছেয়ে আছে। মেঘের মহাসমুদ্র। আর উত্তাল তরঙ্গের মতই অগুনতি তুষারশৃঙ্গ তাতে উঠছে পড়ছে। আলোর ঝলকানিতে মনে হচ্ছে যেন মণিমানিক্যের মেলা বসে গিয়েছে। নীচে বিস্তীর্ণ বসুমতী। অফুরন্ত তার রূপরাশি। চলতে চলতে নিরুর কাছাকাছি এসে পড়ি। নিরু বললে, 'এ-সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয় সাধ্য কার বল? বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে গেলেন। কী বর্ণনা দেবেন, ভাষায় আর কতটুকু বলা যায়? শেষে তিনি "মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্" বলে বর্ণনা সাঙ্গ করলেন। এও তাই, সবই মধুরম্।'

দেখতে দেখতে মেঘ এসে ঘিরে ফেলল আমাদের, দৃষ্টির সামনে থেকে সবকিছু হঠাৎ হারিয়ে গেল। নিরুর ঘোড়ার পরেই আমারটা। আমার পর বড়দি। পাহাড়ের গায়ে নানা জাতের গাছ। উঠতে উঠতে বনের পর বন পার হচ্ছি। ঝাপড়া গাছের বন, পাইন গাছের বন, ম্যাগনোলিয়ার বন। ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে গাছগুলি। একটু বাদে গাছ আর রইল না, কেবল ঘাস। ঘাসের পরে নগ্ন পাহাড়। তেরো হাজার ফুট উপরে পাহাড়ের শিখরে মন্দির। পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরটি যেন মন্দিরের চূড়ার উপরে এসে নত হয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে বাসুকি যেন ফণা মেলেছেন শিবের জটার উপরে।

পাণ্ডা আমাদের এক চটিতে নিয়ে তুললেন। আগুন জ্বেলে দিলেন, হাত পা সেঁকে যাতে গরম হয়ে নিতে পারি। বড়দি বললেন, 'কায়িক ক্লেশেরও দরকার আছে বৈকি। এই তো এতদিন এত কষ্ট করে পায়ে হেঁটে পথ চলেছি, প্রতি পদক্ষেপে মনে পড়েছে কেদারনাথের কথা, বদরীবিশালের কথা। কষ্টের মধ্যেই স্মরণ করেছি তাঁদের। আর আজ যেই ঘোড়ায় উঠে বসেছি, অমনি সব ভুলে গেলাম আমরা। চারি দিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলে এলাম। একবার মনেও হল না কার জন্য কোথায় আমরা চলেছি।'

নিরু বললে, 'একই কথা। আমাকে না দেখে যদি কেউ আমার আঁকা ছবি আগ্রহভরে দেখে তো আমি বেশি খুশি হই। এই বিশ্বের যিনি স্রষ্টা,

কথাটা তাঁর ক্ষেত্রেও সত্য। তাঁর সৃষ্টিকে তোমরা নয়ন ভরে দেখেছ, তাতেই তিনি পরম সন্তুষ্ট। তাঁকে খুশি করা নিয়েই তো কথা!'

পাণ্ডা বললে, 'মা গো, আগে চা খাবে, না পুজো দেবে?' পাণ্ডার মুখের এই 'মা গো' ডাকটি বড় মধুর। কাল যখন আমরা দোগলবীঠায়, পথে হঠাৎ ডাক শুনতে পেলাম, 'কোথা থেকে আসছ মা গো?' 'মা গো' শুনেই দাঁড়িয়ে যাই। দেখি ত্রিশবত্রিশ বছর বয়সের দীর্ঘ বলিষ্ঠ এক যুবক। তুঙ্গনাথের পাণ্ডা। বাঙালী যাত্রীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই ডাকটি সে রপ্ত করে নিয়েছে। নাম ভবানীশঙ্কর, শিষ্ট বিনম্র স্বভাব। 'মা গো' ডাকে গলে গিয়ে বড়দি তাকে তখুনি ঠিক করে ফেললেন।

বড়দি বললেন, 'পুজো আগে দেব। কিন্তু কিরণ তো এসে পৌঁছল না এখনও! কাণ্ডিতে আসছে, ধীরে ধীরে উঠবে, সময় লাগবে।'

ঘোড়াওয়ালারা ফিরে চলে গেল। খুব খুশি তারা। দাদা তাঁদের সবাইকে টাকা-টাকা বকশিশ দিয়েছেন।

আংটা ঘিরে আগুন পোহাতে বসেছি। বগলাদিদি নিরুর পাশে বসবেন না, মুখ ঘুরিয়ে নাগপুরী ভদ্রলোকের কাছে চলে গেলেন।

একটু বাদেই মেজদি এসে পড়লেন। সবাই মিলে মন্দিরে চললাম আমরা। তুঙ্গনাথের পাহাড় কেদারবদরীর চেয়ে উঁচু। প্রায় সারাক্ষণই কুয়াশায় ঢাকা থাকে। ক্বচিৎ কখনো কুয়াশা কেটে গিয়ে চারি দিক দেখা যায়। ভিতরে হরিহর-মূর্তি, শঙ্করাচার্যের স্থাপিত। শঙ্করাচার্য বৈদিক ধর্মের কীর্তিধ্বজা উড়িয়ে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন, উত্তরাখণ্ডে বদরীনাথ হয়ে তুঙ্গনাথে এসে হরিহর-মূর্তি স্থাপন করে বত্রিশ বছর বয়সে কেদারনাথে গিয়ে দেহরক্ষা করেন।

পূজা সম্পন্ন হল। খাওয়া হল। এবারে নীচে নামার পালা। তুঙ্গনাথের উলটোদিকে নামবার ঢালু পথ। পথের উপরে বৃষ্টিভেজা ঝরাপাতার রাশি। একটু অসতর্ক হলেই পা পিছলে যায়। খুব সাবধানে তাই পা ফেলছি— দু-পাশে হরেক রকমের ফুল, অর্কিড। যেমন বিচিত্র তাদের রং তেমন সুন্দর সৌরভ। নিরু বললে, 'ইচ্ছে হয়, গোছা-গোছা তুলে নিই। আবার ভাবি, এ দিয়ে করবই বা কী? তা ছাড়া, এ-পথে ফুলের ভারও বইতে কষ্ট হবে। তার চেয়ে বরং দেখতে-দেখতে পথ চলি।'

ভূর্জবৃক্ষের চওড়া পাতলা বাকল ছড়িয়ে আছে পথে। গাছ থেকে বাকল

চেছে নিয়ে গেছে হয়তো, তারই টুকরো-টাকরা ছড়ানো আশেপাশে। লাঠি দিয়ে সেগুলো টেনে টেনে তোলে নিরু। কুলি বললে, 'এ আর কি নেবে মাঈজী, বদরীনাথের পথে বহুত কিনতে পাবে। আরো কত বড় বড়।'

বড়দি বড় চিন্তাগ্রস্ত। বললেন, 'জানো, মনই আমাদের বিষম শত্রু। অহংকারের আর নিরসন ঘটে না। এমন কঠিন জায়গায় দেবদর্শনে এসেছি, দিনে রাতে কত ক্লেশ, সকলে আসতেও পারে না। তাতেও দেখ মনে কেমন অহংকার জাগছে, মনে-মনে ভাবছি—আমি বড় পুণ্যবতী। এ দুষমনকে সায়েস্তা করবার উপায় নেই। কখন যে কোন্ রন্ধ্র দিয়ে ভিতরে ঢুকে আধিপত্য বিস্তার করে, টের পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবরা যে বিনয়কে এত গুরুত্ব দেন, সে তো এই অহংকার থেকে দূরে থাকবার জন্যেই। নিমাই বলে গেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

সেই ব্যক্তিই কেবল হরিকীর্তনে অধিকার পায়, যে ব্যক্তি তৃণের ন্যায় দীন-ভাব ধরে অন্যকে মান দেয়।

'পরমভক্ত বিপ্র বাসুদেব, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। তাতে তাঁর দুঃখ নেই, ভগবানের নামগানেই তিনি তন্ময়। সর্বাঙ্গে কুষ্ঠক্ষত, অসংখ্য কীট তাতে কিলবিল করছে। বাসুদেব খুশি; ভাবেন, তাঁর দেহ তো তা হলে একেবারে অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী নয়, আর কিছু না হোক, কতকগুলি প্রাণীকে তা আহার্য জোগাচ্ছে। তাই ক্ষতস্থান থেকে কোনো কীট যদি মাটিতে পড়ে যায়, তা হলে, আহা সে দুঃখ পাবে, এই কথা ভেবে বাসুদেব আবার সযত্নে তাকে তুলে তাঁর ক্ষতের উপর রেখে দেন। মা যেমন শিশুকে স্তন্যপান করান, বাসুদেবও তেমনি সেই কীটগুলিকে তাঁর আপন অঙ্গ দিয়ে পালন করেন। নিজের জন বলতে তাঁর কেউ ছিল না। ক্ষতের দুর্গন্ধে কেউ কাছে আসতে পারত না। ঐ কীটগুলিই ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী। গৌরাঙ্গপ্রভু গিয়ে—

দীর্ঘ দুই ভুজ প্রকাশিয়া দামোদরে
গাঢ়তর আলিঙ্গন কৈল ব্রাহ্মণেরে।

গৌরের আলিঙ্গনে বাসুদেবের অঙ্গে সুবর্ণ-জ্যোতি ফুটে উঠল। কুষ্ঠ নিশ্চিহ্ন হল। বাসুদেব বললেন, "ঠাকুর এ করলে কী। অস্পৃশ্য ছিলাম, ভালো

ছিলাম, মনে কোনও অভিমান ছিল না। তোমাকে পেলাম, দেহ সুন্দর হল ; এখন ভয় হচ্ছে অহংকারী হয়ে উঠব :

মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
কিন্তু আছিলাম ভালো অধম হইয়া
এবে অহংকার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥”

কথা শেষ করে, বড়দি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন।

তুঙ্গনাথ পাহাড়ের পাদদেশে ভুলকানা চটি। মাঝখানে ঝরনা। দু পাশে চটির ঘর, বারান্দা। ঝর ঝর ঝর, ঝরনা বইছে। ঘর থেকে হাত বাড়িয়ে তার জল ছোঁয়া যায়, মুখ ধোয়া যায়, থালা ধোয়া যায়, পা ধোয়া যায় পাথরে পায়ের তলা ঘষে ঘষে।

ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে নিরু মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল। তুঙ্গনাথ থেকে নামছিল যখন, দেখতে পেয়েছে আগে আগে বগলাদিদি ছুটছেন, আর দুমদুম আছাড় খাচ্ছেন। থামছেন না, পাছে নিরুরা কাছে এসে পড়ে। পিছন ফিরে তাকান, আর দাঁড়িয়ে উঠে আবার ছোটেন। ছোটেন আর পড়েন।

বগলাদিদি বললেন, ‘কী করব। বাবু এগিয়ে গেছেন, দেখতে পাচ্ছি নে তাঁকে। বেলাও শেষ। ভাবনু, ওরা যদি আমাকে ফেলে চলে যায় তবে তো অন্ধকারে একলা পড়ে থাকব। তাই ভয়ে ভয়ে ছুটতে নাগনু।’

মেজদি বললেন, ‘নিরু না হয় বেআক্কেল। কিন্তু বড়দি তো ছিলেন, তিনিও কি তোমাকে ফেলে চলে আসতেন নাকি?’ চটিওয়ালা বড়ো ভালো লোক। যাত্রী কমে গেছে, সারাক্ষণ চটি আগলে বসে থাকার কোনোও অর্থ হয় না। তাই দুদিন আগে উপরের বসতিতে চলে গিয়েছিল। তার চটিতে যাত্রী এসেছে খবর পেয়ে নেমে এল। না এলেও চলত। তবু এসেছে। যাত্রীদের সুবিধে-অসুবিধের খোঁজ নেওয়া, তাঁদের দেখাশোনা যত্ন-আত্তি করাকে সে একটা কর্তব্য বলে মনে করে।

চটিওয়ালা এসে আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করে দিল। উনুনের চারদিকে কম্বল বিছিয়ে সবাইকে ডাকল, ‘এখানে এসে বস, আরাম লাগবে।’ কোনো একটা ছেলেকে ধরে দুধও জোগাড় করে আনল খানিকটা। চাল ডাল নেই

চটিতে। বললে, 'কেউ আসে না এখন তেমন, বিক্রি নেই, আটায় চালে পোকা ধরে যায়, তাই সব বসতির ঘরে তুলে নিয়ে গেছি। তা চা চিনি কিছু আছে, দুধও পাওয়া গেল, গরম চা বানিয়ে খাও তোমরা।' বলে দেয়ালের খোপ থেকে একটা বার্লির টিনের কৌটো এনে চা চিনি বের করে দিল।

বড়দি বললেন, 'এই ভালো। সারাদিনের পরিশ্রমে সবাই ক্লান্ত, খাওয়া-দাওয়ায় মন নেই কারো। গরম গরম চা খেয়ে তাড়াতাড়ি বরং শুয়ে পড়া যাক।'

সকাল থেকেই নিরুর মাথা ধরে ছিল। এখন আরো বেড়েছে। চটিওয়ালা বললে, 'গাওয়া ঘি বের করে দিই, মাখো। এই দেখ না আমার মাথা, আমিও মেখেছি, 'দরদ' দূর হয়ে গেছে।' বলে, উপুড় হয়ে সে তার মাথা দেখালে। তার পর বললে, 'গাওয়া ঘি গরম, মাথার সর্দি সব গলিয়ে দেয়। ভয়সা ঘি ঠাণ্ডা।'

সবাই শুয়ে পড়েছে। বড়দির কাজ এখনো সারা হয় নি। নাগপুরী ভদ্রলোকের বায়ুরোগ। একটু আগে বড়দি তাকে কয়েকটা হোমিওপ্যাথী বড়ি খাইয়ে দিয়েছিলেন। এখন আবার চিৎকার করছেন, পেটে কোমরে ব্যথা। বড়দি জল ফুটিয়ে ব্যাগে ভরে তাঁকে সেঁক লাগাতে বললেন।

উঁচুনিচু মেঝে, দারুণ শীত, কম্বল নেই যথেষ্ট। গা আর গরম হয় না। নড়তে গেলে ঘাড়ে-পিঠে পাথরের খোঁচা লাগে। সমান হয়ে শুতে গিয়ে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়ে গেল।

কেউ পায়ের নীচে, কেউ মাথার কাছে, যে যেমন পেরেছে শুয়েছে। নিরুর চোখে ঘুম নেই। কখনকার কোন্ কথার জের টেনে সে বড়দিকে বলছে, 'সেই কথা তো আমিও ভাবি বড়দি। বাউলদের যখন দেখি, মনে হয়, তারা যেন এ-জগতের মানুষ নয়। সেই সেবারে কেঁদুলিতেই দেখেছিলাম। মাঝরাত অবধি নাচগান দেখে শুনে একটু শোবার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি তিলার্ধ জায়গা নেই কোথায়ও। পথে ঘাটে গাছতলায় যে যেখানে পেরেছে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। বহু কষ্টে কুঠরিবাবার কুটিরে খোলা আঙিনায় একটু ঠাঁই পেলাম। তাও তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করে কয়েকজনকে তুলে দিয়ে আমাদের জন্য জায়গা করে দিলেন। মাসিমা ছিলেন, এক বিদেশী বান্ধবী ছিলেন, দুই দিদি ছিলেন, আর ছিলেন ভাই বন্ধু তিনজন। কাত হয়ে গা ঠেসাঠেসি করে সবাই শুয়ে পড়লাম।'

গভীর রাত। বহুক্ষণ হল মানুষের কলরব থেমে গেছে। কেবল, সারাটা তল্লাট জুড়ে, এক ঝাঁক ভোমরার মত একটা গুঞ্জন-ধ্বনি উঠছে। শুয়ে বসে ক্লান্তকণ্ঠে নামের সুরটুকু ধরে রেখেছে ভক্ত বাউলরা। পুণ্যভূমিতে তে-রাত্রি অহর্নিশি নাম গাইবে, এই অভিলাষ। অদ্ভুত এক গম্ভীর গভীর স্তিমিত অনুভূতি। ঘুম আসছে অথচ আসছে না, ঘুমের মধ্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলতে চাইছে না মন। আধো ঘুম আধো জাগরণ, তারই মাঝখানে চেতনাকে দোলা দিচ্ছি, এমন সময়ে দূরে কোথায় যেন একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ঝাঁঝিয়ে উঠল। আর সেই কণ্ঠস্বরে যেন কেঁপে উঠল স্তব্ধ রাত্রির সমস্ত মাধুর্য। সমস্ত শিরা উপশিরা যেন ঝনঝনিয়ে উঠল সেই বেসুরো কণ্ঠের আঘাতে। মনে হল, কেউ গিয়ে থামায় না কেন এই বীভৎস অসামঞ্জস্যকে। আর সেই বিকৃত কণ্ঠস্বরের অধিকারী যেন আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। এসে ঢুকল কুঠরিবাবার আঙিনায়। দেখলাম বুড়ো এক বাউল, গায়ে তার রঙবেরঙের অজস্র তালি দেওয়া জীর্ণ একটা আলখাল্লা। ক্রোধে সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। চিৎকার করে সবাইকে গালাগালি দিয়ে চলেছে। কী, না সকালে অজয় নদে স্নান করে সে তার কৌপীন আর বহির্বস্ত্র পারেই শুকোতে দিয়েছিল। এখন তুলতে গিয়ে দেখে নেই ; কে যেন নিয়ে নিয়েছে। রাগ দুঃখ অভিমান সব মিলিয়ে ফেটে পড়ছে সে। কে চুরি করল, কেন চুরি করল, আর কি কিছু নজরে পড়ে নি হতভাগার, কেবল তারই জিনিস কটা নিতে গেল! যারা জেগে আছে তারা শুনছে, যারা ঘুমিয়েছিল তারাও জেগে উঠেছে। কিন্তু কে থামাবে একে, কী প্রবোধ দেবে ? নিঃসাড়ে পড়ে রইল সবাই। আর সেই নিঃশব্দকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে একটানা সে চিৎকার করে চলল। ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল, নিজেকে যেন শান্ত রাখতে পারছিলাম না। এমন সময় হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড। আমার পাশে শুয়ে ছিল এক বৈরাগী। সে উঠে তার বোঁচকা থেকে খঞ্জনী জোড়া বার করে আঙুলে জড়াতে জড়াতে চকিতে সেই বাউলের কাছে ছুটে গিয়ে আচম্কা গান ধরল :

আহা, চুরি করে নিল যে জন
সে যে তোমার মদনমোহন,
মন প্রাণ করিল চুরি সেই মনোচোরে,
ও তুমি, না চিনিলে তারে।

গান শেষ করে বৈরাগী করল কী, শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনের ভঙ্গিতে দু হাত ঘুরিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। আর, তাই না দেখে বাউল তার ফোকলা মুখে হো হো করে হেসেই অস্থির। আঙিনার একপাশে কেরোসিনের ডিবে জ্বলছিল একটা। তারই ক্ষীণ আলোতে দেখলাম, বাউলের কালো গাল দুটো চক্‌চক্ করছে। কাঁদছিল এতক্ষণ, সেই জলেরই ধারা।

বাউল ভারী খুশি। আর কথাটি নেই। কে চুরি করেছে জানতে পেরে হাসতে হাসতে হেলতে দুলতে নিশ্চিন্ত মনে সে চলে গেল। সে কী তার চলে যাওয়ার ভঙ্গি। দেখে, আমিও যেন মহা খুশি হয়ে উঠলাম।

বাউল চলে যেতে বৈরাগী এসে তার আপন জায়গায় বসল। ঘুম ভেঙে গেছে, দিনেও বোধ হয় পেট পুরে খায় নি। আপন মনেই বললে, "বড়ো খিদে পেয়েছে। দুটো রম্ভা আছে থলিতে, গোপালকে একটু ভোগ দিই তা হলে।" চোখ পিটপিট করে শুয়ে শুয়েই সব দেখছি। ঘটি হাতে করে নদী থেকে জল নিয়ে এল। আঙিনায় হাতে খানেক জমি খালি ছিল, তাতে জলের ছিটে দিয়ে বোঁচকা থেকে পিতলের দুটি রেকাবি বার করে একটিতে হামাগুড়ি-দেওয়া পিতলের গোপালমূর্তি বসাল, একটি সামনে রাখল। কলা দুটি বার করে ছাড়াতে গিয়ে থেমে রইল খানিকক্ষণ। বললে, "উহুঃ, এ চলবে না, পচে গেছে। গোপাল, তোমাকে তাহলে পচা কলা দিয়েছিল ?"

নদীর ঘাটে স্নানযোগ ছিল আজ সকালে। সামনে চট বিছিয়ে অন্যদের মত সেও গিয়ে পথের ধারে বসেছিল। ফিরবার মুখে স্নানযাত্রীরা চাল ডাল পয়সা ফল, যে যা পেরেছে পর-পর পাতা চটের উপরে ফেলতে ফেলতে ঘরে ফিরেছে। সেই সময়েই সে পেয়েছিল এই কলা দুটো। কলার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আপন মনে সে হাসতে থাকে।

উঠে এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'তোমার গোপাল দোকানের মণ্ডা মেঠাই খায় ?'

সে বললে, 'হ্যাঁ, খায়।'

খুচরো আট-আনা ছিল আমার হাতব্যাগে। বৈরাগীকে দিয়ে দিলাম।

পয়সা কটা হাতে নিয়ে তখনই সে মেলার দিকে ছুটল। কেঁদুলী মেলা, বিখ্যাত মেলা বীরভূম জেলায়। নানা রকমের দোকান-পাট বসে, সার্কাস সিনেমা আসে। মিষ্টির দোকান খোলাই থাকে সারারাত। গাইতে গাইতে

সে মিষ্টির দোকানের দিকে ছুটছে, গলার আওয়াজে টের পাচ্ছি কতদূর গেল। বড় আনন্দ তার, গোপালকে আজ মণ্ডা খাওয়াবে। মণ্ডা কিনে তেমনি করেই নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে ফিরে এল। পিতলের থালায় মিষ্টি সাজিয়ে ভোগ নিবেদন করল।

দেখছি আর ভাবছি, এবার ও প্রসাদ খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করুক, দেখে তৃপ্তি পাই। বৈরাগী কিন্তু তার মণ্ডার রেকাবি হাতে উঠে দাঁড়াল। কাছে এসে বললে, 'মা গো, একটু পেসাদ নাও।' হাত বাড়িয়ে নিলাম। ভাবলাম, না নিলে হয়তো ক্ষুণ্ন হবে। বললাম, 'এবারে তুমি প্রসাদ নাও, দেখি।' তা, নিজে কি সে নেয়? প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে 'ও ভাই, কে জাগ্‌গত আছ, পেসাদ নাও', 'ও ভাই, কে নিদ্দিত আছ, জাগ্‌গত হও' বলে আঙিনার ঘুমন্ত মানুষগুলিকে ঠেলে তুলে প্রসাদ বিলোতে লাগল। সবশেষে, থালার গায়ে অল্প যা-একটু গুঁড়ো লেগেছিল, তাই ঝেড়ে নিয়ে মুখে ফেলল। বড়ো আনন্দ তার।

হঠাৎ মৃদু নামগুঞ্জন শুরু হল। তার পর সেই গুঞ্জন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আনাচ কানাচ থেকে ভৈরবীতে জাগরণী-গান ধরল সবাই। পুবের আকাশে ভোরের আলোর রং ধরেছে। যে-কমল ফুটিফুটি করছিল, ফুটল।

উঠে পড়লাম। দেখি বৈরাগীও সুর তুলছে তার ছোট্ট খঞ্জনী জোড়াতে। সেদিন যে কার খিদে পেল, আর কে মণ্ডা খেল, আজও আমি বুঝতে পারলাম না।

চটিওয়ালা বলেছিল, 'রাত থাকতে বেরিও না, পথে ভালুকের ভয় আছে।' বেলা করেই তাই আজ বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

গেরস্থদের পাল পাল ভেড়া ছাগল চড়ে বেড়ায় পাহাড়ের গায়ে। কুকুরগুলি তেড়ে এসে পথ আটকে দাঁড়ায়। তকলিহাতে উল পাকাতে পাকাতে মনিব এসে ধমক দেয় তাদের।

ঘরে ঘরে কম্বল বোনে মেয়েরা, সরু তাঁত কোমরে বেঁধে। এক হাত চওড়া কম্বল। পরে সেলাইর ফোঁড়ে জুড়ে চওড়া করে নেয়। নাকে নথ। নথের ভারে নাক যেন ছিঁড়ে পড়ছে। তাঁত বোনে, আর ফিরে ফিরে তাকায়। যাত্রী দেখে।

জলকাদায় ভরা এবড়ো-খেবড়ো পথ। প্রথমে বেশ খানিকটা চড়াই।

গাছের ডালে ডালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হনুমান। ঘাড়ে গলায় লম্বা লম্বা লোম। মনে হয় যেন কালো মুখগুলি ঘিরে সাদা পশমের কম্ফর্টার পরেছে। ফল ছিঁড়ে খাচ্ছে গাছে বসে। কী ফল এগুলো ?

জঙ্গলচটি থেকে আবার উতরাই শুরু হল। ঘন বন, শ্যাওলা-মাখা গাছ, স্যাঁতসেঁতে রাস্তা। শুনেছি এ-পথ নাকি জোঁকে ভরা।

একটানা হাঁটতে হাঁটতে নন্দপ্রয়াগে এসে পৌঁছলাম। বহুদিন পরে একটুখানি সবুজ মাঠ চোখে পড়ল। পথ ধরে এগিয়ে চলে নিরু চটির খোঁজে। হঠাৎ হি হি করে হেসে ওঠে। বলে, 'ঐ দেখ আমাদের ব্রহ্মচারীকে। হাঁটার শক্তি নিয়ে খুব গর্ব ছিল, এখন দেখি খোঁড়াচ্ছেন।'

ব্রহ্মচারী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। সঙ্গে বালতি ঘটি। হয়তো স্নান করতে চলেছেন। দেখতে পেয়ে হেঁকে নিরুকে ডাকলেন। নিরু কাছে গিয়ে বললে, 'অ্যা, এ কী হয়েছে আপনার পায়ে। আহা, ডানপাটা যে একেবারে ফুলে গেছে।'

তিনি বললেন, 'কী জানি, বুড়ো আঙুলে কী যে হল একদিন রাতারাতি ফুলে উঠল। শুধু আঙুল নয়, গোটা পায়ের পাতা। আর কী ব্যথাই যে হল। এখন তো অনেক কম। ক'দিন একেবারে নড়তে চড়তে পারি নি।'

'দলের লোকেরা গেল কোথায় ?'

'তারা বড় মানুষ, টাকায় উড়ে চলে। আমাকে এখানে ফেলে রেখে অনায়াসে এগিয়ে গেল। বললাম, দুটো দিন অপেক্ষা কর, ডাণ্ডির খোঁজ করাচ্ছি, ডাণ্ডিতেই যাব এই পথটা। তা তাদের সবুর করবার সময় হল না।'

রান্নাবান্না করবার জন্য ব্রহ্মচারীর সঙ্গে একজন বামুন রয়েছে। তাকে ডাকলেন ব্রহ্মচারী। ডেকে, নিরুকে জলমিষ্টি দিতে বললেন। জ্ঞান মহারাজের কাছে শুনেছিলাম, ইনি নাকি নাম করা বড়োঘরের ছেলে, নিজের ধনসম্পত্তিও আছে বহু। বছর কয়েক হল ব্রহ্মচারী হয়েছেন। সঙ্গে নিজের চাকর-বামুন নিয়ে চলেন।

মুড়ির মোয়ার মত বাদাম-পেস্তা দেওয়া বড় বড় দুটো মেওয়ার লাড্ডু আর এক গ্লাস জল এনে বামুন নিরুকে দিলে। নিরু বললে, 'না খেতে পেয়ে এই ক-দিনেই লোভী হয়ে গেছি। তবু এতটা খেতে পারব না, বড়দির জন্য একটা রেখে দিই।'

ব্রহ্মচারী তাকে পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন, 'না, তুমি খাও, আরো আছে, ওঁরা এলে সবাইকে লাড্ডু-জল খেতে দেব।' বললেন, 'একলা পড়ে আছি, কারো সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কইতে পারি নি। আজ তোমায় দেখে তাই বড়ো ভালো লাগছে। দুপুরে এই চটিতেই থাকো। কালী কমলীওয়ালার চটি, অন্যগুলির চাইতে ভালো। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন!'

ব্রহ্মচারীর সঙ্গে গল্প জমে যায় নিরুর। এককালে নাকি ব্রহ্মচারীর খুব শিকারের শখ ছিল। প্রকাণ্ড দুই থাবা মেলে দেখান নিরুকে। বলেন, 'দেখছ না, বন্দুক-ধরা কড়া-পড়া হাত।'

বুড়দিরা আসতে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। স্নান কর কাপড় কাচো; জলপা, রান্না চড়াও জলদি।

একই ঘরে রান্না হয় সকলের, আলাদা আলাদা চুল্লিতে। চাকর কুলি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মচারী খেতে বসেন।

নিরুকে বলেন, 'জন্মে অবধি একলা বসে খাই নি কখনো, এখনো পারি না।'

অনেক রকম রান্না করেছে ব্রহ্মচারীর বামুন। ভোজন-বিলাসী মানুষ তিনি। রান্নার মালমসলা সব সঙ্গে থাকে। খেতে খাওয়াতে সমান ভালোবাসেন।

বড়দিকে ইশারা করে নিরু, বারান্দায় নিয়ে এল খিচুড়ির হাঁড়ি। এত পরিপাটি আহার্যের সামনে বসে হাতা হাতা খালি খিচুড়ি খেতে নিরু হয়তো লজ্জা পায়। ব্রহ্মচারী আমাদের জন্য বামুনের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন আলুবখরার চাটনি, ডালনা, পকোড়ি, রাই শাকের তরকারি। নিরু বললে, 'মুখের অরুচি ছাড়ল চাটনিটা পেয়ে।'

খাওয়ার পর বিশ্রাম। বিশ্রামের সময় একঘণ্টা। দোতলায় সুন্দর খোলামেলা ঘর, আলো-হাওয়ায় ভরা। মেঝে থেকে ওঠা দরজার মত বড় বড় জানালা। শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে দেখি সবুজ মাঠ, সবুজ গাছ, সবুজ পাহাড়। তার উপরে নীল আকাশ। সবুজে সবুজে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। ইচ্ছে হয়, দিনকয়েক এখানে থেকে যাই।

ব্রহ্মচারীরও খুব ইচ্ছে, আজ রাতটা অন্তত আমরা থাকি এখানে। কাল ভোরে তাঁর ডাণ্ডি এসে পৌঁছুবে, একসঙ্গে যাওয়া যাবে সবাই মিলে।

তা আর হল না। আমরাও তাঁকে একলা ফেলে চললাম। নিরু তাঁকে

বারে বারে প্রবোধ দেয়, 'ভাণ্ডি তো? পরশু নাগাদ ঠিক ধরে ফেলবেন আমাদের। পায়ে হেঁটে আর কতদূর এগুব।'

চটি পার হয়ে পুল পেরিয়ে এপারের পথ ধরলাম। ছলছল করে গঙ্গা বয়ে চলেছে। অনেকটা আমাদের দেশি গঙ্গার মত। চটি থেকে এমন কিছু দূরেও নয়, অনায়াসে আজ এখানেই এসে স্নান করতে পারতাম।

কুলিকে শুধোলাম, 'এ গঙ্গার কী নাম?' সে বললে, 'বালখিল্য গঙ্গা।'

অনেকদিন পরে সমান পথে পা ফেলি। কেবলি উঁচু-নিচু পথ চলে বিরক্তি ধরে গিয়েছে। মনে হয়েছে, কবে একটু সমান জমিতে পা ফেলে হাঁটব।

অনেকখানি পথ এইভাবেই চলি। দু পাশে সবুজ শস্যক্ষেত্র, মাঝে-মাঝে দু-একটা বাংলো ধরনের ছোট্ট কুটির। শখ করে শেষ বয়সে কেউ এসে থেকেছিলেন হয়তো এখানে, গমভুট্টার খেতে ঘেরা ছোট্ট একটি সংসার পেতে নিয়ে। স্নিগ্ধ সুন্দর গৃহস্থালী।

দুটো বাচ্চা ছেলে গোরু মোষ ছেড়ে দিয়ে পথের ধারে বসে নিবিষ্ট মনে হাতের তেলোয় কী যেন নিয়ে ঘষছিল। নিরু ধমকে ওঠে, 'এই, কী করা হচ্ছে?'

তারা হেসে দূরে সরে গিয়ে আবার খৈনি তৈরি করার ভঙ্গিতে হাতের তেলোর উপরে সেই জিনিসটাকে ডলতে থাকে।

এ-অঞ্চলে চারদিকে গাঁজার ঝোপ, বনতুলসীর মতই অতখানি উঁচু আর ঝাপড়া। যেখানে-সেখানে গাঁজার গাছের ছড়াছড়ি। জ্ঞান মহারাজ বলেছিলেন, 'তাই পাহাড়িরা এত গাঁজা খায়। বিনে পয়সায় পায় তো? গাঁজার পাতা শুকিয়ে তামাকের মত হুকোতে টেনেও খায়। আবার কাঁচা পাতা হাতে ঘষলে তেলোতে যে কষ লেগে থাকে, সেই কষ চেঁছে বড়ি করে রাখে। তার নেশা আরও কড়া।'

নিরু বললে, 'দেখছ না, সেই বড়ি তৈরি করে রাখছে।'

ভুলকানা থেকে মণ্ডলচটি সাড়ে ছয় মাইল। মণ্ডলচটি থেকে গোপেশ্বরচটি সাড়ে পাঁচ মাইল। শেষের মাইল দেড়েক পথ কেবল চড়াই। কিন্তু আজকাল আর তত কষ্ট হয় না। সন্ধ্যের আগেই আমরা গোপেশ্বরে পৌঁছে গেলাম।

পাহাড়ের মাথায় এই চটি। মন্দিরের পিছন দিকে একটা দালান-ঘরে ঠাঁই নিয়েছি। সামনে অনেকখানি বাঁধানো প্রাঙ্গণ, ছোটো ছোটো অনেকগুলি

ছেলেমেয়ে সেখানে ঝাপটা ঝাপটি করে ছোঁয়াছুয়ি খেলছে। একপাশে বসে দেখছি কালো পাহাড়ের গায়ে কালো মন্দিরের চূড়া, চারদিকে ঘরবাড়ি, মাঝখানে মন্দির। মন্দিরের একপাশ দিয়ে যা একটু পাহাড় দেখা যায়; নইলে মনেই হয় না যে, পাহাড়ে আছি আমরা।

এইঁ মন্দিরের শিবের নাম গোপেশ্বর। প্রাচীন মন্দির। টিমটিম করে প্রদীপ জ্বলছে। ভিতরটা স্যাঁতসেতে, বাদুর চামচিকের ভরা। দেওয়ালে শেওলা, ফাটলে ঘাস। বাইরে এক কোণায় বিরাট এক ত্রিশূল। দ্বাদশ শতাব্দীর নরপতি অনেকমল্লের বিজয়বার্তা এতে লেখা আছে।

পাণ্ডা বললে, 'এ হল মহাদেবের ত্রিশূল।'

ত্রিশূলের মাঝখানে এক বিশাল কুঠার। কুঠারটি নাকি পরশুরামের।

শীত বেশি নেই। রাত্রে খোলা বারান্দাতেই শুলাম। বড়দি বললেন, 'এই শিবলোক শেষ হল, এখান থেকে বৈকুণ্ঠ-লোকের শুরু। বাকি সবটা নারায়ণের রাজত্ব।'

রাতের শেষ প্রহরে শিঙা বেজে উঠল গোপেশ্বরের মন্দিরে। অন্ধকারেই কাঁসর বাজিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করল একটি ছেলে। আকাশ-ভরা তারা; আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকারের মধ্যে পথটাকেই যা একটু সাদা দেখাচ্ছে। ঢালু পথ। তার দুপাশে আর কী আছে—ধানখেত, কি জল জঙ্গল, কিছুই নজরে পড়ে না। কে কোথায় ছড়িয়ে আছি, তাও জানি না। কেবল জানি, চলেছি; এই আমিই চলেছি। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সরু পথের আবছা নিশানা দেখাতে দেখাতে কে যেন নিয়ে চলেছে আমায়, আর আমি চলছি।

নিরু বললে, 'মনে দুঃখ জাগে, গলায় সুর নেই কেন। থাকলে, গলা খুলে গাইতে গাইতে চলতাম, মনের কথা শোনাতাম! এমন সুসময় তো বড় একটা আসে না।'

'বাবু বাবু বাবু—' পিছন থেকে আর্তস্বরে বগলাদিদি ডেকে উঠলেন।

অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন দাদা। সাড়া দিলেন, 'কী গো?'

বগলাদিদি চেঁচিয়ে বললেন, 'এই রাস্তাতেই যাচ্ছ তো সবাই? দেখতে তো আর পাচ্ছি না, ভর লাগছে, তাই শুধোচ্ছি।'

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমৌলিতে এসে পৌঁছই। মাঝখানে অলকনন্দা। ওপারে শহর, বাস চলাচলের সড়ক; এপারে পায়ে চলার পথ। মোটর-বাস চমৌলি পর্যন্ত আসে। এখান থেকে হাঁটাপথের শুরু। শুনছি আর বছর কয়েকের মধ্যে নাকি বদরীনাথ পর্যন্ত বাস যাবার পাকা সড়ক হয়ে যাবে।

চমৌলি থেকে পথ আবার চড়াই। তবে কেদারের মত অতটা নয়। চওড়া পথ। সহজে ওঠা যায়। মাঝে মাঝে ঝরনা, থেকে থেকে চটি। এক বাড়ির দেয়াল টপকে চামেলি লতা ঝুলে পড়েছে পথে। নিরু প্রাণভরে সুবাস নিল। মাটি থেকে ফুল কুড়োলো। এক আঙিনায় ঝাপড়া বেলফুলের গাছ। কুঁড়িতে-ফুলে এক কোঁচড় ভরল। বললে, 'কতক্ষণ টাট্‌কা রাখতে পারব কি জানি? ফুলগুলি শুকোবে, কুঁড়িগুলি আজ সন্ধে নাগাদ ফুটবে।'

গোপেশ্বর থেকে তিন মাইল দূর চমৌলি, চমৌলি থেকে ছ মাইল এগিয়ে সিয়াসৈন। সাড়ে দশটায় সিয়াসৈন চটিতে আসি। বেশ গরম, ঝক্‌ঝকে রোদ, শেষের দু মাইল আসতে খুব কষ্ট হল।

পথের উপরে ঝরনা। একদল যাত্রী দেখলাম স্নান করে পাথরের গায়ে ভিজে কাপড় মেলে দিয়ে ঝরনার পাশেই বসে বসে যে-যার বাটিতে ছাতু নিমকি বেসনবড়া খেয়ে নিচ্ছে একবেলার মত। ঝরনার জলে আমরাও স্নান করলাম, কাপড় কাচলাম, ঘটি ঘটি জল ঢাললাম মাথায়।

দুপুরে হাত পা টান করে শুয়েছি, শুরু হল মাছির উপদ্রব। এর আগে আর মাছির যন্ত্রণা সইতে হয় নি।

বিকেলে কড়ারোদে আবার চার মাইল চড়াই ভেঙে পিপলকোটিতে এলাম। এক দোকানী শুধোয়, 'কোন দেশের লোক মা আপনারা?' অবাক হই। এমন পরিষ্কার বাংলা সে শিখল কোত্থেকে। বাংলাদেশে ছিল নাকি কখনো? দোকানী হাসে। বলে, 'দোকানের সামনের এই ফালি পথটুকুতেই যে গোটা ভারতবর্ষ এসে হাজির হয় মা। ভাষা শিখতে আর তাদের দেশে যাব কেন?' একপ্রান্তে কালীকম্‌লিওয়ালার চটি, খোলা মেলা সুন্দর দোতলা। পিপলকোটি সমৃদ্ধ জায়গা। দোকান-পসার, বাণিজ্য-গৃহস্থালীতে জমজমাট। চামড়া, চামর আর শিলাজিত পাওয়া যায় এখানে। শিলাজিত হল পাথরের কষ। জ্ঞান মহারাজের কাছে শুনেছি, বিশেষ বিশেষ পাহাড়ে

ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে একরকমের গলিত পদার্থ— অনেকটা আলকাতরার মত— পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরা গিয়ে সেগুলি চেঁছে চেঁছে টিন ভরে তুলে নিয়ে আসে, পরে জ্বাল দিয়ে ছেঁকে সাফ করে শিশিতে ভরে বিক্রি করে। টনিকের মত কাজ দেয়। শীতের সময়ে দেখেছি কাবুলিওয়ালারা আমাদের দেশে গাঁয়ে ঘুরে শিলাজিত বিক্রি করে। ফিরতি পথে নিয়ে যাব দু শিশি। তিব্বতীরা ফি-বছর পিপলকোটিতে আসে। নিয়ে আসে চামর আর চামড়া। তার বিনিময়ে নুনমশলা নিয়ে যায়। মন বাহাদুর বললে, 'যানেকা বখত জরুর একঠো শেরকা চামড়া ভি লিজিয়ে গা।' শের ছাড়া ছাগল ভেড়া হরিণের চামড়াও ঝুলছে দোকানগুলিতে।

তকলিতে উল কেটে বেড়াচ্ছে সবাই। একটি শৌখিন যুবক মিহি উল কাটছিল। নিরু হাতে নিয়ে দেখল। বললে, 'পাতলা পশম, বোনা হলে খুব হালকা জামা হবে।' ছেলেটি বললে, সে তার নিজের জন্য পুলওভার বুনবে এই উল দিয়ে।

ঘুরে ঘুরে দেখছি। এক বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে আঙিনা দেখা যায় খানিকটা। নিরু গিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সব কিছু দেখবার জানবার শখ নিরুর বরাবরের। বলে, 'একই ঘরকন্না, তবু নানা দেশে তার নানা রকমের বিধিব্যবস্থা। ভিতরে ঢুকে ভাব না জমালে সব জানা যায় না।'

পাহাড়ি মা বৌ খুব খুশি। নিরুও ভাব জমাতে জানে। গিয়েই তাদের কাছে জল খেতে চাইল। আসন পেতে, ঘটি মেজে কুয়ো থেকে জল এনে দিল বৌটি। ততক্ষণে নিরুর জানা হয়ে যায়, বাড়িতে কে কে আছে, গিন্নিমার কটি ছেলেমেয়ে, এ বৌয়ের ঘরে নাতি-নাতনী কটি, ছোট ছেলের কবে বিয়ে হল। শ্বশুর ঘর থেকে মেয়েকে আনতে গেছে মেজছেলে। মেয়ের শরীর ভাল না, কোলের ছেলেটা আঁতুরে মারা যাবার পর থেকেই তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। মার কাছে এসে দিনকয়েকের জন্য জিরিয়ে নিতে চাইছে।

শাক বাছতে বাছতে গল্প বলে মা। রাত্রে শাক হবে, বেসন-দই দিয়ে কারি আর রুটি। আঙিনা-ঘেরা দেয়ালের উপরে সারি সারি ফুলের টব। তার মধ্যে কাঁচা লঙ্কা আর তুলসীর চারাও আছে কয়েকটা। তুলসীপাতা দেখে বড়দির কথা মনে পড়ে নিরুর। বলে, 'বড়দির জন্য নিয়ে যাই কয়েকটা, কেমন?' গিন্নিমা খুশি হয়ে তুলসীগাছ ঝাড়া দিয়ে বেছে বেছে পাতা তুলে

দেন। তুলসীগাছ থেকে খুঁটে খুঁটে পাতা নিতে নেই, ঝাড়া দিয়ে তলায় যা পড়ে তাই নিতে হয়। গিন্নীমা তুলসীপাতাগুলি জলে ধুয়ে সিমপাতায় মুড়ে নিরুর হাতে দিলেন। বললেন, 'বদরীনাথের পুজোতে লাগবে, নিয়ে যাও; সেখানে এ-তুলসী পাবে না, সব বনতুলসী।'

নবদ্বীপ থেকে একদল গৌড়ীয় বৈষ্ণব অখণ্ড কীর্তন করতে করতে নেমে গেলেন নীচে—বদরীনাথ দর্শন করে ফিরলেন। নবদ্বীপ থেকে এইভাবে এসেছেন, এইভাবেই আবার নাম গাইতে গাইতে ফিরবেন।

পিপলকোটি জায়গাটি বড় মনোরম। পথ থেকে ধানখেত পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেছে। সামনের দরজা দিয়ে দেখি হাওয়ায় দুলছে ধানের শীষ, পিছনের জানালা দিয়ে দেখি ঘন মেঘের ছায়া বুটি তুলেছে সবুজ রেশমী আঁচলে। ধান এখনও পাকে নি।

ঝরনার জল সরু নালা হয়ে ধানখেতের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে মন্দগতিতে এসে পড়েছে পথেরই উপরে। কচি মেয়েটি যেন একলাফে পার হয়েছে পথ। পথটুকু পেরিয়ে জল আবার ক্ষেতের ভিতরে নেমে গেছে।

বসে বসে সেই জলে নিরু মুখ হাত ধুচ্ছে তো ধুচ্ছেই। ওঠার লক্ষণ নেই।

বড়দি এসে তাড়া লাগালেন। বললেন, 'মুখ ধুচ্ছ, না কোন্‌দিকে তাকিয়ে আছ?'

নিরু বললে, 'জানো না বড়দি, সামঞ্জস্যে ব্যাঘাত ঘটলে মনে কতখানি আঘাত বাজে। ঐ যে লম্বা ঘোমটায়-ঢাকা বিহারী বৌটি, ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে একই সঙ্গে চলেছি, কখনো পাশাপাশি, কখনো এগিয়ে, কখনো পিছিয়ে। ছিমছিমে গড়ন, পরনে মিলের শাড়ি। পায়ে বোধহয় ফোস্কা পড়ে থাকবে, ক্যাম্বিসের জুতোর সামনেটা তাই কেটে বাদ দিয়েছে। চুটকিপরা লিকলিকে আঙুলের ডগাগুলি। মাটিতে পা ফেলে, দেখে মনে হয়, ঝরাপাতাটি যেন হাওয়ায় উড়ে আলগোছে ধুলোয় এসে পড়ছে। পথ চলতে কষ্ট হলেই থেকে থেকে হাঁক দিয়েছে—"কৃষ্ণগোপাল" "মদনমোহন" "মধুসূদ—ন"। কী ডাক, যেন সুমধুর ঝঙ্কার। ঐ ডাকটুকু শোনবার জন্য বারে বারে পথে তাকে খুঁজেছি, কাছাকাছি থেকেছি। পা দেখেছি, স্বর শুনেছি, মনে হয়েছে মুখখানি না জানি কী মধুমাখাই হবে। আজ এই একটু আগে সে এসে আমার কাছে নারকেল তেল চাইলে। বললে, "তেলের শিশিটা ভেঙে গেছে, সাত-

আট দিন চুলে তেল দিতে পারি নি, জট বেঁধে গেছে। তোমার কাছে থাকে তো একটু দাও।"

'মুখ দেখে চমকে উঠলাম। উঁচু উঁচু দাঁত, দাগে ভরা। এতটুকু সৌন্দর্য, এতটুকু কোমলতা সেখানে নেই। দেখে কান্না পেল। এখনও যেন ভিতর থেকে কান্না ঠেলে ঠেলে উঠছে। ঝরনার জলে চোখের জলে মনের চাপা ভার তাই ধুয়ে ফেলছি। —এমন কেন হয় বড়দি?'

পথে পায়চারি করছে উত্তরপ্রদেশের এক অল্পবয়সী ডাক্তার। ছ মাসের জন্য এখানকার কাজে বহাল হয়েছে। যাত্রীদের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করে, রাস্তার ধারে ব্লিচিং পাউডার ছড়াবার ব্যবস্থা করে, মেথর ঝাড়ুদারের কাজের তদারক করে। যাত্রী কমে এসেছে, ডাক্তারও এখন ঘরে ফিরতে চায়। আর কটা দিন কোনো মতে কাটিয়ে দিতে পারলেই মুক্তি। বললে, 'একটা লোক পাই নে কথা বলতে, ধারে কাছে বন্ধু বান্ধব নেই, দিনের পর দিন এমনি নির্জন জায়গায় থাকি; মন আর তাই টিঁকতে চায় না।'

রাত্রে বারান্দায় বসে নবীন ডাক্তার আজ অনেকদিন পরে প্রবীণ দাদার সঙ্গে গল্প করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পিপলকোটি থেকে গরুড়-গঙ্গা চার মাইল। পরদিন ভোরে রওনা হয়ে গরুড়-গঙ্গায় এসে স্নান করলাম। চওড়া স্বচ্ছ ঝরনা। পাথর গেঁথে খানিকটা জায়গা সমতল করে রেখেছে। জল সেখানটায় এসে ছলছল করে এলিয়ে পড়ে, যাত্রীরা নিশ্চিন্ত মনে স্নান করে। স্নানের শেষে যাত্রীরা গরুড়-গঙ্গা থেকে একটি করে নুড়ি তুলে উপরে রেখে দেয়। তা হলে নাকি আর সর্পভয় থাকে না। অনেকে আবার সেই নুড়ি নিয়েও যায় সঙ্গে করে।

এ পর্যন্ত পথ একরকম ভালোই ছিল। এখান থেকে ফের চড়াই। দু মাইল দূরে টংনি চটি। খাকি মিলিটারি প্যান্ট শার্ট পরা এক পাহাড়ি বসে চা বানাচ্ছিল, আমাদের দেখে গম্ভীর ভাবে গান ধরল : তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশীষ মাগে, গাহে তব জয়গাথা। নিরু দাঁড়িয়ে যায়। বলে, 'দাদা, চা খাব।'

দাদা হাসেন, বলেন, 'হ্যাঁ বুঝেছি। একটু আগে সেধেছিলাম, কথাটা কানেও তুললে না। কি না দেরি হয়ে যাবে। হঠাৎ গান শুনে চা-তেষ্টা পেয়ে গেল।'

দোকানী খটখট হাঁটে, গ্লাস সাজায়, কুলুঙ্গি থেকে দুধ চিনি নামায়, দু গ্লাসে গরম চা ঢাল্যাঢালি করে ফেনা তোলে, আর গাইতে থাকে, 'জয় হে জয় হে— জয় জয় জয় জয় হে।' গরম চা তৈরি করে সে আমাদের এক একজনের হাতে দিল। শুনলাম আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিল। সেই সময়ে এই গান শিখেছে।

আরো দু'মাইল দূরে পাতাল গঙ্গা। পথ ধসে পড়েছিল কিছুদিন আগে। এখন মেরামত চলছে। সবে একটু একটু করে বাঁধ দিয়ে নুড়ি ফেলা হচ্ছে, বেশির ভাগ তেমনিই পড়ে আছে। কোনোমতে চলে চলে পাহাড়িরা একটু পথের মত করে তুলে কাজ চালাচ্ছে। এখানকার পাহাড়টাও দেখতে বড় অদ্ভুত। মনে হয় যেন পোড়া কয়লার বিরাট স্তূপ একটি। ঝুরঝুর করে এক এক জায়গা থেকে কেবলই পাথর ঝরে পড়ছে। গড়ানো পাহাড়, একটি পাথর পড়ে তো গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচের খদে অদৃশ্য হয়ে যায়। দুই কুলি দুদিক থেকে হাত ধরে থাকে, চোখ বুজে রুদ্ধশ্বাসে টিকটিকির মত পাহাড়ের সঙ্গে গা লেপ্টে দিয়ে পথটা পার হই। নিরু বললে, 'যাক, এক এক করে তো আসা গেল ভগবানের কৃপায়। দাদা যে-রকম কাঁপছিলেন প্রতি মুহূর্তে, ভাবছিলাম এই বুঝি গড়িয়ে পড়েন।'

পাতালগঙ্গার জল ঘোলা, যেন কাদাগোলা। আশেপাশে ঝরনা নেই। পরিষ্কার জলের তাই বড়ো অভাব। আর তারই জন্য এ-চটিতে কেউ বড় একটা থাকে না। মাটি পাথর খুঁড়ে সামান্য কিছু পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। তাই দিয়েই চটিওয়ালা কায়ক্লেশে খাওয়া-দাওয়া সারে, চায়ের দোকান চালায়।

নিরু বললে 'আরো দু'মাইল, তবে নাকি গুলাবকোঠি। আর চলতে পারছি না। এ-পথে খাবার জলের কল নেই। এদিকে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠল যে।'

তিব্বত থেকে লোক আসছে দলে দলে। ছাগল ভেড়ার পিঠে পশম বোঝাই করে নীচে নিয়ে চলেছে। দশ বারো সের মাল বইতে পারে এক-একটা ভেড়া। দিনে আট দশ মাইল হাঁটে। খানিক বাদে-বাদেই বিশ্রাম নেয় যাত্রীরা, বোঝা তুলে এক জায়গায় জড় করে রেখে ভেড়াগুলিকে ছেড়ে দেয়। সেগুলো তখন পাহাড়ের এখানে ওখানে চড়ে বেড়িয়ে ঘাস খায়। সঙ্গে থাকে জাঁদরেল দুটো কুকুর। ঘুরে ঘুরে ভেড়াগুলিকে পাহারা দেয়। তিব্বতীরাও

আগুন জ্বালিয়ে চা বানিয়ে খায়। পিতলের হাঁড়ি ভর্তি জলে চায়ের পাতা ফুটিয়ে, ছোট্ট এক-একটা বাটিতে এক হাতা করে গরম চা ঢালে আর চুমুক দেয়। দুধ না, চিনি না, শুধু চা।

ছাগল ভেড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা। সময়মত ডাকলেই যে যেখানে থাকে সব দৌড়ে কাছে চলে আসে।

গুলাবকোঠিতে দুপুর কাটিয়ে বিকেলে এলাম কুমারচটিতে। মাঝখানে আড়াই মাইল পথ। পথ মোটামুটি ভালো। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল; মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যেন গঙ্গার ধারে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছি।

সুরজমণি দোকানী কর্মপ্রয়াগের যুবক। তার বাপ-ঠাকুরদা কর্মপ্রয়াগে থাকেন, সেখানে তাদের বড় কারবার। প্রতি বছর ছ'মাসের জন্য সুরজমণিকে এখানে পাঠান হয়। এখানে এসে চটি খুলে সে দোকান সাজিয়ে বসে। গরম ঘি থেকে পকোড়ি ছেঁকে তুলে, চুল্লি থেকে কড়াই নামিয়ে, কথা কইতে কইতে সে কাছে আসে। কলকাতায় ইছাপুরে সে অনেকদিন ছিল। তাই বাঙালী দেখলে তার ভালো লাগে। বললে, 'এইবার নীচে নেমে যাব। মোট-ঘাট সব বেঁধে ফেলেছি, কেবল ঘোড়া কটা নামিয়ে আনতে যা দু-তিনদিন সময় লাগবে।' বিস্মিত হয়ে নিরু বললে, 'ঘোড়া নামাবে! কেত্থেকে?'

দূরের একটা পাহাড় দেখিয়ে দিয়ে সুরজমণি বললে, 'ঐ ওখান থেকে।'

'ওখানে ঘোড়া গেল কী করে?'

'কেন, আমরাই গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ছ'মাসের জন্য উঠে এসেছি, তাদের পিঠে দোকানের সব মালপত্র চাল ডাল চাপিয়ে নিয়ে এসেছি। এখানে আমাদেরই খাওয়ার কষ্ট তো ঘোড়াগুলোকে খাওয়াব কী? ঐ সব পাহাড়ের মাথায় অনেকখানি সমান জায়গা, আর খুব ঘাস। ছ'মাস তারা সেখানে ঘাস খেয়ে চড়ে বেড়ায়; এই তাগদ্ হয়ে যায়। আর গায়ে কী বাহারের চেকনাই খোলে।'

'বাঘ-ভাল্লুকে খায় না ঘোড়াগুলোকে?'

'বড় বাঘ নেই ওখানে, তবে হ্যাঁ, ছোট ছোট এক রকমের বাঘ আছে বটে। বড় ঘোড়াগুলোকে তারা কিছু করতে পারে না, বাচ্চা থাকলে একটা দুটো টেনে নিয়ে যায়। তাতে এমন কিছু আসে যায় না।'

একটু থেমে সুরজমণি বললে, 'আলাপ হল, ভালোই হল। কাল সকালে

আমি অনেকখানি পথ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাব। আমাকে যেতে হবে আগের চটিতে, থানায় রিপোর্ট দিতে। ঐ যে দূরে ঐ উঁচু পাহাড়টা দেখছ, মাথায় ছোট একটা মন্দিরমত, ওটা ভগবতীর মন্দির। পথ থেকে অনেক দূরে, তাই কেউ বড়-একটা ওখানে যায় না। পরশু দিন ঐ পাহাড় থেকেই একটা লোক পড়ে মরেছে। থানায় সেই রিপোর্ট দিতে যাব। সাধুমতনই হবে লোকটা। পাশের পাহাড়ের চূড়ায় যে বসতি আছে, সেখান থেকে দু-একজন তাকে দেখেছে। ভগবতীর পূজারীও সেই বসতিতে থাকে, রোজ সকালে গিয়ে পুজো দিয়ে আসে। সেদিন পূজারী যখন চলে আসে, দেখল, এক সাধু এসে বসল দেবীমন্দিরে। দেবীকে প্রণাম করে সাধু মন্দির পরিক্রমা করল, পূজাপাঠ করল, শেষে পাশের বড় পাথরটায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। রোদ উঠেছিল, পাথরও গরম হয়েছিল। সাধুর আরাম লাগল বোধহয়, একটু বাদেই তাই ঘুমিয়ে গেল। সেই ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে থাকবে। কেননা, পরে দেখা গেল মাথার কাছে গামছাটা জড় করা রয়েছে, আর পাশে রয়েছে তুলসীদাসের রামায়ণ। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। নীচে যখন পড়ে গেল, তখন তো কেউ জানতে পারে নি, বিকেলবেলা নীচের বসতির একটা লোক দেখে, খদের মধ্যে কার একটা পা পড়ে আছে। কার পা, খোঁজখোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে এই পর্যন্ত উঠে আসে। অত উঁচু থেকে পড়েছে তো, হাত পা মাথা ধড় সব টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়েছে তাই। খুঁজে খুঁজে সবই মিলল। কাল সেগুলি সব জড় করে থানায় চালান দিয়ে দিলাম।'

বড়দি বললেন, 'আহাহা, বদরীনারায়ণ দর্শন করতে পেরেছিল কি না—'

সুরজমনি বললে, 'হ্যাঁ, তা করেছিল। ওদিক থেকেই ফিরে আসছিল যে।'

আজ রাত্রে এখানেই থাকব। চটির ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। লম্বা বারান্দায় নানা দেশের যাত্রিদল। কেউ রান্না চাপিয়েছে, কেউ মশলা পিষছে, কেউ আটা মাখছে।

বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণকে দেখলাম। পাকা আমটির মত রং, স্ত্রীপুত্র পৌত্র নিয়ে সপরিবারে দর্শনে চলেছেন। এর আগে একা আরও তিনবার এসেছেন তিনি। উঁচুনিচু পথ ভাঙতে ভাঙতে থেকে থেকে মেদিনী কাঁপিয়ে

হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন ব্রাহ্মণ : 'রা—ধা—রানী'। চমকে নিরু পিছন ফিরত, মধুর হেসে গলা নামিয়ে ব্রাহ্মণ বলতেন, 'রাধে রাধে।'

সন্ধ্যে হয়ে এল। নিবিড় অন্ধকার। নিজেকে আড়াল করে বারান্দার কোণ ঘেঁষে বসে রইল নিরু। সেই হিন্দুস্থানী বৌটি আর থাকতে পারে না, গলা খুলে গেয়ে ওঠে :

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ম্যায় ফুকারু
তেরে ঘরকে সামনে।
মন তো মেরা হর্‌লি না
গোবিন্দ মধু শ্যাম নে।

বলে, 'এত ডাকি, তবু গোবিন্দ তুই সাড়া দিস না।'

মার-দিদিমার কোলে কোলে এসেছে, এদেরই তিনটি শিশু ছেলেমেয়ে। মুখোমুখি বসে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা ফিকফিক করে হাসছে।

বেলা করেই উঠলাম। এখানেই সেই বিখ্যাত ভাঙা-পথ। কয়েক কদম দূরে পাহাড় ধসে পথ ধুয়ে নিয়ে গেছে। মাত্র দু ফার্লং পথ। চোখের সামনে দেখা যায়, এই এখান থেকে অতটা ধসে গিয়েছে। এই পথটুকুর জন্য তিন মাইল উপরে উঠে অন্য একটা পাহাড় ডিঙিয়ে তবে যেতে হবে।

গত শ্রাবণ মাস থেকেই রাস্তা নেই। কী করে যে পথের সঙ্গে পাহাড়ও উবে যায়, ভাবতে অবাক লাগে। যেন হঠাৎ কেউ চলতি পথের মাঝখান থেকে খানিকটা পাহাড় কেটে তুলে নিয়েছে। এখন হয় সেই নীচে খদে নেমে ওদিকে গিয়ে আবার চড়াই ভেঙে উপরে ওঠ, নয়তো ঐ দিককার ঐ উঁচু পাহাড় টপকে পথে এস। খদে নামার চেয়ে পাহাড় ডিঙনোই নাকি সহজ। নিরু উসখুস করে, 'এইটুকু পথ, ইচ্ছে হয় এ-পার ও-পার কটা বাঁশ ফেলে দিই, মামাবাড়ির সাঁকোর মত।'

যাত্রীরা সবাই একসঙ্গে চলেছি। যেন রণাঙ্গনে যাবার জন্য তৈরি সবাই। চটি ছাড়িয়েই চড়াই। চাবড়া চাবড়া পাথরের পর পাথর। চলেছি, যেন রাবণের তৈরি স্বর্গের সিঁড়ি বাইছি। মারোয়াড়ী বৌ নাম জপে—না-রা-য়-ণ, না-রা-য়-ণ ; নামের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে, পা তোলে। ভাবি কিসে এই সিঁড়ি

ভাঙা সহজ হয়। নিরু বললে, 'বল তো, রাধা কি এই পথ দিয়ে অভিসারে ছুটে যেতে পারত? কী জানি! হয়তো পারত। সেই তো একমাত্র উপায় এই পথ অতিক্রম করার।'

একের পর এক সারি বেঁধে চলেছি। ফালি পথ, দু পাশে বনবিছুটির ঝাড়। মনের ভুলে এপাশে ওপাশে একটু ছোঁয়া লাগলেই সর্বনাশ। নিরু বললে, 'এ যেন সেই রাধার পরীক্ষা। কৃষ্ণ বলছে রাধাকে—"রাধা, তোমায় নাচতে হবে। বৃন্দা বাজাবে ঢোল, ললিতা বাজাবে কাঁসি; আর আমি, বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী। দেখো—বেতালে পা পড়বে না, গা কাঁপবে না, শাড়ি ওড়না উড়বে না, মাথার বেণী দুলবে না। তা হলেই হার।"'

থেমে একটু জিরোবার জো নেই। আগে পিছনে লোক, একজন একটু থামলেই পিছনের লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। অনেকখানি উঠে যেন একটু খোলা জায়গা মিলল। এতক্ষণ দুপাশে বনবিছুটির ঝাড় সবকিছুকে আড়াল করে রেখেছিল, কোথা দিয়ে কোথায় চলেছি বুঝবার উপায় ছিল না। এবারে একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নিরুর হাসি চিনি, ভিড়ের মধ্যে খিক্‌খিক্ হাসি শুনি তার। কী ঘটল আবার? দেখি দুটি পাহাড়ি কিশোরী দুষ্টু দুষ্টু মুখে টিপে টিপে হাসছে, আর কোমরে হাত দিয়ে তালে তালে গোড়ালি ঠুকে গান গাইছে:

যমুনা কিনারে রাধে, যমুনা কিনারে
বংশী বাজে শ্যামের বংশী বাজে।

নিরু বললে, 'এমন অবস্থায় শ্যামের বংশীর খবরে কে না উল্লসিত হয়। দুষ্টুরা জায়গা বুঝে 'তাক' ফেলতে শিখে নিয়েছে।'

হেসে সকলেই দু'চার পয়সা দিতে লাগল তাদের হাতে। ফোলা ফোলা মুখ, চোখ থেকে এখনও ঘুমের আমেজ কাটে নি, যাত্রীদের খবর পেয়ে কোত্থেকে বনবাদার ভেদ করে ছুটে এসেছে মেয়ে দুটো।

ভাবলাম, এতখানি পথ পার হয়ে এলাম, পথের কষ্ট শেষ হল বুঝি। মন বাহাদুর বললে, এখনো তো আসেই নি সে-পথ।

আরো খানিক এগিয়ে শুরু হল সেই সঙ্কটময় অভিযান। প্রথমে পাতাল-গঙ্গার মত গঙ্গা, তা পার হতে হবে। মানে একেবারে খদ থেকে উপরে উঠতে হবে। দুটো গাছ ফেলে কয়েকটা কাঠ চিরে দুটো পাথরের উপরে ফেলে

রেখেছে, গঙ্গার এপার ওপার। কাঁপতে কাঁপতে দুর্গানাম স্মরণ করি। দাদার জন্য বড়দির বিষম ভাবনা। দাদা বললেন, 'ব্যস্ত হোয়ো না, আমাকে একলা ছেড়ে দাও।' দাদা পা বাড়াতেই বড়দিও পিছন পিছন দু'দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দাদাকে আগলে আগলে চললেন। নিরু বললে, 'দেখ দেখ কাণ্ড। বড়দি যেন ঐ করে দাদাকে আগলে রাখতে পারবেন।'

ঐটুকু পুল পেরিয়ে আসতে জল ছিটকে সকলের মুখ হাত পা ভিজে গেল। এপারে এসে এবার সোজা পাহাড় বাওয়া। পাথরে, গাছের শিকড়ে, শুক্‌নো ঘাসের ঝোপে পা আটকে আটকে পায়ে-চলা-পথ যদি বা একটু তৈরি হচ্ছে, শতেক ভেড়া-ছাগলের খুরের ঠোক্করে ধুলো হয়ে আবার গড়িয়ে যাচ্ছে তা। চলতে চলতে কখনো পা হড়কায়, কখনো কাত হয়ে পড়ি, ডালপালা ঘাসের ডগা যা পাই আঁকড়ে ধরি, পড়তে পড়তে উঠি, উঠে আবার চলি। এই করতে করতে— সে যে কী করে হল, কখন হল, ভেবে অবাক হই— অনেকখানি উপরে উঠে এলাম। আর একটুখানি বাকী, তবেই একেবারে চূড়ায় গিয়ে পৌছুব।

আবার একটা বিরাট দল এল ভেড়া-ছাগলের। ওরা পেরিয়ে যাক, ততক্ষণ পথের একপাশে বসে একটু জিরিয়ে নিই। এরা যে চলে, যেন মার্চ ক'রে সৈন্যদল চলে। দলের প্রথমেই থাকে দুটো পালোয়ান ছাগল। চলতে চলতে লোক দেখলেই তারা থেমে যায়। উঁচু শিংজোড়া বাঁকিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে মনে হয় যেন রাজাধিরাজ সভাস্থলে তাঁর প্রজামণ্ডলীর স্তব স্তুতি গ্রহণ করতে এসেছেন।

'গেল, গেল, পড়ে গেল'— হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে নিরু। চেয়ে দেখি পাহাড় থেকে একটা ভেড়া গড়িয়ে নীচে পড়ছে। প্রাণভয়ে সে পরিত্রাহি চ্যাঁচাচ্ছে, আর গড়িয়ে গড়িয়ে খাদের দিকে চলেছে। রক্ষক লোকটি তবু নির্বিকার। বাদবাকি ভেড়াগুলিকে নিয়ে ধীরে ধীরে সে এগোতে লাগল। নিরু এদিকে অস্থির হয়ে ওঠে, খাদের থেকে ওটাকে কে তুলে আনবে তা হলে? এক পাহাড়ি তাকে সান্ত্বনা দেয়, 'কিছু ভেব না। ঐ দেখ না, ভেড়াটা ঐ আটকে রইল পাথরে। এখন ঐ ভাবেই থাকবে। এই দলটাকে পার করে দিয়ে তারপর লোকটা ফিরে গিয়ে ওকে তুলে আনবে।'

পাহাড়ের নীচ থেকে যাত্রীরা উপরে উঠছে, উপর থেকে ভেড়া-ছাগলের দল নীচে নামছে। দেখাচ্ছে ঠিক যেন কুম্ভমেলার শোভাযাত্রার মত।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এসেছি। ডাল পাতা দিয়ে একটা অস্থায়ী ঘর বেঁধে চা প্যাঁড়া আর পকোড়ির দোকান চালাচ্ছে কজন লোক। নীচ থেকে জল তুলে চা বানায়, চায়ের দাম তাই বেশি, মাপেও কম। পথ-শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত মানুষের কাছে তা অমৃত-সমান। ঘামে ভেজা গায়ে-মুখে ফুরফুরে হাওয়া যেন পরম স্নেহে ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিল। দোকান থেকে তফাতে একটা মসৃণ পাথর। রোদে পিঠ দিয়ে তার ওপরে গিয়ে বসলাম।

কড়া তেজ রোদের। নিরু বলে, 'নামবার পথে এবার জিরিয়ে জিরিয়ে হাঁটব। বাব্বা, লোকে বলে "কঠিন কেদার"। কেদার যদি কঠিন হল, তবে বদরী হলেন বজ্র।' এমন পথও করে রেখেছেন। ভাবতে ভয় হয়, আবার তো এই পথেই ফিরতে হবে সবাইকে।'

সঙ্গীরা বলে, 'ভগবানের মহিমা দেখ, এই বিপদসঙ্কুল দুঃসাধ্য পথ দু ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়ে আনলেন।'

কাল দেখলাম, এক যাত্রী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরছে। মাথায় পায়ে নানা জায়গায় পটি বাঁধা। বলল, এই পাহাড়েই নামবার মুখে পড়ে গিয়েছিল।

'গঙ্গে হর গঙ্গে হর' বলতে বলতে সুতোয় বাঁধা পুরু কাঁচের চশমা চোখে এক শীর্ণ জীর্ণ বৃদ্ধ অতি কষ্টে হেঁটে চলেছেন। গায়ে কুর্তা, পরনে কৌপীন, পিঠে কম্বল বাঁধা। নিঃসঙ্গ। মুখের চামড়া কুঁচকে ঝুলে পড়েছে। সামনের কাউকে দেখতে হলে মুখটা বাড়িয়ে আনতে হয়। স্ত্রীজাতি বলে চিনতে পারলে তার চলে যাওয়ার জায়গা থেকে খপ্ করে খানিকটা পথধূলি নিয়ে কপালে মাখেন। পুরুষদের নমস্কার করেন।

অবাক মানি। এই বৃদ্ধ কী করে উঠে এলেন এই পাহাড়ে! আর আমরা, ছিঃ ছিঃ, কত সামান্য কৃতিত্বে নিজেদের বাহবা দিই।

স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল নিরু। বললে, 'এইগুলিই আমি বুঝে উঠতে পারি না। মনে হয়, সারা জগৎ জুড়ে এ এক বিরাট প্রহসন চলেছে।

'সেবার দ্বারকা গেলাম। সঙ্গে ছিলেন দাদা আর বড়দি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে কৃষ্ণ এসে দ্বারকায় রাজা হয়ে বসেছিলেন। এখানেই যদু-বংশের শেষ। নীল সমুদ্রের তীরে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। ভাবলাম দেখে আসি এই ফাঁকে। নীল আকাশের তলে নীল জলে ঘেরা সাদা বালির চড়ায়

বিস্তীর্ণ নগরী, দূর দিগন্ত থেকে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কৃষ্ণের রাজধানীর উপযুক্ত স্থানই বটে।

'আগে স্নান করে পরে মন্দিরে ঢুকব। গোমতী সেখানে এসে সমুদ্রে মিশেছে। এত দৌড়ঝাঁপ, ছুটোছুটি, কলহ-কলরব, সমুদ্রের বুকে ধরা দিয়ে সব অস্থিরতার অবসান ঘটেছে তার। স্থির সুনির্মল শান্তধারা। আহ্লাদে আবেশে টলটল ছলছল। যেন প্রিয়সন্নিধানে এসে লজ্জা পেয়ে হঠাৎ থমকে থেমে আঁচলে মুখ ঢেকেছে। সোহাগভরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুহাত বাড়িয়ে সাগর তাকে বুকে টেনে নিচ্ছে। কী গভীর প্রশান্ত সুখ! প্রভাতসূর্যের রশ্মি যেন ঝিকিমিকি হীরের কুচি হয়ে সেই নীল জলের উপরে ছড়িয়ে গিয়েছে। সেই মহামিলনের মোহানায় বারে বারে মাথা ডুবিয়ে স্নান করলাম। আঁচল ভরে কুড়োলাম কড়ি, ঝিনুক, গোমতী-চক্র।

'পাণ্ডা সুর ধরে—

গোমতীগোময়স্নানং গোদানং গোপীচন্দনং।
দর্শনং গোপীনাথঞ্চ গকারাঃ পঞ্চদুর্লভাঃ ॥

'বললাম, "গোময়, গোদান পারব না। গোমতীতে স্নান করেছি, এক গয়েই আমার মুক্তি। তবে গোপীচন্দন পরাতে চাও পরাও, দেখাবে ভালো। আর এসেছি যখন, গোপীনাথকেও দেখতেই হবে একবার।"

'মন্দিরে দারুণ ভিড়। ভারতের নানা দেশের নানা লোক নানা সাজে দ্বারকাধীশকে দেখতে এসেছে। দূরে রেলিং-ঘেরা স্বর্ণসিংহাসনে রত্নালংকারে ভূষিত রাজাধিরাজ দ্বারকাধীশ। কেউ দেয় ডালা, কেউ দেয় মালা, কেউ দেয় অশন-বসন-ভূষণ; দূর থেকেই জয়ধ্বনি দেয় দ্বারকাধীশের, দূর থেকেই প্রণাম জানায়।

'এক ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ এসে হাউ-হাউ করে কেঁদে পড়লেন সেখানে। বললেন, "দেখতে এলাম একবার আমার ব্রজের গোপালকে, সে সরননী ফেলে ব্রজ ছেড়ে কেমন সুখে আছে এখানে এই নোনাজলের দেশে।"

'তার পর এল এক খঞ্জ বুড়ি। সঙ্গে বৃন্দাবনের পাণ্ডা। পাণ্ডা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বুড়িকে সে দ্বারকাধীশ দেখাবে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বুড়ি বললে, "কৈ বাবা! দেখতে তো পাচ্ছি না কিছু। আমায় একবার তুলে ধর, চাঁদমুখ দেখে জীবন সার্থক করি।"

'কানা এক বৃদ্ধ এগিয়ে যায়। চোখে দেখতে পায় না, আরো এগিয়ে যায়, একেবারে রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। রোদের তাপ যেমন করে ঢাকে তেমনি করে চোখের সামনে দুহাত জড়ো করে গলা উঁচিয়ে প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করে, একবার কেবল দ্বারকানাথকে দর্শন করবে।

'বৃদ্ধ এক পশ্চিমা দম্পতি তাদের কিশোর নাতিকে কাঁধে বয়ে এনে আছড়ে পড়ে দ্বারকানাথের আঙিনায়। নাতিটি ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে। তার পর তাদের মত সেও সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে প্রণাম জানায়। ভুরে গামছায় ঢাকা ছিল মাথা। উঠে যখন দাঁড়াল, দেখি ছেলেটির দুটি চোখই দৃষ্টিহীন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাদের নাতিকে সামনে দাঁড় করিয়ে ঠাকুরকে দেখায়, আর অঝোরে কাঁদে। কোন্ জন্মের পাপে তার এ-জন্মে এই শাস্তি! আসছে জন্মে যাতে পাপমুক্ত হয়, তার জন্য মিনতি জানায়।

'কত কাতর প্রার্থনা নিয়ে এসেছে সবাই। একবার কেবল বিশ্বপতির দরবারে সেই প্রার্থনা তারা জানিয়ে যাবে। যেন জানালেই মঞ্জুর হয়ে যাবে সব প্রার্থনা।

'মনটা হঠাৎ কেমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। একী নিষ্ঠুর খেলা। বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। সারাদিন আনমনা হয়ে দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম। শাপগ্রস্তা রুক্মিণী, নগরের প্রান্তে মন্দির। এ নিয়ে ভারী করুণ একটি কাহিনী রয়েছে। দুর্বাসার খেয়াল হল তিনি রথে বসবেন, কৃষ্ণ আর রুক্মিণী তাঁর রথ টেনে নিয়ে যাবে। রথ টানতে টানতে কিছুদূর গিয়ে রুক্মিণীর তৃষ্ণা পেল। দুর্বাসার যা ক্রোধ, ভয়ে রথ ছাড়তে পারেন না, কী করেন? কৃষ্ণকে সে-কথা বলতেই তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলে একটু মাটি খুঁড়ে দিতেই গঙ্গা উঠে এল। রুক্মিণীও জল খেয়ে বাঁচলেন। কিন্তু ব্যাপার দেখে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন দুর্বাসা— আমি থাকতে রুক্মিণী আমায় না বলে কৃষ্ণকে বলল? যাও, আজ থেকে কৃষ্ণ-ছাড়া হয়ে থাকো গে যাও।

'রুক্মিনী কৃষ্ণের পাটরানী। কৃষ্ণকে ছেড়ে তিনি বাঁচবেন কী করে। অনেক কান্নাকাটির পর অনুমতি পেলেন, বছরে একদিন তিনি কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করবেন। সেই থেকে রুক্মিণী এখানে আছেন। দ্বারকানাথ বছরে একদিন —দশহরা তিথিতে— মহা সমারোহে তাঁর কাছে আসেন, ঐ মন্দির থেকে এই মন্দিরে।

'রাজারাজড়ার প্রাসাদে যেমন রানীদের জন্ম আলাদা-আলাদা মহল থাকে, দ্বারকানাথের মন্দিরের পাশেও তেমনি আলাদা আলাদা মহলে থাকেন সত্যভামা রাধা লক্ষ্মী আর জাম্বুবতী। রুক্মিণী নির্বাসিতা, লক্ষ্মীই এখানে পাটরানী। আর রাধা হলেন কৃষ্ণের প্রিয়তমা। এদের তিনি একলা রাখতে পারেন না, প্রতি রাত্রে এসে দর্শন দেন। সেদিন বোধ হয় পূজারীদের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। সকালে গেছি, পাণ্ডার ছেলে দেখি রাধা আর লক্ষ্মীর ঘর থেকে পিতলের দুই গোপালমূর্তি বার করে আনছে। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে ঢেকে ফেলল। কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়াদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, লোকে দেখে ফেলবে, লজ্জার কথা। রাত্রে দুই মূর্তিকে দুই ঘরে এনে রেখে যায়, ভোর না হতেই আবার বার করে নেয়।

'চোখে ছানিপরা এক বুড়ি কুয়োর ধারে বসে জল খাওয়ায় যাত্রীদের। এই কুয়োতেই মন্দিরের দ্বারকানাথ প্রকট হন। আগের দ্বারকানাথ "ডাকোরে"। লোড়ানা ভক্ত তাঁকে নিজের গাঁয়ে নিয়ে যান। পাণ্ডাদের ব্যাবসা চলে না। তারা গিয়ে বললে, "ফিরিয়ে দাও মূর্তি।" ভক্ত কাঁদেন, "প্রভু আমার ঘরে এসেছেন, তাঁকে ছেড়ে থাকব কী করে?" পাণ্ডারা ফন্দি আঁটলে। তার পর বললে, "তবে মূর্তির ওজনে সোনা দাও আমাদের।"

'পাণ্ডারা নিশ্চয়ই ভেবেছিল, গরিব ব্রাহ্মণ, দুবেলা খেতে পায় না, তো এত সোনা দেবে কোত্থেকে? মূর্তিই ফিরিয়ে দেবে। রাত্তিরে কিন্তু প্রভু স্বপ্নে দেখা দিলেন তাঁর ভক্তকে। বললেন, "পাণ্ডাদের শর্তেই রাজী হয়ে যাও।" ভক্ত কেঁদে ওঠেন, "অত সোনা পাব কোথায়?" প্রভু বলেন, "স্ত্রী দুর্গাবাঈয়ের নাকে নাক-ছাবিই তো আছে।"

'সকালে ওজন হবে। দাড়িপাল্লার একদিকে দ্বারকানাথ, অন্যদিকে দুর্গা-বাঈয়ের নাকছাবি। সকলে অবাক, পাল্লার কাঠি একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে। দুদিকেই সমান ওজন। ফিরে গেল পাণ্ডারা। প্রভু তাঁর ভক্তের কাছেই রয়ে গেলেন। পরে সকলের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, "এই কুয়োতে আছি, চার মাস পরে আমাকে তুলো।" সবুর সয় না তাদের, তিন মাসেই তারা তুলে ফেলল সেই মূর্তি। ছিটুজীভাই ছিলেন সঙ্গে, দ্বারকাবাসী গৃহী সন্ন্যাসী; বললেন, "তাই এ-মূর্তি আসল মূর্তি থেকে চার আঙুল ছোট। চার

ঘাসে তুললে এটুকু তফাত আর থাকত না। ধৈর্য রাখতে পারে নি, আগেই তুলে ফেলেছিল।"

'বুড়ি ঘটি থেকে জল ঢেলে দিলে। বড়দি খেয়ে তার হাতে দুআনা পয়সা দিলেন। চোখের কাছে হাত নিয়ে দু আনা দেখতে পেয়ে বুড়ি সে কী খুশি! দেখে, আঁচলের গাঁট খুলে বড়দি তার হাতে আরো চার আনা তুলে দিলেন। বুড়ির আর বিশ্বাস হয় না। বড়দি কী ভেবে এবার একটা টাকাই বুড়ির হাতে গুঁজে দিলেন। বিহ্বল বুড়ি দুহাত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বড়দিকে আশীর্বাদ করতে লাগল—। বড়দি চোখের জল মোছেন আর চলেন, বলেন, "এইটুকুতে এত বুকঢালা আশীর্বাদ পাওয়া, বড় অপরাধী মনে হয় নিজেকে।"

'বটতলায় মন্দিরের বুড়ি সেবাদাসী, মন্দির ঝাঁটপাট দেয়, ফুলের মালা গাঁথে। বাড়ি ছিল বিহারে, বহুদিন এখানে আছে। আমায় দেখে কাছে এগিয়ে এসে গায়ে মুখে হাত বুলোয়। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না, ডুকরে কেঁদে ওঠে। কবে কোন্ যুগে মরে গেছে তার মেয়ে, সে নাকি ঠিক আমারই মত দেখতে ছিল।

'ওড়িয়া বাবা, ভদ্রাকালী, সব দেখে শুনে আরতি দেখতে যাই মন্দিরে। গিয়ে দেখি, আরতি হচ্ছে, জয়ধ্বনিমুখরিত নাটমন্দির। ধূপ ধুনো আর ফুলের সুগন্ধে চারদিক আবিষ্ট হয়ে উঠেছে।

'মা যশোদা পুত্রমুখ না দেখে থাকতে পারেন না, তাই ঠিক সামনেই তাঁর মন্দির। সেখান থেকে দ্বারকানাথকে সোজা দেখা যায় সারাক্ষণ। মেয়েরা যশোদা মায়ের আঙিনায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে সুর ধরেছে, "মা গো, সন্ধে হয়ে এল, তোমার দুলাল মাঠ থেকে ঘরে ফিরে এসেছে, ধেনুবেণু ঘরে তুলে এবার তার মুখে ক্ষীর-নবনী তুলে দাও।" নাটমন্দিরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে এক পাগল। হাতে তুড়ি বাজিয়ে একমনে সে দ্বারকাধীশকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে। মনে হল, ভক্ত নামদেব বুঝি ঠিক এমনি করেই গান শোনাতেন তাঁর ইষ্টদেবকে। সে কী একাগ্র আকূতিভরা দৃষ্টি। বিভ্রম লাগে, দেবতা কোথায়? ঐ মন্দিরে, মহাসমারোহে যেখানে আরতি হচ্ছে সেখানে, না কি অন্ধকারে, ভক্তের এই দুই নয়ন-তারার মাঝখানে?

'ভোরে উঠে রওনা দিলাম, বেটদ্বারকায় যাব। সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ। আগে নাকি এইটিই ছিল আসল দ্বারকা। সমুদ্রের জলে

রাজধানী তলিয়ে যেতে অন্য দ্বারকা তৈরি হয়। এই বেটদ্বারকাতেই দরিদ্র সুদামা রাজবন্ধু কৃষ্ণের জন্য চার মুষ্টি তণ্ডুল ভেট এনেছিলেন। "বেট" মানে অবশ্য দ্বীপও।

'বাসে উঠে বসেছি। সামনের আসনে সেই খঞ্জ বুড়ি। মানভূমে বাড়ি, অনেক দিন ধরে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বছর কয়েক আগে রামেশ্বরের পথে ভিড়ের মধ্যে কে যেন ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ট্রেন থেকে ফেলে দেয়। সেই থেকে বাঁ পা জখম হয়ে আছে। রামায়ণ-মহাভারত তাঁর মুখস্থ। বলেন, "গাঁয়ের বিধবাদের নিয়ে বসে এই সব কথাই শোনাই সারাক্ষণ। নয়ত, অল্প বয়সের বিধবা সব, থাকবে কী নিয়ে?" আমাকে তাঁর বড় ভাল লেগে গিয়েছে। বললেন, "তুমি সীতালক্ষ্মী; দেখেই চিনেছি। হাঁ হাঁ ঠিক কথা, তুমি না বললে হবে কী, চিনতে আমি ভুল করি না।"

'গোপীতালাওয়ে এসে স্নান করলাম, চা লাড্ডু খেলাম। কৃষ্ণের মৃত্যুর খবরে গোপিনীরা কাঁদতে কাঁদতে এসে এখানে দেহত্যাগ করেছিল। তাদের চোখের জলেই নাকি এই সরোবরের সৃষ্টি।

'সেখান থেকে বাসে আবার অনেকখানি গিয়ে মোটর-লঞ্চ ধরতে হবে। লঞ্চ ধরতে না পারলে বিপদ, অনুকূল হাওয়া না পেলে নৌকোতে করে পৌঁছুতে সময় লাগবে অনেক। আজ আর ফিরে আসবার উপায় থাকবে না, অথচ থাকতেও কেউ চায় না সেখানে। যেদিন যায় সেদিনই দর্শনাদি সেরে উল্টো দিকের সমুদ্র পার হয়ে ট্রেন ধরে। বাস থামতেই তাই পড়ি-মরি ছুটল সকলে; কে আগে উঠে জায়গার দখল নেবে। সে এক আতঙ্ক-অস্থির ব্যাপার। এত জোরে পা চালিয়েও এসে দেখি লঞ্চ প্রায় ভর্তি, কোনোমতে ঠেলেঠুলে একটা ধারে গিয়ে বসলাম। লঞ্চ ছাড়ল। বাইরের দিকে মুখ করে বসে আছি। নীল জল কেটে দু'ধারে সাদা ফেনা তুলে লঞ্চ চলেছে, এক মনে তাই দেখছি। হঠাৎ মনে হল, কে যেন কাঁদছে আমার পিঠের কাছে। ঘুরে দেখি সেই খঞ্জ বুড়ী। চোখের জলে বুক ভিজিয়ে সে গান গাইছে, "পুত্র হয়ে কবে দেখা দিবি রে গোপাল।" "আসছি" বলে মা যশোদাকে ফাঁকি দিয়ে মথুরায় গিয়ে রাজা হয়ে বসল কৃষ্ণ, মা বসে বসে আশায় দিন গোনেন।

'বুকটা যেন ব্যথায় মুচড়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মেঘশূন্য হাল্কা

নীল আকাশ। সেইদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, এ কেমন খেলা? বালবিধবা তিরাশি বছরের এই বৃদ্ধা সারাজীবন বুকে পুত্র-স্নেহ নিয়ে মা যশোদার দুঃখে দুঃখ মিলিয়ে আজ ভিতরে-বাইরে কেঁদে ভাসাচ্ছে। কাঁদাই যদি সম্বল হয়, তবে দেবতাতে আর মানুষে তফাত কোথায়? কী জানি বুঝি না এই রহস্য, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়।'

কথা শেষ করে হাতের নুড়িটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নিরু। বলে, 'চল যাই, দেরি করে লাভ নেই।'

ঠকাং ঠকাং, পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে নুড়িটা নীচে গড়িয়ে যায়।

এবারে পাহাড়ের উলটো দিক দিয়ে নামতে হবে। পায়ে চলার সরু সরু দাগ পাহাড়ের গা বেয়ে শতধারার মত নীচে নেমে গেছে। কোনটা ধরে নামি? কিছুটা গিয়েই গোলমাল লাগে। একটা ছেড়ে আর একটা ধরি। শেষে এক পাহাড়ী মেয়ে, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সে কলসিতে জল ভরছিল, তার নির্দেশে অন্য আর একটা পথ ধরে চোখ বুজে ছুটতে থাকি। দুপাশে খেত, জঙ্গল, বড় বড় কাঁটাগাছ। আশপাশ দেখা যায় না। চলতে চলতে বসতি পেলাম একটা। বাড়িঘরের আঙিনা দিয়েই পথ করে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাই। গৃহস্থের মাচানের লতা থেকে কাঁকড়ি কিনে খাই, তেষ্টা মেটে। পাহাড়ের বুকে, কোলে, নির্বান্ধব বসতি। কয়েকটি ঘর নিয়ে গাঁ। এক গাঁয়ে বিপদ ঘটলে আর এক গাঁয়ে সহজে তার খবর পাওয়া যায় না। দিন মাস বছর যুগ এইভাবেই এদের কেটে আসছে। আমরা শহরের মানুষ, গাড়ি ছাড়া এক পা চলতে পারি নে। এদের জীবনের সঙ্গে আমাদের এতটুকু মিল নেই কোথাও। তবু এদের অকারণ মমতায় বুক ভরে ওঠে। ছোট্ট ঘর সংসার। খেত-খামারে অল্প কিছু ফসল হয়। তাই রোদে শুকোয়, ঝাড়ে পোঁছে, বছরের আহার সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে। পাহাড়ি-বৌ জল বয়ে আনে মাথায় কলসি চাপিয়ে। মাথায় বোঝা নিয়ে পথ চলতে কষ্ট হয়, হাঁফ ধরে আসে। কচি কচি কাঙন আর জোয়ারের দানা ছিঁড়ে চিবোতে চিবোতে পথ চলে, গলা ভেজায়। বুড়ো শ্বশুর দাওয়ায়-পাতা

কার্পেটে বসে ধর্মগ্রন্থ পড়ে। পাশে শুয়ে বুড়ি শাশুড়ি তার পাঠ শোনে, আর রোদে মেলে দেওয়া পাকা গম ধানের উপর থেকে পাখি তাড়ায়।

চালে শুকোয় শশার কুচি, পাকা কুমড়োর টুকরো, বিন, আলু, লঙ্কা, লাউ। নিরু বললে, 'আমসি লঙ্কা শুকিয়ে রাখে জানি লোকে, কিন্তু শশা কুমড়ো শুকোয়, এ কখনও দেখি নি।'

খানিক বাদে ধসে-যাওয়া চওড়া পথের অন্য প্রান্তে এসে পড়ি। মাথার উপর সূর্যের প্রচণ্ড তাপ। জিরিয়ে জিরিয়ে এবারে পথ চলব।

দুপুরে ঝাড়কুলা চটিতে এসে বিশ্রাম নিলাম সবাই। নিরু বললে, 'এই প্রথম মনে হচ্ছে, পা দুটো যেন অসাড় হয়ে গেছে। কোনোমতে এদের টেনে নিয়ে এসেছি।'

চটিতে পৌঁছেই সে শুয়ে পড়ল। শুয়েই ঘুম। জাগল সেই বড়দির ডাকে। বড়দি বললেন, 'রান্না হয়ে গেছে, ওঠ, খাবে যে এবার।'

সুনীল আকাশ। মোড়ের মাথার ঝাউগাছটার ঝিরঝিরে পাতা নড়ছে আকাশের গায়ে। তার উপরে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগেছে যেন।

বহু নীচে অলকনন্দা। এখান থেকে মনে হচ্ছে যেন স্থির, অচঞ্চল; যেন তুলির একটি স্নিগ্ধ আঁচড়।

পাহাড়ের গায়ে গোলাপী ডাঁটার খেত, যেন কালো পাথরে কেউ বধূবরণের দুধ আল্‌তা গুলে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে। যেন পার্বতীর রাঙা চেলীর গাঁটছড়া বাঁধা পড়েছে শিবের রুক্ষ বল্কলের প্রান্তে।

তিন মাইল দূরে যোশীমঠ। রাস্তা ভালো। অনায়াসে তাই চলে এলাম। আগ্রহ দেখে এক দোকানী নিজ বাগান থেকে তুলে এনে দিল হলুদ ডালিয়া, লাল গোলাপ, সাদা চামেলী।

বড়দি বললেন, 'এখনই যাবে, না ফিরতি পথে?' এক দক্ষিণী সাধু তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, 'মহাত্মা দেখতে চাও তো যোশীমঠের উপরে জ্যোতির্মঠ, সেখানে সীতারাম বাবা আছেন, তাঁকে দেখো গিয়ে।'

নিরুর মনটা খারাপ হয়ে আছে। এ পথে যেতে আসতে যখনই যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সকলেই সহাস্য মুখে কথা কয়েছে, ক্লান্ত দেহমনকে নতুন করে উৎসাহিত করে তুলেছে। সে এক সহজ, অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা।

খানিক আগে আজই বিকেলে আসছিলাম যখন, দেখি, গেরুয়া রঙের বাক্স-বেডিং নিয়ে কুলিরা নামছে। গেরুয়া হলেও শৌখিন মালপত্র। উৎসাহে এগিয়ে গেল নিরু, না জানি কারা হবেন। সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত দণ্ডধারী এক সাধু দেখা দিলেন। কুলিরা বললে, জ্যোতির্মঠের মোহান্তবাবা নীচে নামছেন। নিরু একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে তাঁকে পথ ছেড়ে দিল। মোহান্তবাবা পাশ কাটিয়ে যাবার সময় নিরুকে বলে গেলেন, 'শখ করে কষ্ট করতে এ-পথে আসা কেন?' মুখে যেন তাঁর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। নিরু ভেবে পায় না, ভিতরে ভিতরে সে যে রাগের তাপ অনুভব করছে, তা কি নিজের দোষে, না ঐ মোহান্তের নিষ্ঠুর বিদ্রূপে?

বললে, 'দাঁড়াও বড়দি, মন স্থির করতে পারছি না। আগে চা খেয়ে নিই।'

কয়েক মিনিটের বিশ্রামে আর গরম চায়ের কল্যাণে শরীরে আবার নতুন করে উৎসাহ জাগে। নিরু উঠে দোকান থেকে কোঁচড় ভরে আপেল ন্যাসপাতি কিনে আনে। বলে, 'পরে হবে বলে কোনো কিছু ফেলে রাখতে নেই। চল এখনই যাই, দেখে আসি সীতারাম বাবাকে। ফিরতি পথে যদি আর না-ই আসা হয়!'

খোঁচাটা সে বড়দিকে দিল। থেকে থেকেই বড়দি বলেন, 'যদি সত্যিই ভালোবাস বড়দিকে, তবে এবার আমাকে বদরীনারায়ণের পায়েই রেখে এসো, আর ফিরিয়ে এন না।' নিরু বলেছিল, 'এ আর কঠিন কথা কী, যে-ভাবে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছ, সুসময় এল বলে। বয়ে আনবার ক্ষমতা নেই, অলকনন্দার বরফ-জলেই ভাসিয়ে দিয়ে আসব।'

সাধুসন্তের কাছে খালি হাতে যেতে নেই। ফলমূল দেখে বড়দি খুব খুশি। এত বড় আপেল সচরাচর বড় দেখা যায় না। সড়ক ছেড়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে, ধানক্ষেত গমক্ষেত মাড়িয়ে নানা ঝরনা পার হয়ে, উপরে উঠতে থাকি।

জ্যোতির্মঠ হল শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত চার মঠের অন্যতম। মঠের একটু নীচে ছোট মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেব, স্বয়ম্ভু শিব। মন্দিরের পাশে বিরাট একটি তুঁতগাছ। শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে জায়গাটিকে সুশীতল করে রেখেছে। বিরাট গাছ। আর খুব প্রাচীনও বটে। ঘেরই হবে এক শ দশ ফুট। গাছে কিন্তু ফল হয় না। পূজারী বললেন, 'হবে কী করে। ফল হলেই তো

সবাই ফল পাড়তে গাছে উঠবে। নীচে শিব। শিবের মাথা ছাড়িয়ে উপরে উঠবে কেউ, সে ত হয় না। তাই ভগবানেরই এই বিধি।'

জন-কোলাহল থেকে দূরে, নির্জনে, পাহাড়ের আশ্রয়ে, গাছে-ঢাকা শীতল ছায়ায় ঘেরা এই জায়গাটুকুতে যেন তপোবনের আবহাওয়া। তুঁতগাছের নীচে প্রকাণ্ড একটা মসৃণ কালো পাথর। যেন পাতা বিছানাটি। নিরু তাতে হাত বুলোয় আর বলে, 'লোভ হয় এইখানেই থেকে যাই। মনে হচ্ছে, এ যেন আমার কোনো পূর্বজন্মের মুনি-পিতার আশ্রম।'

সীতারামবাবা ঝরনায় গিয়েছিলেন, ফিরলেন। বলিষ্ঠ উন্নত দেহ। কৌপীনপরিহিত। মাথায় দীর্ঘ জটাজাল। জটার প্রান্ত বাম বাহুতে জড়ানো। আমাদের দেখে তাঁর প্রফুল্ল আনন হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আদর করে কুটিরের আঙিনায় নিয়ে বসালেন। বালকসুলভ সারল্য তাঁর মুখে, তাঁর ভঙ্গিতে। বললেন, 'ভিতরে জায়গা কম, তা হক, এস, ধুনির পাশেই সবাই বসি। কুঠরির মেঝেয় প্রকাণ্ড ধুনি। একপাশে তিনি বসলেন। অন্যদিকে আমরা। আমরা বাঙালী শুনে সীতারামবাবা খুব খুশি। বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যায় ভি বাংলা জানে। আসামে কামাখ্যামে অনেক বরষ থেকেছি।' মহা উৎসাহে তিনি বাংলা বলে যান। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহ দেখেছেন; বলেন, 'এই ত সেদিনের কথা। এর মধ্যে আবার কত যুদ্ধ-বিদ্রোহ হয়ে গেল। শুনেছি নিজের দেশেও ভাইয়ে-ভাইয়ে কাটাকাটি হল।'

আড়াই বছর বয়সে সংসার ছেড়েছেন সীতারামবাবা। সেই থেকে সাধু-সঙ্গে আছেন। গুরু দেহ রাখবার পর ভারতের নানা স্থান ঘুরে এখন কুড়ি বাইশ বছর যাবৎ এখানেই আছেন। কোথাও যান না, ভিক্ষাও করেন না। বলেন, 'দাতা প্রভু, তিনি যখন যা প্রয়োজন মিলিয়ে দেন। সেই দাতা হলেন রাম। তাই কবি বলেছেন—

> কাহে সোচে কর নর রাম ভজন বিনা বহে দিনা।
> ইষ্ট কুটুম্ব ছোড়হি আশ অসার সংসার হরিনাম বিনা॥
> স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম প্রতিপালন করহি একজনা।
> কবি সত্য কহে মন স্থির রহো যো দিয়ে দন্ত সো দিয়ে চানা॥

তাঁর উপরেই নির্ভর করে থাক। কিছু না, সকালে-বিকেলে দু'বার একটু

তাঁর নাম কর, তাঁকে ডেকো, গৃহস্থ মানুষের এতেই সব হবে।' হেসে বললেন, 'আমিও তাই। সন্ন্যাসী নই, ভগবানের দাসমাত্র।'

সকলকেই তিনি 'সীতারাম' বলে সম্বোধন করেন, তাই সবাই তাঁর নাম দিয়েছে 'সীতারামবাবা।' গল্পে জমে গিয়ে উঠতে ভুলে যাই। সন্ধ্যে হয়ে আসে দেখে তিনিই তাড়া দিলেন। বললেন, 'আমার আর কী আছে, কী দেব ? এই বিভূতি নিয়ে যাও, ঘরে ফিরে বালবাচ্চাদের কপালে মাখিয়ে দিয়ো।' বলে ধুনির ভস্ম এনে আমাদের হাতে হাতে তুলে দিলেন। বড়দির শখ সীতারামবাবার একটা ফটো তোলেন। খুশি হয়ে তিনি বাইরের আলোয় এসে দাঁড়ালেন।

ফিরতি পথে গল্প করতে করতে নামি সবাই। সীতারামবাবাকে বড় ভালো লেগে গিয়েছে। দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল তিনি ভজন গেয়ে কাটিয়ে দিলেন। দেহের বাঁধন এখনো অটুট। আর কী নম্রতা !

বড়দি বললেন, 'ও কী করছ নিরু ? মুঠো মুঠো ধানশীষ ছিঁড়ছ কেন অমন করে খেত থেকে ?'

নিরু বললে, 'সীতারামবাবার সংসার থেকে কিছু অন্ন সংগ্রহ করে নিচ্ছি।'

কেদারের যেমন উখীমঠ, বদরীনাথের তেমনি যোশীমঠ। শীতকালের ছ মাস এখানে তাঁর পুজো হয়। নিরু আজ আর বার হল না। বড়দিরা গিয়ে মন্দির দেখে এলেন, আরতির আগুন স্পর্শ করলেন।

ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ আছেন এই চটিতে। নিরুকে বললেন, 'ঐ যে দুপাশে দুই পাহাড় দেখছ, ভাগবতে ওর বর্ণনা আছে। ঐ হল 'নরনারায়ণ' পর্বত। এই দুই পাহাড়ের কোল দিয়ে যে পথ, কাল সেই পথেই আমরা বদরীনারায়ণে যাব।'

পরের দিন ভোর-ভোর সময়ে যোশীমঠ ত্যাগ করি। দু মাইল একটানা উতরাই। তার পর বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুগঙ্গা আর অলকনন্দার সঙ্গম। যোশীমঠ হল বিষ্ণুগঙ্গার পারে। এবার বিষ্ণুগঙ্গাকে ছেড়ে অলকনন্দাকে বাঁয়ে রেখে তীরের পথ ধরি। দুপাশে উঁচু পাহাড়। বেলা হয়েছে, তবু চাপা পথে এখনো আলো এসে পড়ে নি। ঠাণ্ডা পথ, শীত-শীত হাওয়া, কখনও ঢালু, কখনো চড়াই। সামনে পিছনে নীল আকাশ, পাথরের গায়ে হালকা কয়েকটা পাইনগাছ। আর আমরা এক সার মানুষ পর্বতের কোলে কোলে পিঁপড়ের মত হেঁটে চলেছি। এ এক আলাদা জগৎ।

নীচ থেকে পাহাড় বেয়ে ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে পথে উঠে এল গাঁয়ের এক বৌ। নিশ্বাসে সাঁই সাঁই শুক্‌নো শব্দ। যেন বাইরের হাওয়াটা ভিতরে ঢুকে বুকের কোন্ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে আবার বেরিয়ে আসছে।

নিরু বললে, 'নিশ্বাসের আওয়াজটা শুনলে? নরম কিছু যেন নেই ও বুকে। কী করেই বা থাকবে। পাষাণে গড়া প্রাণী যে। কী লড়াইটাই না করে জীবনভর।'

কচি ছাগশিশুর কান্না শুনতে পাই। কিন্তু কোথায়? ভীতকম্পিত মিহি ডাক। খুঁজে খুঁজে দেখি, ঢালু খদে ঝোপের মধ্যে ছোট্ট একটা ভেড়া।

আসতে আসতে দেখলাম, পালে পালে ভেড়া নীচে নেমে চলেছে। প্রায় দলেই দুটি-চারটি শাবক। মায়ের সঙ্গে অপটু পা নিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে, দলের রক্ষক দরকারমত তাদের কোলে তুলে নেয়। খানিক আগেও দেখলাম, একদল নামল। সকলের পিছনে তাদের পালক চলেছে, বুকে পিঠে পাহাড়িরা যেমন ছেলে বেঁধে চলে, তেমনি দুটি ভেড়ার বাচ্চা বেঁধে নিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'অমন করে নিচ্ছ কেন?' পরম আদরে সে বুকের বাচ্চাটিকে আর একটু চাপ দিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললে, 'কালই হয়েছে সবে, গায়ের গরম না পেলে বাঁচবে কেন? তাই এইভাবে নিজের শরীরের ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে চলেছি।' বলে গায়ের কোটটা টেনে বাচ্চাটিকে ভালো করে ঢেকে নিল। সেই দলে ছোট বাচ্চা আরো কয়েকটা ছিল। তাদেরই একটা এখানে পড়ে গিয়ে থাকবে হয়তো। মনিব কুকুর কেউ জানতে পারে নি।

অসহায় বাচ্চাটিকে এখন ফেলে যাই কী করে? জনশূন্য পথ। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এর পরে যারা যাবে, এই ক্ষীণ স্বরটুকু তাদের কানে হয়ত না-ও পৌঁছুতে পারে। বড়দি বললেন, 'ব্রজরমণ, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ।' রাস্তা থেকেই সোজা অনেকখানি নেমে গিয়েছে খদ। সহজে নামবার উঠবার উপায় নেই। তবু রক্ষা, বাচ্চাটা ঝোপে আটকে আছে। ব্রজরমণ রাস্তার উপরে শুয়ে পড়ে যতটা পারল নীচে হাত বাড়িয়ে দিল। নিরু তার কোমরের কাপড়টা টেনে ধরল। বললে, 'আরো ঝুঁকে পড়। ধরে আছি আমি, নিশ্চিন্তে ঝুঁকে পড়।' আর হাত তিনেক বাকী। নিরু তার লাঠিটা দিল ব্রজরমণকে। লাঠির মাথার দিককার ঘোরানো জায়গাটা আংটার মত করে বাচ্চার পেটের নীচে গলিয়ে দিয়ে ব্রজরমণ তাকে

টেনে তুলল। বড়দি তাড়াতাড়ি চাদরটা খুলে বাচ্চাটার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'সবে তিন-চার দিনের বাচ্চা এটা, আহা, শীতে ভয়ে আধমরা হয়ে এসেছে।' এখন কী করা যায় এটাকে নিয়ে? সঙ্গে রাখা যাবে না; নিজেরাই চলতে পারি না, আবার একে বইবে কে? সামনে ঘাটচটি। সেখানে এসে চটিওয়ালাকে বলতে সে সাগ্রহে বাচ্চাটাকে চেয়ে নিল। চটিওয়ালার যুবতী মেয়ে এসে তাকে বুকে তুলে নিল। বললে, 'নিজের বাচ্চার মতই একে পালব, দুধ খাওয়াব, কোলে কোলে রাখব সারাদিন।'

খেত-ভরা ডাঁটা যেন ফুলের বাগান। লাল, গোলাপী, কত রকমের রঙ। এত বীজ রেখে করবে কী? জিজ্ঞেস করতে একজন বললে, 'এগুলি "রামদানা", ব্রত-উপবাসের দিন পিষে রুটি খাই।'

গৃহস্থের ঘরের আঙিনায় তিন সতীনে ঝুটোপাটি করছে। বড় দুজন মিলে ছোটটির বিহুনি ধরে টেনে বসায়। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে হবে। ছেলের মা ঝট্‌কা মেরে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। হাসতে হাসতে ছুটে পালায়, আর মোটা ঘাসের ডাঁটা চিবিয়ে রস খায় আখের মত করে।

ও পাশের পাহাড়ে একদল বানর লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখাচ্ছে এই এতটুকু, ইঁদুরের দল যেন ছুটোছুটি লাগিয়েছে।

বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে সাত মাইল দূরে পাণ্ডুকেশ্বর। প্রবাদ, এই পাণ্ডুকেশ্বরেই নাকি পাণ্ডুরাজ দেহত্যাগ করেন। পাণ্ডবরা পিতার নামে নারায়ণবিগ্রহ স্থাপন করে স্মৃতিরক্ষা করলেন।

বাঁধানো আঙিনার মাঝখানের পাথরটায় একটুখানি গর্ত করা। দোকানীর আট-নয় বছরের মেয়েটা কুলোয় করে তাতে সেরখানেক ধান ফেলে মস্ত একটা উদুখল নিয়ে তা ভানতে লাগল। বাপ মেয়ে থাকে দোকানে। ধান ভানা হলে ভাত রেঁধে খাবে। দু-চার বার উদুখল ঠুকেই মেয়েটি ধান ঝাড়ে, আর কুলোর ডগায় যেটুকু খুদ বের হয়, তুলে নিয়ে মুখে ফেলে। দেখে অন্য দোকানীর মেয়েটিও ছুটে এল। এবারে ভাগাভাগি করে খুদ খেতে থাকল দুজনে। উপরের বারান্দায় বসে নিরু আর বড়দি হেসে কুটিকুটি। বলেন, 'ভাত রাঁধবে আর কী দিয়ে? যেটুকু চাল বার হচ্ছে—চিবিয়েই তো শেষ করে দিল।' পথ দিয়ে যাচ্ছিল তাদেরই বয়সী এক ছেলে, পিঠে ঘাসের বোঝা। মেয়ে দুটি কুলো, উদুখল্ ফেলে ছুটে গিয়ে পিছন থেকে দুটো

ঘাসের গোছা টেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। বোঝার ভারে ঝুঁকে চলছে ছেলেটা, মেয়ে দুটো তার নাকে ঘাসের শিষ ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিয়েই দৌড়ে পালাচ্ছে। দু-হাত আটকা ছেলেটার, পিঠের দিকে হাত ঘুরিয়ে বোঝা ধরে আছে, কিছুতেই আর পেরে উঠছে না তাদের সঙ্গে। শেষে সে রেগে বোঝাটা পথে ফেলে দিয়ে একছুটে পাশের মেয়েটাকে ধরে দুমাদুম এলোপাথারী কিল বসিয়ে দিল। এটার পালা শেষ হলে ধরল আর একটাকে। মনের ঝাল মিটিয়ে নিয়ে বোঝাটা পিঠে ফেলে পা চালিয়ে চলে গেল সে।

চোখের জল মুছে দুই সখীতে ধানের কাছেই ফিরে এল আবার, উদুখল তুলে নিল। আবার কিছু চাল, খুদ ভাগাভাগি করে খেল। ধান ভানা প্রায় হয়ে এসেছে। আর এক মুঠ খাবার জন্য হাত বাড়াল অন্যটি। না, আর নয়। কম পড়ে যাবে। ঘাড় নেড়ে বারণ করে পোয়া দেড়েক চাল কুলোয় ঝেড়ে ঘরে ঢুকে গেল আগের মেয়েটি।

রাস্তার কলে বেজায় ভিড়। ছোট ছেলের কাঁথা-কম্বল নিয়ে এসেছে পাহাড়ি-বৌ। ঝুড়িবোঝাই পোড়া হাঁড়ি কড়াই এনে মাজতে বসেছে কেউ, কেউ এসেছে খাবার জল ভরে নিতে। মেজদি বললেন, 'দেখ কাণ্ড, নোংরা কাপড়গুলি জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধোবে, তা নয় কেবল ময়লা জায়গাটুকু ধুয়েই বালতিতে তুলে রাখল।'

নিরু বললে, 'রোদ নেই যে, শুকোবে কী করে অত ভারী কম্বলগুলি ?'

কেন জানিনে, মনবাহাদুরের মন আজ বেজায় খুশি। কলতলাতেই বৌ-ঝিদের ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে জল নিয়ে স্নান করল। ছোট কুলিটা ভাত-ঝোল রেঁধেছে, তাই খেল। খেয়ে, দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে গামছাটা মাথায় দিয়ে কলতলার কাছে শুয়ে আরাম করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

বিকেলে তিন মাইল পেরিয়ে লামবগড় এলাম। একদল ভুটানী স্ত্রী-পুরুষ নেমেছে নানা জিনিস নিয়ে, বস্তা বোঝাই করে। ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, তাঁবু, খাটিয়া, বাচ্চাকাচ্চা—পুরো সংসার তাদের সঙ্গে। কৈলাসের জড়িবুটি নিয়ে এই সময়ে তারা নীচে নামে।

দেখলাম, গাছের শিকড়, খণ্ড খণ্ড করে কাটা। তারা বললে, 'এর নাম

আরচা। কেটে গেলে বা চোট লাগলে চন্দনের মত ঘষে একটু জল মিশিয়ে গরম করে লাগিয়ে দিলে ভালো হয়ে যায়। এক-এক টুকরো এক-এক আনা দাম।' নিরু কিনে নিল দু আনার।

'এটা বুত্‌কেশ, এও একরকমের ছোট গাছের শিকড়। দেখতে অনেকটা ছোবড়ার মত। একটু একটু করে আগুনে দিলে খুব সুন্দর গন্ধ হয়, ধূপের মত।' নিরু কিনলে কয়েকটা। মাকে দেবে।

'এ হচ্ছে চোরা। মসলার মত বেটে ডালে দিতে হয়, অন্য ফোড়নের দরকার হয় না আর।' দিদির রান্নার শখ। তাঁর কথা মনে করে এও কিছু সংগ্রহ করল নিরু।

'আর এ হল জম্বু।' নাম শুনেই লাফিয়ে ওঠে নিরু। এ তো নিতেই হবে খানিকটা। সারা পথ সে মনে রেখেছে এই নাম। জ্ঞান মহারাজ বলে দিয়েছিলেন, 'জম্বু নিতে ভুলবেন না যেন, শাক-সবজিতে তেল-ঘিয়ের সঙ্গে ফোড়ন দিয়ে রাঁধলে ঠিক হিং রসুন দিয়ে রান্না তরকারির মত সুগন্ধ হবে। শুদ্ধ জিনিস। বিধবারাও খেয়ে থাকেন।'

ভুটানী গিন্নী তার চামড়ার ছোট্ট থলি থেকে জম্বু বের করে দিতে দিতে বললে, 'এ খুব ঠাণ্ডা জিনিস। তোমাদের গরম দেশের লোকেরা খুব খায়। আমরাও খাই।'

সঙ্গে অনেকগুলি ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা ভুটানী কুকুরের বাচ্চা। বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে। এক একটার দাম পঞ্চাশ টাকা।

প্রৌঢ়াটি বড় হাসিখুশি। মুখশ্রী বড় স্নিগ্ধ। একরকমের মুখ আছে, দেখলেই ভালো লাগে, ভালোবাসতে ইচ্ছে যায়, এ মুখ ঠিক তেমনিই। প্রৌঢ়া বললে, 'ওপাশে চটির ঐ প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছে। চা খেয়ে জিরিয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এস একবার, দেখে যেও।'

তাঁবু ছাড়া চটিতেও আশ্রয় নিয়েছে কয়েকদল ভুটানী। তামার, কাঠের বাসনপত্র, চামড়ার বিছানা-ব্যাগ, যা দেখি সবই বড় সুন্দর ঠেকে। ছোট ছোট চামড়ার থলি রয়েছে সঙ্গে। তার কোনোটাতে নুন, কোনোটাতে চা, কোনোটাতে মাখন। লোমের দিকটা থাকে ভিতর দিকে। একটা লম্বা মোটা কাঠের চোঙায় চা ফোটানো গরম জল ঢেলে তাতে নুন মাখন দিয়ে আর একটা কাঠ ভিতরে ঢুকিয়ে উদূখলের মত ঘুঁটে ঘুঁটে চা বানিয়ে দেয় বৌ। স্বামী

কম্বলের গদিতে বসে তামা-বাঁধানো ছোট্ট কাঠের বাটিভরা ছাতু নিয়ে একটু একটু চা ঢালে আর চুমুক দিয়ে খায় যখন, মনে হয় যেন সম্রাট।

নিরু বললে, 'ছাতু তো গলল না সব।' সে হেসে বাটিতে আবার একটু চা ঢেলে আবার চুমুক দেয়। বলে, 'এক চুমুক চায়ের সঙ্গে যেটুকু ছাতু গলে মুখে যায়, সেটুকুই খাই। আবার ঢালি, আবার খাই। এমনি করেই চা খাওয়ার নিয়ম আমাদের।'

কালী কমলীওয়ালার দোতলা চটি। কাঠের রেলিং ঘেরা বারান্দা। এক বাঙালি মহিলা টাকা দিয়েছেন এই বাড়ি তোলার। চা খেয়ে নিরু কম্বল বিছিয়ে বারান্দায় পা মেলে বসেছে। এবেলা তার ছুটি। দোকান ঘুরে চাল ডাল দুধ আলু কিনে এনে দিয়েছে, রান্নার দিকে এখন এগোবে না। সে-ভার বড়দি নিয়েছেন। সব-জিনিসই আক্রা এখানে। দুধের সের নিল এক টাকা চার আনা। বললে, 'এখন তো তবু সস্তা, যাত্রার সময় চার টাকা পর্যন্ত দাম ওঠে প্রতি সের দুধের।'

'জয় বদরী বিশাল।' হাসতে হাসতে সুব্দা এসে নিরুর পাশে বসল। ছোট্ট ছেলেটা। বছর দশেক বয়স হবে, দেখে মনে হয়, আরও কম। সিয়াসৈন থেকে এসেছে এক যাত্রীর সঙ্গে, মোট বয়ে নিয়ে। ভাড়া যা পায়, খেয়েই উড়িয়ে দেয়। নিরু হিসাব নেয়, মাঝে মাঝে রুটিটা পরোটাটা তার জন্য তুলে রাখে। বলে, 'ছেলেটা ওবেলা খায়নি কিছু, দেখেছি।'

সুব্দা আজ খুব খুশি, পেট পুরে খেয়েছে। বললে, 'এক রুপেয়া পুরা খা ডালা দুপরমে। নয় আনার চাল ডাল, পাঁচ ছটাক চাল আর আড়াই ছটাক ডাল, চার আনার ঘি এক ছটাক, এক আনার নিমক, চৌদ্দ আনা। আর ছয় পয়সার ম্যাচিস আর দু পয়সার চারটা বিড়ি। এ বেলা আউর কুছ নেহী খায়েগা।'

পশ্চিম প্রান্তে সূর্য ডুবে যায়। পাহাড়ি আলো কী মায়া ছড়ায়, আনমনে পায়চারি করতে করতে নিরু এসে দাঁড়ায় প্রৌঢ়া ভুটানীর তাঁবুর ধারে। ভিতরে অনেক লোক, কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। কী জানি কে কেমন হবে, ঢুকলে যদি রাগ করে তারা? সে কোথায়, যার মুখ তাকে টেনে আনল এখানে? বাঁধা ঘোড়াগুলি ডেকে ওঠে। ঝোপের ধারে আবছা আলোয়

দেখা যায়, চটির প্রৌঢ় দোকানী সেই প্রৌঢ়া ভুটানীর রুক্ষ বাঁ হাতখানি দুহাতে তুলে পরম আদরে তার বুকে চেপে ধরেছে।

নিঃশব্দে, হালকা পা ফেলে নিরু পিছু হটে আসে।

এখানেও আবার ভালুকের ভয়। ভালো করে অন্ধকার না কাটা পর্যন্ত যাত্রীরা কেউ পথে বার হয় না। বদরীনাথে যেতে এই শেষ চটিতে রাত্রিবাস। আজই দুপুরে সেখানে গিয়ে পৌঁছুব। ধৈর্য যেন আর বাঁধ মানতে চায় না।

হনুমানচটি অবধি রাস্তা বেশ ভালো। তার পর কেবলই চড়াই। অলকনন্দার গম্ভীর গর্জন উপরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে যেন এক মহা প্রলয়ের আভাস জাগিয়ে তুলেছে। পথের উপরেই হঠাৎ বসে পড়ে নিরু। বলে, 'এমন তো আগে কখনো হয় নি, উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘোরে। কতক্ষণ থেকে চেষ্টা করছি, কিছুতেই সামলাতে পারছি না।' হাত নেড়ে সে বড়দিকে ইশারা করে, 'চলে যাও তোমরা। দিন-দুপুরের পথ, আমি চলে আসব ঠিক।'

ব্রজরমণকে সঙ্গী রেখে তাঁরা এগিয়ে যান। নিরু দু পা হাঁটে আর হাঁটুতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে। বড়দির আদেশ, ব্রজরমণ সঙ্গ ছাড়ে না। নিরুপায় নিরু আবার পা চালায়।

সেই বাঙালি দল আজ ঘরে ফিরে চলেছে। কেদারবদরী সব দর্শন হয়েছে, মনোবাঞ্ছা পুরেছে। ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঘোড়া, কুলি—পরপর সেই বিরাট মিছিল। ডাণ্ডি থেকেই মুখ বাড়িয়ে বৌটি শুধোয়, 'এ কী, আজ যে আপনি এত পিছনে?'

নিরু ঘাড় নাড়ে। বলে, 'এসেই তো গেছি, আর ভাবনা কী?

এগারটায় পৌঁছবার কথা, এখন বেলা একটা। ঐ বুঝি দেখা যায় বদরীনাথের তুষারশৃঙ্গ। দূরে দৃষ্টি চালিয়ে দেয় নিরু। এক পাণ্ডার ছোট ভাই, বছর পনেরোর ফুটফুটে ছেলেটি, বাঙালি দলকে পথে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসে। বলে, 'ঐ দূরেরটা নয়, ওটা কেদারনাথ, কাছের বাঁ দিকের এই চূড়াটা হল বদরীনাথের। সামনের উঁচু পাথরটা পার হয়ে যাও। তার পরেই শহর স্পষ্ট দেখা যাবে। আর একটুখানি পথ।'

ছেলেটি স্কুলে পড়ে, ছুটির সময় এসে ভাইয়ের কাজে সাহায্য করে। পিতৃ-পুরুষের ব্যাবসা। বড় ভাই সুনাম কিনেছে এই কাজে, বহুজনের কাছে তাঁর নাম শুনেছি। আমরাও তাঁকে পেলে খুশি হতাম। আগে থেকে অন্য ব্যবস্থা হয়েছে, কী আর করা যায়।

দাদার গর্বে ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'সে গেছে দলের সঙ্গে সঙ্গে; পাতালডাঙার ভাঙা পথ পার করিয়ে দিয়ে তবে ফিরে আসবে।' নিরুর মনে দারুণ কৌতূহল, ঐ রাজা আর রানীমা ভাঙা পাহাড় পার হলেন কেমন করে? ডাণ্ডিতে যাওয়া তো সেখানে অসম্ভব। পথে আসতে আসতে এ নিয়ে সে প্রশ্নও করেছে অনেককে। ছেলেটিকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই সে হাসতে লাগল। তার পর বলল, 'ওদের কোমরের সঙ্গে নিজেদের কোমরে লম্বা দড়ি বেঁধে, চার চার কুলি আগে, চার চার কুলি পিছনে, টেনে টেনে পাহাড়ে তুলেছে।'

বদরীনাথের মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ঝিকমিক করে নগরের মাঝখানে। এ এক বিরাট বসতি। বাংলো, বাড়ি, কুটির, প্রাসাদ, দোকান, সড়ক—সব মিলিয়ে জমজমাট লোকালয়। বাজারের ভিতর দিয়ে পথ। পাণ্ডা এসে আমাদের তার বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়ি মানে যাত্রীশালা, যাত্রীদেরই টাকা দিয়ে গড়ে রেখেছে। নিজে থাকে নীচের একটা ঘরে। স্ত্রীপুত্র আছে দেশের বাড়িতে। অর্থাৎ পাহাড়েরই কোনো বসতিতে।

এসে পৌঁছে গেছি, আর কোনো তাড়াহুড়ো নেই। নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে সন্ধ্যের আরতির সময় বদরীনাথকে দেখতে যাব।

নিরু বললে, 'গল্প জান বদরীনাথের! জান, কেন হল এই নাম? পথে আসতে এক পাণ্ডার সঙ্গে ভাব হল, তাঁর কাছেই শুনেছি। নারায়ণ এলেন তপস্যা করতে। তা স্ত্রীর ধর্মই হল পতির সেবা করা। রৌদ্রতাপ থেকে ভগবানকে রক্ষা করবার জন্য লক্ষ্মীদেবী বদরীবৃক্ষ হয়ে তাঁকে ছায়া দিতে থাকলেন। বদরী মানে কুল। সেই থেকে নারায়ণ এখানে বদরী-নাথ নামে আখ্যাত হলেন।

'পুরাণে আছে, সহস্রকবচ মহাদৈত্য মহাদেবের আরাধনা করে বর লাভ করে যে, তার শরীর সহস্র কবচ অর্থাৎ বর্ম দ্বারা আবৃত থাকবে, আর একসঙ্গে যাঁর দশ সহস্র বৎসরের ধ্যান-সাধনা আছে, কেবল তিনিই তার

সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবেন। বর দেবার সময় তো আর দেবতাদের খেয়াল থাকে না, পরে কপাল চাপড়ে মরেন। বর লাভ করে দৈত্য তখন বেপরোয়া, দেবলোক আক্রমণ করে ব্রহ্মাকে সে যুদ্ধে আহ্বান করল। ব্রহ্মা বললেন, "বৎস, আমি বৃদ্ধ। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমার আর কী বীরত্ব প্রকাশ পাবে? তুমি মহাদেবের কাছে যাও।"

'মহাদেব বললেন, "হে বীর, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব, এমন ধ্যান-সাধনা আমার নেই। আর একজন মহাধ্যানী বদরীবৃক্ষের নীচে ধ্যান করছেন, তার কাছে যাও, তাঁকে জয় করতে পারলেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।"

'দায় উদ্ধারের ভার পড়ল বিষ্ণুর উপরে। দেবতারা বিপদ দেখে আগেই তাঁর শরণ নিয়েছিলেন। বিষ্ণু বললেন, "আচ্ছা, আমি এর প্রতিকার করছি।" নর আর নারায়ণ, এই দুই রূপ ধরে দুই পাহাড়ে গিয়ে তিনি তপস্যায় বসলেন। দৈত্য এল রুখে। তা এখানকার মাহাত্ম্যই হল একদিন তপস্যা করলে দশ সহস্র বছর তপস্যার ফল হয়। মায়ামুগ্ধ দৈত্য নর-নারায়ণের তফাত বুঝতে পারে নি। একদিন নারায়ণ যুদ্ধ করে একটি কবচ নষ্ট করেন; আর পরদিন নর যুদ্ধ করেন, নারায়ণ তপস্যায় বসেন। এই করে করে ন শো নিরানব্বুই দিনে দৈত্যের ন শো নিরানব্বুইটা কবচ নষ্ট হল যখন, বাকি একটিমাত্র কবচ নিয়ে সে পালিয়ে বাঁচল। কথিত আছে, সেই দৈত্যই নাকি কুন্তী দেবীর প্রথম সন্তান কর্ণ। কবচকুণ্ডল নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে-জন্মে অর্জুনের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।'

বদরীনাথের ছোট্ট মন্দিরের ছোট্ট নাটমন্দির, অল্প লোক ঢুকলেই ভিড় জমে যায়। আরতির সময়ে সবাই চায় আরতি দেখতে। ব্যবস্থা এখন সরকারের হাতে। রাওয়ালজী পূজা করেন, আর ব্রাহ্মণেরা দরজা আগলান, ভিড় সামলান। মন্দিরের ভিতর সে এক হৈহৈ-রৈরৈ ব্যাপার। দেখে মন বড় দমে যায়।

সকালে উঠেই নিরুর বকবকানি শুরু হয়েছে। বলে, 'আর পারি নে আমি। সারারাত ঘুম হয় নি। তার উপরে আবার এই দেখ, কম্বল থেকে কিসে যেন কামড়েছে, পিঠে চাকা চাকা দাগ। আর শোব না এখানে।' হিড়হিড় করে সে ঘরের অন্যদিকে তার বিছানা-বালিশ টেনে নিয়ে গেল।

পথের দু ধারে দোকান। দোকানে হরেক রকমের জিনিস। চামর, বীজন, থালা, ঘটি, ফল, মণ্ডা, কম্বল, আসন, ফটো, পট। ঘুরে ঘুরে দেখছি আর কিনছি। এক দোকানীর ঘরে বসে গল্প করতে করতে তামাক খাচ্ছিল একজনা, নিরু আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল, 'এই তো সেই।'

সে বললে, 'কী?'

নিরু বললে, 'তুমিই তো কাল মন্দিরের ভিতরে সোরগোল তুলেছিলে যাত্রীদের ধমক-ধামক দিয়ে। এত কষ্ট করে সবাই দেবদর্শন করতে আসে, তা দেবতাকে দেখবে কী, তোমাদের ধমক খেয়েই মেজাজ বিগড়ে যায়।'

ব্রাহ্মণ বললে, 'কী করব মা বল? বুঝি তো সব, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টাভর দেখেও সাধ মেটে না। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলে না, সবাইই দেখতে চায়। ভিড় ঠেলে বের করে না দিলে বিপদ। হুঁশ থাকে না কারুর, ছোট্ট জায়গা, একসঙ্গে সবাই ঢুকে পড়ে। ফি বছরই ভিড়ের চাপে মারা পড়ে চার-পাঁচ জন। বললে শোনে না, ধমক না দিয়ে উপায় কী?'

'তবু, মন্দিরের ভিতরে অমন ব্যাপার কি কখনো ভালো লাগে। যতটুকু সময় থাকা যায়, স্থির মনেই থাকতে চায় সবাই। তা নয়, কখন ঘাড়-ধাক্কা খাবে, এই ভয়েই মরে।'

ব্রাহ্মণ হেসে ওঠে। বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা মাঈ, তুমি এস, যতক্ষণ ইচ্ছা দেবতাকে দেখ, ধ্যান কর, আমি কিছু বলব না।'

নিরুও হাসে। ঝগড়ার নিষ্পত্তি হাসি দিয়ে ঘটলে সে বড় সুখের হয়।

মন্দিরের কিছুটা নীচে তপ্তকুণ্ড, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বেশ বড়। দলে দলে লোক এসে গা ডুবিয়ে আরাম করছে। কুণ্ডের পাশে ছোট্ট একটা খুপরি। নিরু বললে, 'এই কি সেই গোফা? শুনলে না গল্প? এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বদরীনাথ দর্শনে আসছেন। জীর্ণ দেহ, পা টিপে টিপে পথ চলছেন। দু পা চলেন আর বিশ্রাম নেন। তৃষ্ণায় বুক ফাটে, ক্ষুধাও অসহ্য। প্রাণপণ করে তিনি এগোচ্ছেন। যাত্রীরা দর্শন সেরে নেমে যেতে যেতে তাঁকে বলে, "কেন আর মিছে যাচ্ছ, গিয়ে পৌঁছতে পারবে না, মন্দির বন্ধ হবার সময় হয়ে এসেছে।" বৃদ্ধ মানেন না, "নারায়ণ নারায়ণ" বলে কাঁদতে কাঁদতে চলতে থাকেন। যাকে ফিরতে দেখেন তাকেই বলেন, "আহা আপনি কত ভাগ্যবান,

তাঁর দর্শন পেয়ে এলেন, আমার কপালে কি মিলবে না?" যখন আর হাঁটতে পারেন না, হামাগুড়ি দেন, তবু থামেন না। এই করে করে যখন পৌঁছলেন, দেখেন যে, মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। রাওয়ালজী দ্বারে তালাবন্ধ করে শিল-মোহর লাগাচ্ছেন, ছ মাসের জন্য নীচে নেমে যাবেন। সবাই চলে গেছে, তিনিই কেবল বাকি। বৃদ্ধ এসে রাওয়ালজীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, "একবারটি খুলে দাও, তাঁকে দেখতে দাও।" পা ছাড়িয়ে নিলেন রাওয়ালজী। সেই ধাক্কায় বৃদ্ধ নীচে গড়িয়ে পড়লেন।

'যখন জ্ঞান হল, দেখেন কেউ কোথাও নাই। মনে বড় ধিক্কার এল। এত করেও যখন দর্শন ঘটল না, এ-জীবন আর রাখবেন না। ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেলেন। অলকনন্দায় প্রাণ বিসর্জন দেবেন। আর কেন? সঙ্কল্প করে "নারায়ণ" বলে যেই স্রোতে ঝাঁপ দিতে যাবেন, শোনেন, কে যেন টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আর বলছে, "থামো, থামো।" দেখেন এক পাহাড়ী যুবক। যুবক তাঁর কাছে এসে বললে, "কে বললে, মন্দির ছ মাসের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে! মিছে কথা। কালই ভোরে আবার মন্দির খুলবে, মনের আনন্দে তুমি তখন দেবতাকে দর্শন কোরো। এস, ততক্ষণ আমরা এই গোফায় বসে দাবা খেলে রাত কাটিয়ে দিই।" বলে, মেঝেতে দাগ কেটে বৃদ্ধকে নিয়ে সে দাবা খেলতে বসল। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল, মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল, বৃদ্ধের আনন্দ আর ধরে না। যুবক হাত ধরে বৃদ্ধকে মন্দিরদ্বারে এনে উপস্থিত করল। বৃদ্ধ দেখলেন, গত সন্ধ্যেয় যে রাওয়ালজী তালাবন্ধ করেছিলেন, তিনিই আজ আবার তালা খুলছেন। আর রাওয়ালজী দেখলেন, ছ মাস আগে যে-বৃদ্ধকে তিনি শেষ দেখেছিলেন, তাকেই আবার আজ প্রথম দেখছেন। এই ছ মাস এ ছিল কোথায়, বাঁচল কী করে? ব্রাহ্মণ বললেন, "মিছে কথা, একদিনকে বল ছ মাস! তোমাদের কথায় ভুলে আর একটু হলে আত্মহত্যার মহাপাপে পতিত হতাম, ভাগ্যিস এই যুবক এসে পড়ল।" কিন্তু কোথায় যুবক? ধারে-কাছে কেউ নেই। কে যে সেই যুবক, বুঝতে আর কারও বাকি রইল না। তখন মন্দিরপ্রাঙ্গণে "জয় বদরীবিশাল" "জয় বদরীবিশাল" ধ্বনি উঠল।'

স্বাস্থ্যবতী একটি পাঞ্জাবী বৌ এসেছে স্নান করতে। উদ্বাস্তু। স্বামী-স্ত্রী মিলে দোকান খুলেছে পুরি-তরকারির। সকালে দেখেছি, উনুনের ধারে

বসে তাল-তাল আটা মাখে, তড়বড় করে পাতার ঠোঙায় তরকারি ওজন করে দেয়, ঝাল-চাটনিও দেয় একটু। ভারি হাসিখুশি। দাদা তাই ওর দোকান থেকেই গরম পুরি কিনে খাওয়ালেন আমাদের। বড়দিকে বললেন, 'দেবতার স্থানে উপবাসের কোনো প্রয়োজন নেই। পেট পুরে খেয়ে ঠাণ্ডা হও আগে, তার পর দিনভর পূজা-অর্চনা করো।'

এক আঁজলা জল নিয়ে বৌটি মুখে কপালে ঘষে। পোড়া হাঁড়িকুড়ি সাফ করে এসেছে, ফর্সা মুখে হাতের কালি মাখা হয়ে যায়। খেয়াল ছিল না আগে, হাতের অবস্থা দেখে মুখের অবস্থা আন্দাজ করে হেসে ওঠে। পাশে নালার জলে একটা ছেলে বসে ময়লা কাপড়ে সাবান মাখছিল। তার সাবানটা একটু চেয়ে নেয়।

স্নান সেরে উপরে উঠলাম। কুণ্ড থেকে সোজা সিঁড়ি মন্দির পর্যন্ত। দ্বার খোলার আগেই ভিড় করে দাঁড়াই। বদরীনাথের মূর্তি কেমন, জ্ঞান মহারাজকে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'সে বড় এক মজার রহস্য। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না, কী মূর্তি বদরীনাথের। এক-একজন এক-এক রকম দেখে। কেউ দেখে কালীমূর্তি, কেউ নারায়ণ, কেউ শিব, কেউ বা বুদ্ধ। ঠিক যে কী, কে বলবে? যাচ্ছেন তো এক কাজ করবেন। বদরীনাথের মূর্তি সারাক্ষণই অলংকারে ঢাকা থাকে। দামী দামী পাথর বসানো মুকুট, হার। চোখ ঝলসে যায়। মুকুটের মাঝখানে একটি বড় হীরে দেখতে পাবেন, এক ওইটির দামই নাকি ছাপ্পান্ন হাজার টাকা। বদরীনাথের অগাধ সম্পদ। তা সকালবেলা যখন স্নান করানো হয় তাঁকে, আভরণ সব খুলে ফেলে। আগে থেকে মন্দিরে ঢুকে কোণ ঘেঁষে জায়গা নিয়ে নেবেন। ঘণ্টাখানেক লাগে স্নানপর্ব শেষ হতে। তখন ভালো করে দর্শন করবেন। আর কে কী দেখেন, আমাকে এসে বলবেন।'

তাঁরই কথামত মন্দিরে ঢুকে জায়গা নিলাম। পাথরের মন্দির। কিন্তু কবাট চৌকাঠ সবই রুপোর পাতে মোড়া। পূজার থালা ঘটি বাটি চৌকি —সবই রুপোর। একমাত্র রাওয়ালজীই পূজার অধিকারী, গর্ভমন্দিরে ঢোকার দাবি এক তিনিই রাখেন। অন্যরা, মায় পূজারী ব্রাহ্মণেরাও, থাকেন [illegible]মন্দিরে চৌকাঠের এপারে।

স্নান-পর্ব এক বিশেষ পর্ব। ঘড়া ঘড়া জল, মন্ত্রপাঠ, রাওয়ালজীর

নিপুণ হাতের মুদ্রা— এক মনে দাঁড়িয়ে দেখবার মত। গর্ভমন্দিরের দেয়াল-জোড়া রৌপ্য-সিংহাসনে বদরীনাথ। হাত-দেড়েক উঁচু পাথর, অনেকটা তিনকোণা, তাতে যেন জোড়াসনে বসা একটি মূর্তি। উপবেশনের ভঙ্গি অনেকটা বুদ্ধদেবের মত। মসৃণ পাথর, মাথা গলা হাত পায়ের পাশে একটু একটু খোদাইয়ের রেখা। শঙ্করাচার্য নাকি তপ্তকুণ্ড থেকে এই মূর্তিকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাওয়ালজী বাটি থেকে চন্দন-কুমকুম তুলে মূর্তির সারা গায়ে মাখিয়ে দিলেন।

নিরু বললে, 'এই বেশেই তো রাখলে পারে, বেশ ভালো হয় দেখতে। চন্দনের প্রলেপে কী সুন্দর মাধুর্য ফুটে উঠেছে।'

কিন্তু বদরীনাথের অতুল ঐশ্বর্য। মহামূল্য বস্ত্র-অলংকারে তাঁকে সাজিয়ে দেওয়া হল। তখন কোথায় বা মুখ, কোথায় বা চোখ, কালো পাথরের একটুখানি শুধু জেগে রইল রত্নমুকুটের নীচে। আরতির আলোতে ক্ষণে ক্ষণে তাতে ছায়া বদলাতে লাগল।

বড়দি বললেন, 'আমি যেন দেখছি ঠিক মা'র মুখখানি।'

মেজদি বললেন, 'আমি তো দেখছি জটাধারী শিব।'

ব্রজরমণ বললে, 'আমার মনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, হাতে একটি বংশী দিলেই হয়ে যায়।'

দাদা বললেন, 'নারায়ণ, নারায়ণ।'

গর্ভমন্দিরের চৌকাঠের সামনে বড় রুপোর থালা। পূজার জন্য যে যা দিতে চায় থালাতে রেখে দেয়। নিরু বললে, 'একটি ফুলের মালা পেতাম তো দিতাম বদরীনাথকে।' কোথায় ফুল, ফুল পাওয়া যায় না এখানে। বদরীনাথের বরাদ্দের ফুল, গোছাঁড়, দূর থেকে রোজ কয়েকটা আসে। পাণ্ডা বনতুলসীর মালা এনে দেয়; বলে, 'এখানে বদরীনাথের গলায় এই মালাই দেয় সবাই।'

ভোগারতি হবে, দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বেরিয়ে এলাম। চাতালের একপাশে মন্দিরের অফিস। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বড় বড় লাল খেড়ো বাঁধাই খাতা নিয়ে বসেছে কর্মচারীরা, হিসাব কষছে। একপাশে সেক্রেটারি বসে আছেন। যে কেউ একান্ন টাকা জমা দিলেই প্রতি বৎসর এখান থেকে রেজেস্টারী ডাকে তার নামে বদরীনাথের চন্দন-তুলসী পাঠানো

হয়। পঁচিশ টাকা দিলে সাধারণ ভাকে যায়। দাদা দুভাবেই টাকা দিয়ে রসিদ নিলেন। বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করলেন।

এবার সবাই মিলে ব্রহ্মকপালীতে এলাম। এখানে তর্পণ করলে নাকি আর কোথাও করবার দরকার হয় না। দাদা মেজদি আর বগলাদিদি তর্পণ করতে বসলেন।

ঋষিগঙ্গা আর অলকনন্দার সংগমস্থলে বদরিকাশ্রম। কেদারনাথে গিয়ে মনে হয় পথের শেষ হল, আর এখানে পথ যেন আরও হাতছানি দেয়। অলকনন্দার এপারে বদরীনাথ, বাজার-বসতি। ওপারে নির্জন পাহাড়। দু-একটা ছোট ছোট কুটির চোখে পড়ে। সাধুদের আশ্রম।

মধ্যবয়সী বাঙালি এক সাধু এগিয়ে এলেন। বললেন, 'দেখেই চিনেছি দেশী লোক। এখন তো সময় নেই, পরে আসব এক সময়ে, গল্প করব।' কাঠের কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে উঠে গেলেন।

প্রখর রৌদ্রে পাথর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বসে বসে ঘুমের আমেজ লাগছিল চোখে। তর্পণ-শেষে দাদা ঘাটে নামলেন। নিরু বললে, 'কী সুন্দর মন্ত্র দাদা, ইচ্ছে যায় তর্পণ করি। এতে আবার এত বিধিনিষেধ কেন ?'

দাদা বললেন, 'পিণ্ডদানের বিধি অবশ্যি নেই, তবে জলতর্পণ করতে পার। আচ্ছা, শখ যখন হয়েছে, হাতে জল নাও, আমিই তোমার পাণ্ডা হয়ে মন্ত্র বলে দিচ্ছি।' হাস্যচ্ছলেই দাদা বললেন, নিরুও হাস্যচ্ছলেই অঞ্জলি ভরে জল তুলে নিল, আউড়ে গেল দাদার সঙ্গে সঙ্গে 'জম্বুদ্বীপে, ভারতখণ্ডে, আর্যাবর্তে, পুণ্যক্ষেত্রে, হিমালয়দেশে, বদরিকাশ্রমে, বৈকুণ্ঠপুরে, অলকনন্দা-গঙ্গা-নিকটে, ব্রহ্মকপালীতীর্থে, আশ্বিন মাসে, কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে আমার মাতৃকুল, পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, শত্রুমিত্র, জানা-অজানা যে যেখানে আছে, সকলকে এই জল দিয়ে আমি তর্পণ করছি, এতে তাঁদের সকলের আত্মার কল্যাণ হোক।'

আগেই ব্যবস্থা করা ছিল— বদরীনাথের প্রসাদ পাওয়ার। বড়দি বললেন, 'আহা রে, এই খেয়ে বদরীনাথ কী করে থাকেন ছটা মাস। ডাল তো বরফ-জলে ফোটেই না। চাল-চাল ভাত, বেসন-দইয়ের কড়ি, আর শাকপাতার পকোড়ি।'

বাঙালি সাধুটি আসেন। পাশেই অন্নসত্র, সেখান থেকে দুখানি রুটি আর এক হাতা ডাল পিতলের মালসাতে সংগ্রহ করে নেন। বললেন, 'দু-তিনটে

সত্র আছে এখানে, যতটুকু পাই সব-ক'টা থেকেই নিই। আমার দুটি পুষ্যি আছে, একটি অন্ধ একটি খঞ্জ, তাদের খাওয়াই।'

নিরু বললে, 'দেখেছ, এখানকার ঘুঘুগুলি কেমন পুরুষ্টু। আমাদের দেশের তিনটি ঘুঘুর সমান এক-একটি। আর এই দেখ, সব বাড়িতে পাথরের চালের নীচে সবাই কেমন গোছা গোছা ভূর্জপত্র সাজিয়ে দিয়েছে। বোধ হয় জল হাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য। ভেবে দেখ কত ভূর্জপত্র লাগে এক-একটা বাড়িতে তবে। আর ইঁদুরগুলির তো লেজই নেই। কেমন নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় দেখ ; কী মোটা, যেন বেড়াল-বাচ্চাটা।'

চিঠি এসেছে অনেকগুলি, দাদা বড়দি মেজদির নামে। দেশ থেকে লিখেছে ছেলেমেয়ে আত্মীয়-কুটুম্বরা। হরিদ্বারের ঠিকানাতেই এসেছিল, জ্ঞান মহারাজ ঠিকানা বদলে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মনে মনে তিনি হিসাব রেখেছিলেন, কবে কোথায় থাকব। নিরু বসে ছিল বাইরে ভাঙা দেয়ালটার উপরে। মেজদি বললেন, 'আসবার সময়ে সবাইকে শাসিয়ে এসেছিলে, মায় আমার ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত, যেন কেউ চিঠি না লেখে। এখন যে বড় মুখ ভার করে একা-একা বসে আছ ?'

স্বামী বিরজানন্দ বলেছেন, 'নিজের মনকে কখনও বিশ্বাস করবে না। পাপ সূক্ষ্মভাবে কখনও ধর্মের রূপ ধরে, কখনও দয়ার রূপ ধরে, কখনও বন্ধুর রূপ ধরে তোমায় ভুলিয়ে বশ করবার চেষ্টা করবে। কখন নিজেকে হারিয়ে ফেলবে, বুঝতেও পারবে না।'

নিরু বললে, 'শুধুই কি পাপ ? মায়াও।'

বড়দি বললেন, 'শুনেছ ? কলকাতার ওরা বড় ভাবনায় আছে। কাগজে দেখেছে কর্ণপ্রয়াগে বাস-দুর্ঘটনা হয়েছে। সকালে বাস ছাড়বে, রাত্তিরবেলা যাত্রীরা সবাই ঘুমোচ্ছিল। গঙ্গার পারেই বাস-স্টপ। রাতারাতি অলকনন্দা ফেঁপে ফুলে জন বেয়াল্লিশেক আরোহী সমেত বাস নিয়ে ভেসে চলে গেছে। ড্রাইভারও রক্ষা পায় নি। ছেলেরা জানতে চেয়েছে আমরাও সেই সঙ্গে ভেসে গেছি কি না, মহা উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে তারা।'

নিরু বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও শুনেছি খবরটা। পথে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলছিলেন। তিনি দেখেছেন হৃষীকেশে বহু শব নাকি গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে।'

কেমন যেন সাজ সাধুটির। পায়ে জুতো-মোজা, গায়ে সোয়েটার, অথচ গৈরিক বেশ, মাথায় বাবরি চুল। নিরু বললে, 'ও দাদা, ডাকুন-না ওঁকে, গল্প করি।'

দাদাকে ডাকতে হয় না, কী ভেবে তিনিই এগিয়ে আসেন। মালাবারে বাড়ি, সন্ন্যাস-জীবনের নাম জ্ঞানানন্দ সরস্বতী। ওপারের পাহাড়ে থাকেন, নীচে জলের ধারে ছোট্ট ঘরটি, ছবির মত সাজানো, নুড়ি-ঘেরা আঙিনা, পথ। ব্রহ্মকপালে বসে বসে সেইদিকেই সারাক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। হাই-কোর্টের উকিল ছিলেন, আট বছর হল এপথে এসেছেন। বললেন, 'কী জানি, হঠাৎ কী রকম মনে হল, সব মিথ্যা ঠেকল। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ন্যাসী না হয়ে উপায় নেই তাই হয়েছি, কিন্তু আমি মানি ঋষি রবীন্দ্রনাথের কথা, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়। সাধুদের মধ্যে অনেকে আমায় ভালোবাসে, অনেকে আবার নিন্দেও করে। বলে, "সাধু হয়েও শখ ছাড়তে পারে নি।" '

কথা কইতে কইতে তাঁর সঙ্গে এপারে চলে আসি। ছোট্ট ঘরের ছোট্ট দরজা দিয়ে নিচু হয়ে ভিতরে ঢুকি। কিছুই নেই, অথচ মনে হয় যেন ভারি রুচিসম্পন্ন। দুটো কাঠের পাটাতন, তাই হল খাট, তার উপরে গেরুয়া কম্বল। কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্স, তার উপরে গেরুয়া আসন বিছানো। খানকয়েক ধর্মগ্রন্থও রয়েছে। মেঝেতে গেরুয়া রঙে ছোপানো চট-কাপড়। দেয়ালের গায়ে এক চিলতে কাঠের উপরে রিস্টওয়াচটি ঝোলানো। কোণায় কমণ্ডলুতে খাবার জল। ওপারে গিয়ে জল নিয়ে আসেন রোজ, এপারে জল নেই। খাবারের মধ্যে ফলমূল, দুধ। মাঝে মাঝে রাওয়ালজীর কাছ থেকে ভাত-ডাল প্রসাদ পান।

নিরু বললে, 'ঠিক এমন একটি ঘরই আমার কাম্য। নির্জনে এই রকম একটি ঘর পাই তো মনের আনন্দে দিন কাটিয়ে দিই। সাধু হলেই যে নোংরা থাকতে হবে তার কী মানে আছে? সৌন্দর্যকে বাদ দেবে কেন জীবন থেকে? আনন্দ চাইবে, অথচ সৌন্দর্যকে বর্জন করবে, এ কেমন করে হয়? দুই মিলিয়ে তবেই তো তিনি চিরসুন্দর, চিরানন্দময়।'

জ্ঞানানন্দ বললেন, 'আরো অনেক সাধু আছেন এখানে। এক বাঙালি বৃদ্ধ সাধু আছেন, তিনি আমাকে বড় স্নেহ করেন। আরও একজন

আছেন ; এইরকম দু-চারজন ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমি মিশি না। মতে মেলে না। বই পড়ি, বাগান করি। আর বাকি সময় এখানে বসে সামনে ঐ নীলকণ্ঠকে দেখি। হিমালয়ে এত যে তুষারশৃঙ্গ, এত সুন্দর আর একটিও নেই। কেমন শুভ্র, কেমন মসৃণ।'

জ্ঞানানন্দ আমাদের বাঙালি সাধু শাশ্বতানন্দের কাছে নিয়ে গেলেন। গুহার মধ্যে থাকেন। দরজার ঝাঁপে ছেঁড়া চাটাই আর কম্বল। সবজির বাগানের শখ এঁর। গুহার সামনে পাহাড়ের উপরেই অল্প এক টুকরো জমি বেছে নিয়ে পালং ডাঁটা মুলো গাজর আর ধনেশাক লাগিয়েছেন। বরিশালে বাড়ি। অনেককাল দেশ ছেড়েছেন। কথায় তবু দেশী টান।

বড়দি বললেন, 'রান্নার তো কোনো ব্যবস্থা দেখছি না বাবার। শাক-পাতাগুলি করেন কী ?'

শাশ্বতানন্দ বললেন, 'উপরে কালিকানন্দ আছে। এক একদিন সে তুলে নিয়ে যায়। তার খুব রান্নার শখ, রান্না করে আমাকেও খানিকটা পাঠিয়ে দেয়।'

কালিকানন্দও বাঙালি, বয়স এঁর চেয়ে কম। ঘরের কোণায় একটি হারমোনিয়ম। মাঝে-মাঝে গলা খুলে গান করতে বসেন।

জ্ঞানানন্দ বললেন, 'এঁরা সকলেই মাননীয় সাধু। এখানেই থাকেন, বরফ পড়বার সময়ে শীত খুব অসহ্য হলে দু-চার মাস নীচে কাটিয়ে আসেন। আমিও যাই। যোশীমঠ অবধি, তার বেশি না।'

নিরু বললে, 'শুনেছিলাম এই পাহাড়ে নাকি কিন্নরীরা গান করে। অনেকে নাকি নিজ কানে শুনেছেন, তেমন তেমন সন্তরা নিজের চোখে তাদের দেখেছেন পর্যন্ত।'

জ্ঞানানন্দ হাসেন। বলেন, 'অমন কাহিনী তো আমিও শুনি অনেকের কাছে। নিজে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে বলি কী করে ?'

পাণ্ডার ছেলেটা সেই থেকে ঘ্যান-ঘ্যান করছে। তার আশা দু-চারটে জায়গা দেখিয়ে কিছু পয়সা পাবে। বলে, 'এই দেখ, ভগবানের নেত্র দর্শন কর।' পাহাড়ের গায়ে বিরাট একটা চোখের মত দাগ, যাত্রীরা তাতে ঘি-সিঁদুর মাখায়। ছেলেটা বললে, 'আর ওপারের ঐ পাহাড়ে চরণ-পাদুকা আছে, যাবে ?'

বললাম, 'না।'

রাত্রে দু দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে নিরু লিখতে বসল। বললে, 'এতদিন কিছু বলি নি, সারা রাস্তা রয়ে-সয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে এসেছি, মাঝপথে পাছে ফুরিয়ে যায়। এখন তো আর সে ভাবনা নেই ; আজ আর কারো কথা শুনব না।'

বড়দি বললেন, 'রাত হয়ে গেছে, সারাদিনের ক্লান্তি আছে, এবার শুয়ে পড় বাতি নিভিয়ে।'

নিরু বললে, 'দাঁড়াও, এ পথের সুবিধে-অসুবিধের জরুরী কথাগুলি টুকে রাখি আগে। নয়তো আবার ভুলে যাব। চটির নাম, পথের হিসাব, এ-সবের জন্যে তো বিস্তর বই রয়েছে। চিঠি লিখে চেয়ে পাঠালেই ডাকে পাঠিয়ে দেয় ; টুপি, লাঠি, জুতো, গগল্‌সের কথাও তাতে ছাপানো থাকে। বড় বড় অয়েলক্লথ চাই গোটা দুই তিন, খবরের কাগজ কিছু সঙ্গে থাকা ভালো—খেতে বসতে জিনিস রাখতে কাজে লাগে। পায়ে যেমন পট্টি বাঁধা থাকে, পেটেও একটা থাকলে আরাম দেয়। ঢিলে জুতো তো চাইই, অবশ্যি বড়দির মত চার আঙুল বড় নয়। পাহাড়ীদের খুশি করতে সিঁদুর কুমকুম সুঁচ সুতো, আর ছেলেদের জন্য কিছু সিগারেট আনলে তো কথাই নেই। অবশ্যি কী হবে ছাই এ-সব লিখে। শুনছি আর দু-চার বছরের মধ্যেই বদরীনাথ পর্যন্ত বাস-রাস্তা হয়ে যাবে। এত যে মাধুর্য এই পথের, এ আর তখন থাকবে না। মোটর হাঁকিয়ে আসবে সবাই, ঝনঝন টাকা ঢালবে, টাটকা টাটকা পুজো দিয়ে নগদানগদ ফলাফল নিয়ে বাড়ি ফিরবে।' নিরু বিড়বিড় করে বকে আর লেখে। দাদা বললেন, 'পাহাড়ের দৃশ্যাদির বর্ণনা কিছু লিখে রাখলে না ?'

নিরু বললে, 'বাপ রে, পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়েছি চড়াই আর উতরাই, উতরাই আর চড়াই। প্রাণ বেরিয়ে গেছে, তার উপরে তোমার তাড়া। দু দণ্ড কোথাও দাঁড়িয়ে কিছু দেখবার উপায় ছিল নাকি ?'

ঘুম আসছে না। লেপের নীচে মুখ ঢুকিয়ে শুয়ে আছি। বিকেলে পাহাড় থেকে বেরিয়ে মন্দিরে গেলাম, চাতালের এক পাশে ধর্মাধিকারী দেবীদত্ত গীতাপাঠ করছিলেন। শ্রোতাদের একপাশে গিয়ে আমিও বসলাম। কানে এল দেবীদত্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, 'ভাব হল মন। সব ভাবই যে সকলের

পক্ষে এক, তা নয়। সন্তান হয়েছে, ঐ বড় আনন্দের ভাব ; মা ছেলেকে কোলে নিয়ে আহ্লাদে অধীর। কিন্তু নিঃসন্তানা সৎমার বুকে সেই ভাবই আগুন জেলে দেয়। তাই বলি, যার যেমন মন, তার তেমন ভাব। মনই আসল।'

মাথার উপরে মন্দিরতোরণ। সূর্য ডুবল সেই তোরণের মাথায়। বরফে বরফে রং ছড়িয়ে গেল। মেঘের গায়ে লাগল রঙের ছোঁয়া। শেষ হল আলো, শেষ হল দিন। ভাবছি, অনেকখানি তো উঠে এলাম, কিন্তু কোথায় যে এলাম তা তো জানি নে।

ছু রাত কেটেছে, এই রাতটুকুও আর কাটতে কতক্ষণ? এর পরই তো ঘরমুখো যাত্রা শুরু হবে। দেখতে দেখতে প্রভাত-আলোয় এই বৈকুণ্ঠ-লোকের তমসা কাটবে, প্রতি ঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বার হবে, গন্ধ ছড়াবে পোড়া পাইন-কাঠ। শীতের হাওয়াকে সেই গন্ধ ভারি করে তুলবে। কম্বলের পোশাকে আপাদ-মস্তক-ঢাকা দোকানীরা তাদের দোকানের ঝাঁপ খুলে জাঁতি-কলে ধরা মরা ইঁদুরের লেজ ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে রাস্তায়। 'জয় বদরীবিশাল কী' বলে জমাদার সাফ করবে পথ। জল ঢালবে, ঝাঁটা বুলোবে, তুলে নেবে মরা ইঁদুর, এঁটো পাতার ঠোঙা আর বাসী উনুনের ছাই। গুনগুন গমগম করে এদিক ওদিক থেকে স্তবস্তোত্রের ধ্বনি উঠবে। নিঝুম বদরিকাশ্রমে সাড়া পড়বে নতুন দিনের জাগরণের। নাকমুখ দিয়ে গরম হাওয়ার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পাণ্ডা এসে দাঁড়াবেন। আওড়াবেন, 'হরি ওঁ তৎসৎ, হরি ওঁ তৎসৎ,' জপা কর জপা কর।' তার পরই বলবেন, 'সুফল গ্রহণ কর।'

নিরু উঠে জানালার পাট খুলে নীলকণ্ঠকে দেখে নেয় আর একবার। বলে, 'এ যেন এক অখণ্ড জ্যোতি, দিবারাত্রি জ্বলছে বদরীনাথের শিয়রে। নানা রঙের আলোর ছটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিশিদিন তার এই আরতির নিবেদন, চোখের সামনে যেন আর কার রূপের আভাস ইঙ্গিতে ধরিয়ে দিয়ে যায়।'

কিন্তু কে ঐ ওখানে, অসময়ে, এই নিশীথ রাত্রে? সামনে ঝুঁকে পড়ে

নিরু। বলে, 'এ যেন সেই তপস্যানিমগ্না উমা পাথরে আর নারীতে তফাত ঘুচিয়ে দিয়েছে।'

নিঃশব্দে ঘর থেকে সে বেরিয়ে পড়ে। ম্লান চাঁদের আলো যেন অপরূপ মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়েছে স্থির নিশ্চল ওই মূর্তিটিকে ঘিরে। ডান হাতে আঁচল টেনে ঢাকা দিয়েছে মুখ। কালো চুলে ঘেরা কপালের নীচে উদাসী দুটি চোখ। যেন অতল সাগরের আহ্বান, যেন বিপুল সুদূরের হাতছানি। 'চিনি-চিনি' সুর বাজতে থাকে ভীত ছন্দে, তালে। নিরুদ্ধ আবেগে নিরু গিয়ে তাকে জাপটে ধরে। অনাবৃত বাম বাহুখানি শিথিল ভঙ্গিতে বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। আর থাকতে পারে না নিরু। এ যে তার চেনা মানুষ, একে কি সে ভুলতে পারে? দুরুদুরু বুকে চাপা উল্লাসে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'চম্পা?'

চম্পা চমকে ঘুরে দাঁড়ায়। মুখের আঁচল খসে পড়ে, ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটে। দু হাত এগিয়ে দেয় সামনে।

বিস্ময় কাটে না নিরুর, 'বলে এও কি সত্যি? চম্পা, তুমি?'

চম্পা বলে, 'তাই তো দেখছি। বদরীনাথের পায়ের তলায় এই মুহূর্তে যে দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা, তার একজন তোমার চম্পাবতী, আর অন্যজন আমার চিরদিনের কলমিলতা। কতদিন এই নামে ডাকি নি বল তো?' হাস্যোদ্ভাসিত মুখে চম্পা বুকে টেনে নেয় নিরুকে।

চম্পাবতী, কলমিলতা। সে আজ কতকাল আগের কথা। একই গাঁয়ে মামাবাড়ি দুজনের। চম্পার মা মালতী-মাসী নিরুর মায়ের গ্রাম-সম্পর্কে এক খুড়োর মেয়ে। গ্রামে বিয়ে হয়েছে, গ্রামেই থাকেন বেশির ভাগ। এ-পাড়া ও-পাড়া বাপের ঘর শ্বশুরঘর। ছেলেমেয়ে পিঠোপিঠি ছ'টি। কিন্তু কী তাঁর শরীরের বাঁধন। মা-কাকীমারা ঠাট্টা করে বলতেন, 'মালতীকে ফিরে আবার কনে সাজানো যায়।' শুনে, তর্জনীর চুনটুকু দাঁতে চেঁছে নিয়ে, এলোচুলের গোছা বালিশে ছড়িয়ে দিয়ে, মেঝেতে পাতা শীতল-পাটিতে গা এলিয়ে দিতে দিতে পানের রসে রাঙা ঠোঁট দুখানি কাঁপিয়ে কি হাসিই হাসতেন মাসী। তিনি না এলে মায়ের দুপুর যেন আর কাটতে চাইত না। সেই মালতী-মাসীর মেয়ে চম্পা। নিরুরই বয়সী। ছেলেবেলা থেকেই তাকে জানে নিরু। একসঙ্গে আরো অনেককে নিয়ে দল বেঁধে তাঁরা খেলে

বেরিয়েছে। কিন্তু তখনও এত ভাব ছিল না। সেবার এক গরমের ছুটিতে কী করে কখন হঠাৎ নিরুর বড় ভালো লেগে গেল চম্পাকে। এ ভালো লাগা শুধু নিরুর নয়, চম্পারও। মায়ায় ভরে উঠল মন। কানামাছি খেলতে গিয়ে চম্পার মৃদু স্পর্শ ইচ্ছে করেই নিরু এড়িয়ে যায়, কানা-মাছি হবার লাঞ্ছনা থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য। উঠোনে হত কুমির-কুমির খেলা। পাড়ে পাড়ে ঘাট, মাঝখানে কুমির। সুবিধে বুঝে ঘাটে নামে মেয়েরা। আর ছড়া কাটে 'এই গাঙে কুমির নাই, ঝাপ্পুর ঝুপ্পুর নাইয়া যাই।' দুহাতে জলে ঢেউ তুলে ফাঁকা হাওয়ায় নেচে নেচে ডুব দেয়, কুমিরকে আসতে দেখলেই লাফিয়ে ঘাটে উঠে পড়ে। কুমির কাউকে ছুঁয়ে ফেললে তাকে আবার কুমির হয়ে জলে থাকতে হবে, আর আগের কুমির মানুষ হয়ে ঘাটে দাঁড়াবে। চম্পা যখন কুমির হত, নিরুর ঘাটের দিকে সে যেত না। পিছন ফিরে অন্যদের তাক করে সে দাঁড়িয়ে থাকত। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাটে নামত নিরু, আর অন্যরা সব ঈর্ষায় জ্বলে মরত।

কালবৈশাখী ঝড় উঠেছে, কাঁচা আম কুড়োতে যাবে দক্ষিণপাড়ার আম-বাগানে; কিন্তু চম্পা নইলে যায় কী করে? চম্পাদের বাড়ি পূবদিকে। সেইদিকে ছুটে চলে নিরু। ওদিকে চম্পাও তখন নিরুর সন্ধানে পশ্চিমদিকে ছুটে আসছে। মাঝপথে দেখা। দেখা হতেই ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুজনে আবার দক্ষিণপাড়ার দিকে আম কুড়োতে ছুটত।

নাগেদের পুকুরে স্নান করতে নেমে ডুরে গামছা দিয়ে মাছ ধরত দুজনে। সুয্যিপোনা, তিতপুঁটি, আর বেলেমাছের ছা।

আর যেত ক্ষেত্রমামার মটর-কলাইয়ের খেতে। লুকিয়ে লুকিয়ে যেত। সঙ্গে থাকত নুন-লঙ্কা। কচি কচি মটরশুটি তুলে এনে আলের ধারের শন-ঝোপটার আড়ালে বসে খেত।

সেই সেবারেই এক নিরালা দুপুরে দুজনে মিলে মামাদের পুবদিকের পুকুরপাড়ে গিয়ে হাজির। বেতবনে থোকা থোকা বেতফল ধরেছে। শক্ত আঁশের মত খোসায় ঢাকা ফলগুলি, মটরের মত ছোট-ছোট গোল-গোল। বাইরে থেকে কাঁচা পাকা বোঝা দায়, আন্দাজে ধরে নিতে হয়। কষা কষা স্বাদ। নিরু আর চম্পা সেই বেতফল তুলেছে কোঁচড় ভরে, সারা গায়ে বেত-কাঁটার আঁচড় খেয়ে। বঁড়শির মত সারি সারি সূক্ষ্ম কাঁটা বসানো লম্বা

লিকলিকে শিষ, হাওয়ায় এমন দুলতে থাকে যে, শাড়িতে বিঁধলে শাড়ি ছিঁড়ে যায়, গায়ে লাগলে চামড়া উঠে আসে। বেতফল ছাড়ানোও এক শক্ত কাজ। মাদারগাছের মোটা গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে পা মেলে বসল দুজনে। বসে, খোসাগুলি এক এক করে নখ দিয়ে ছাড়ায়, আর কালচে সবুজ রঙের শক্ত-শক্ত ফলগুলি চাল-মাপা বেতের 'টুরি'তে ভরে রাখে। তার পর তাতে নুন-কাসুন্দি দিয়ে ডান হাতের তেলো দিয়ে 'টুরি'র মুখ চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আনাচ-কানাচ ঘুরে বেড়াবে আর সুর করে বলবে, 'আম পাকে জাম পাকে, মামাবাড়ির বেথু——ল পাকে।' বারে বারে ঝাঁকুনি খেয়ে নুন-কাসুন্দি মিশে তবে নরম হবে বেথুল, ঝালে-নুনে সুস্বাদু হয়ে উঠবে। কিন্তু মামাবাড়ির দোহাই না দিলে কিছুতেই কিছু না, শক্ত বেথুলের মন গলবে না।

চম্পার নাম আসলে সুহাসিনী। চম্পাবতী রাজকন্যার গল্প বড় ভালো লাগত নিরুর। সুহাসিনীকে সে তাই নতুন নাম দিয়েছিল—চম্পা। সেই-দিনই দিয়েছিল।

আজ আবার সব মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, কোঁচড় থেকে বেথুলের খোসা ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সখীর গলা জড়িয়ে ধরেছিল নিরু। বলেছিল, 'সুহাসিনী, আজ থেকে তুমি আমার চম্পাবতী, কেমন?' শুনে সুহাসিনী বলেছিল, 'আর তুমি? তুমি আমার কী?'

নিরুর নামটাও সেই তখন নিরু নিজেই দিয়েছিল। দিদিমার মুখে শুনেছিল, কলমিলতা নাকি কখনও মরে না। খাল শুকোয়, বিল শুকোয়, নদী শুকোয়, নালা শুকোয়, কলমিলতা লুকিয়ে থাকে শুকনো কাদার তলায়। বর্ষার নতুন জলের ছোঁয়া পেলেই সে আবার মাথা তোলে। নিরু বললে, 'আর, আমি হলাম তোমার·কলমিলতা।'

তার পর কেটে গেছে কত মাস, কত বছর। ফিরে ফিরে দুজনের দেখা হয়েছে। চম্পার সুখসৌভাগ্যের কথা তুলনায় আর উপমায় সকলের মুখে-মুখে ফেরে। প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা চাপা থাকে নূতন-পুরাতন সঙ্গিনীদের বুকে। উদাসিনী চম্পা বুঝে উঠতে পারে না, কোন্ গর্বে সে গরবিনী। বলে, 'তবে এত কান্না কেন আমার সারা অন্তর জুড়ে? এ কোন্ আকুলতা ভিতরে-বাইরে আমায় পাগল করে তুলেছে? প্রকাশের পথ পায় না।

না দেয় স্থির থাকতে, না পারি ভুলে যেতে। আমাকে নিয়ে এই নিষ্ঠুর কৌতুক কেন নির্মম বিধাতার ?'

চম্পা বললে, 'চল ঐ ঢাকা দাওয়াটায় গিয়ে বসি। বিছানায় শুয়ে ছিলাম, মন হঠাৎ কেমন করে উঠল, অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করে শেষটায় বাইরে বেরিয়ে এলাম। খোলা আকাশের নীচে যেন খানিকটা তাঁর সঙ্গ পাই, ঘরে এমন পাই না।'

নিরু বললে, 'আচ্ছা চম্পা, এতখানি পথ এলাম, একই রাস্তা, সারাটা পথে তবু একবার দেখা হল না আমাদের ?'

'কী করে হবে ? একটানা চলার পথ যে। একবার যে এগিয়ে যায়, গোটা পথ সে এগিয়েই থাকে। না থামলে আর পিছনের জনের সঙ্গে তার দেখা হয় না।'

নিরু বলে, 'কিন্তু আমি তো এসেছি আমার দুর্নিবার কৌতূহল মেটাতে, তুমি কিসের জন্য এলে চম্পা ?'

'আমি ? আমি এলাম আপন গরজে। প্রাণের গরজে। না এসে থাকতে পারলাম না।'

দু হাতের মুঠোয় নিরুর ডান হাত চেপে ধরল চম্পা। তার স্পর্শের ভাষা জানে নিরু। এই ভাষাতেই চম্পা ব্যক্ত করে নিজেকে।

চম্পার মুঠি কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে তার পর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল। যেন তার রুদ্ধ যন্ত্রণা খানিক খোলা পথ পেয়ে পালিয়ে বাঁচল।

এক চাদরে ঢেকে নিল নিরু দুজনের গা। হিমেল হাওয়া একই হাতে তাদের কপালে আদর বুলিয়ে গেল।

চম্পা বলে, 'জানো কলমিলতা, সেই কান্না আমার আজো থামে নি। আজো আমি তেমনি করেই কাঁদি। কাঁদি গভীর রাত্রির নিঃশব্দ প্রহরে, কাঁদি নির্জন বনের শুকনো পাতার মর্মরে সুর মিলিয়ে, কাঁদি বৈশাখী দুপুরে ধুলো-ওড়ানো তপ্ত হাওয়ার সঙ্গে। এ-কান্নার শেষ নেই। এ-জীবনে নেই। এক এক সময়ে ভয় পাই, নিজেকে নিয়ে ভয় পাই। সমুদ্রতীরে বসে এই ভাবনাটাই সেবার সারা মন তোলপাড় করে তুলেছিল। আজকের মত সেদিনও আমি ঘরে থাকতে পারি নি। সমুদ্রের গর্জন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। অন্তরে বাইরে কত আর সহ্য হয় ? দু হাতে কান চেপে ধরি,

সেই গর্জন তবু মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে। ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ করি, তবু তার হাত থেকে রেহাই মেলে না। কতদূরে যাব? কাছে এসেছি, দূরে পালাবার পথ যে বন্ধ। ভাবলাম, তবে আরো কাছেই যাই। পাগলের মত ছুটে গিয়ে বেলাভূমির বালিতে লুটিয়ে পড়লাম। দ্বিপ্রহরের তপ্তবালি। কিন্তু সে আর কত তাপ ধরে। মনের ভিতরে যে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। কেউ ছিল না ধারে-কাছে, ছিল কেবল সমুদ্রের প্রলয় হাওয়া। মন খুলে সেদিন কাঁদলাম। একসঙ্গে এত কান্না আর কখনও বোধ হয় কাঁদি নি। কেঁদে ঠাণ্ডা হলাম। তার পর ভাবনা জাগল, এত কাঁদি কেন আমি? কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। মনে হল, একটা আশ্রয় চাই আমার। এখুনি এই মুহূর্তে। তা নইলে ভেঙে পড়ব।

'সমুদ্রের বিশাল ঢেউটা হঠাৎ রুক্ষ বালিতে এসে আছড়ে পড়ল। চমকে উঠলাম তার আর্তনাদে। ভাবলাম, তাই তো, এমন যে অসীম অতল বিরাট সমুদ্র, সেও যেই একটু পারের আশ্রয় পেয়েছে, অমনি এসে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। কান্না না থাকলে কি চলে?

'বড় সান্ত্বনা পেয়েছিলাম সেদিন। তার পর থেকে মনের সুখে কাঁদি। কান্নাতে আর ভয় পাই না। জানো, কলমিলতা, এই কান্না দিয়েই কাছে পাই আমার আপন জনকে। তাই, বাইরে কোথায়ও তাঁকে খুঁজে বেড়াই না, ডেকে সাড়া জাগাই না। বাইরের জগতে হাসি খেলি, সংসার করি; ভিতরের জগতে একান্ত নিরালায় আপন মনে বসে ছবি আঁকি, কবিতা লিখি, গান গেয়ে চলি। এ দু জগতের মধ্যে আমি ফাঁক রাখি নি একটুও।

'বেশ ছিলাম। মানুষের কাছ থেকে সরে গিয়ে হাতের ফুলকারি আসনখানা তাঁর জন্য যত্নে ঝাড়ছিলাম আর পাতছিলাম, পাছে তাতে ধুলো জমে। কাজ প্রায় সারা হয়ে এসেছে। কেবল, সন্ধ্যেয় ফোটা ফুলগুলি এবারে তুলে নিয়ে আসতে হবে। এমন সময়ে, সারাদিন নানা পথে ঘুরে সন্ধ্যেয় নির্জনবনের ছায়ায় ঢাকা কালো পাথরের এই দেউলের সামনে সে এসে থামল।

'চিনতে পারি নি। মানুষ আমি, মানুষের চাওয়া-পাওয়া নিয়েই এগিয়ে

যাই, বারে বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি। আছাড়ি-বিছাড়ির অন্ত থাকে না। চোখের জলে কাদা করে তুলি রাঙা মাটির ধুলো।

'শেষে যেদিন আপন দুঃখের ভারে আপনাকে তলিয়ে ফেললাম তলায় একেবারে, তিনি এসে নিজের করে তুলে নিলেন আমাকে। স্নিগ্ধ চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন কপালে অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্যতিথিতে।

'সেদিন পুবের আকাশে রং লাগল, ভোর হল। নদীর জলে স্নান করে পূজার ফুল তুললাম। পদ্মপাতায় যত্নে সাজালাম চামেলী চাঁপা জুঁই বেল বকুল।

'নতুন দিনের নতুন সূর্যের আলো এসে পা দুখানি ধুয়ে দিল তাঁর। যে কাছে টানতে জানে না, দূরে ঠেলতে পারে না, যে ভালোবাসতে জানে না, রাগ করতে পারে না, সেই আমার পরমনিষ্ঠুর সুন্দরের পায়ে সব অর্ঘ্য ঢেলে দিয়ে লুটিয়ে প্রণাম করলাম।

'সবল বাহুডোরে আমায় বুকে বাঁধলেন তিনি। তাঁর চোখের মণিতে ফুটে উঠল আমার মুখ।

'নেচে উঠলাম দেখে।

'বললাম, "যাই তবে, একবার তাঁকে দেখিয়ে আসি আমার এই প্রেমের সাজ।"

'দলের লোক রওনা হয়ে গিয়েছিল দু দিন আগে। ছুটে গিয়ে সঙ্গ ধরলাম তাদের। চলে এলাম এখানে।'

চম্পা থামে। তার হিমস্থির মুঠোর মধ্যে নিরুর হাতের আঙুলগুলি ঘেমে ওঠে। নিরু তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। যেন কলস্বরা নির্ঝরিণী সুর বেঁধেছে বেহাগে, সমতল বসুন্ধরার বুকে নেমে এসে। বাইরে খোঁজার প্রয়োজন আজ তার সব শেষ হয়েছে, যেন আর কিছুরই দরকার নেই চম্পার। নীল আকাশের হালকা সাদা চাঁদটিকে ম্লান করে দিয়ে তার শ্যামল কপালের শ্বেতচন্দনের ফোঁটাটি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে চম্পা, সেই আগের দিনের মত। বলে, 'ছোটবেলা মা গড়িয়ে দিলেন লিচু-কাঁটা সোনার বালা। হাতে দিয়ে কচি কচি হাত দুখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি আর ভাবি, কাকে দেখাই, কাকে দেখাই। তখনকার দিনের মনের মানুষ আমার বুড়ো বৈরাগীদাদা। একা মানুষ,

গ্রামের বাইরে সিদ্ধেশ্বরী-তলায় কুঁড়েঘর বেঁধে থাকেন। ছুটে গেলাম সেখানে, বৈরাগীদাদাকে আমার নতুন গয়না দেখাতে। আর আজ এমন অলংকারে সেজেছি, তাঁকে না দেখিয়ে কি পারি থাকতে ?'

শুভ্র নীলকণ্ঠের গায়ে নবারুণের ছোঁয়া লাগে। সে আলো আগুন হয়ে জ্বলতে থাকে। মোটঘাট বেঁধে ঝোলাঝুলি কাঁধে ফেলে আমরা পথে পা বাড়াই। পাহাড়ী বুড়ী বসে বসে তার ঢাকে কাঠি পিটোয়, 'যাত্রা সুফল হো, যাত্রা সুফল হো।' ছোট ছেলেগুলো পিছু নেয়, 'পয়সা দাও লাড্ড খাব।' বাঙালি সাধু পুল পেরিয়ে এগিয়ে দিয়ে যান। বলেন, 'সাধু হয়েও টান যায় না। বাঙালি দেখলেই ভালো লাগে, সঙ্গ ছাড়তে মন চায় না। এইখানেই রইলাম, আবার এলে দেখা হবে।'

দ্রুত পায়ে পথ চলি। কেবলই উতরাই, চলতে কষ্ট নেই। দুদ্দাড় নেমে চলেছি, মন্দাকিনী অলকনন্দার মত। এখান থেকে হনুমানচটি, পাণ্ডুকেশ্বর, বলদোড়া ; তার পর বিষ্ণুপ্রয়াগ, যোশীমঠ। চামোলী পৌছতে তিন দিন। সেখান থেকে বাসে চেপে কর্ণপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর হয়ে হৃষীকেশ হরিদ্বার। কী দরকার আর হরিদ্বারে বিশ্রাম নিয়ে ? যেদিন পৌছব, সেইদিনই তো রওনা হতে পারি। আচ্ছা, নাহয় একটা দিনই সেখানে রইলাম। পরের দিন এক্সপ্রেসটা ধরে সোজা কলকাতায় না গিয়ে বর্ধমানে নেমে কিউল প্যাসেঞ্জারে উঠে শান্তিনিকেতনে চলে যাই যদি, তবে ঠিক পুজোর আগের দিন ষষ্ঠীর সন্ধ্যেয় গিয়ে পৌছতে পারব অভিজিতের কাছে। এক, দুই, তিন, চার—খেয়াল হয়, অন্যমনস্ক হয়ে দিন গুনতে লেগে গেছি। পিছন ফিরে দেখি, দু ফার্লংও আসি নি, এখনও ঐ পিছনে বদরীনাথের চূড়া দেখা যাচ্ছে। এরই মধ্যে হিসাব শুরু হয়ে গেল ? কী আশ্চর্য !

হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এসেছিলাম এখানে ?

আর, ঐ নিরুর চম্পা—!

হিমাদ্রি । শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১	সেই	যে
৫	৬	বেল, বেলের দিনে	বেল বেলের দিনে,
১১	২১	বড়াদ	বড়দি
২০	৭	বেশ, পাহাড়ি বউয়ের	বেশ পাহাড়ি বউয়ের ;
২৭	২০	বগলা	বগলা,
৩৩	১	রঙে,	রঙের
৫৩	১২	বালাদিদির	বগলাদিদির
৫৩	১৯	রেখে	হাতে মাথা রেখে
৫৭	৪	ওস্ত	ওস্ত্
৬১	৮	সঙ্গী লোকটিও	লোকটিও
৬৭	১২	আটা	আঁটা
৬৯	১৪	তাং তিতিক্ষস্ব	তাংস্তিতিক্ষস্ব
৭৩	৯	জল	দুই নল

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৬	৭	গায়ে গায়ে	গায়ে
১০৪	১৯	এগুতে	এক পা এগতে
১২১	১৯	অপবিত্রো	অপবিত্রঃ
১২৬	১	গুরোপদিষ্ট	গুরূপদিষ্ট
১২৯	২১	ব্রহ্মা,	ব্রহ্মা
১৪২	২৩	তুরই	তরই
১৪৭	২	ব্যাপারখানা। এতই	ব্যাপারখানা'। 'এতই
১৫৮	১৩	হাতে খানেক	হাতখানেক
১৬৯	৯	কর্মপ্রয়াগে	কর্ণপ্রয়াগে
১৭৫	১৪	গোপীনাথঞ্চ	গোপীনাথস্ত
১৭৫	১৪	পঞ্চদুর্লভা ঃ	পঞ্চদুর্লভা
১৮০	২২	এদের	এদের জন্যে